বানিজ্যে বাঙ্গালী

সেকাল ও একাল

সুভাষ সমাজদার

বাণিজ্যে বাঙ্গালী
সেকাল ও একাল

সুভাষ সমাজদার

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক
অমিতাভ মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

নারায়ণ সান্যাল

অগ্রজপ্রতিমেষু

শ্রীসুভাষ সমাজদারের লিখিত **বাণিজ্যে বাঙ্গালী** গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পড়িলাম। তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থনৈতিক ইতিহাস তিনি সাধারণ পাঠকের পাঠোপযোগী করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় লেখা এই ধরণের বই আমি পড়ি নাই। এই বই প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি অভাব দূর হইবে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

এই লেখকের :

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান।
দাসদাসীর হাট।
কোরিয়ার গণযুদ্ধ।
আবগারী দারোগার ডায়েরী।
হারামের নায়িকা।

প্রথম প্রবাহ

"উষাসোষা উচ্ছাচ্চন্নু দেবী জীবা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্র ন শ্রবস্তবঃ॥[১] ঋগ্বেদ

কোন্ সুদূর অতীতকালে প্রস্কণ্ব ঋষি ঋগ্বেদের এই প্রথম মণ্ডলের যুগান্তকারী শ্লোক রচনা করেছিলেন কে জানে! উষাকে বন্দনা করে ঋষিবর বলছেন, উষা পুরাকালে প্রভাত করতেন, আজও প্রভাত করছেন ধনলুব্ধ লোকেরা যেমন নৌকা সাজিয়ে সমুদ্রে পাঠায়—কে জানে কবে কোন নির্জন অরণ্যচ্ছায়ায় বসে ঋষিবর শৈব কল্পনা করেছিলেন ধনাভিলাষী বণিকেরা দুস্তর সমুদ্রের বিশাল জলরাশি পার হয়ে দূরদেশে চলেছে বাণিজ্য করতে।

প্রস্কণ্ব ঋষি, ঋষিবর শৈব আজ বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছেন। তাঁদের রচনার ভেতরে আজও স্মরণাতীতকালের সেই হিন্দু বণিকের, সার্থক বাণিজ্যের জয়গান দিকে দিকে মুখরিত হচ্ছে।

শুধু প্রস্কণ্ব কিম্বা মহাজ্ঞানী শৈব নয়, মহামুনি বশিষ্ঠদেবও সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন—সামবেদ একথাও বলে। দূর অজানা দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন সেই সুপ্রাচীনকালের সওদাগর তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুও। সামবেদ সংহিতার পাতায় পাতায় যেন হাজার হাজার বছর আগেকার সুখী, সম্পন্ন আর বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতবর্ষের ছবি ফুটে ওঠে :

বিক্রেতা বলছে : হে অদ্রিব, বহুমূল্য পাইলেও এই বস্তু আপনাকে বিক্রয় করিতে পারিব না। অধিক কি সহস্র বা অযুত শুল্কেও বিক্রয় করিতে পারিব না।

ক্রেতা : কেন, কি হেতু? জানিতে পারি কি?

বিক্রেতা : অনেক ক্লেশে উত্তাল সমুদ্র ডিঙিয়ে বাণিজ্য করতে

গিয়েছিলাম। সমুদ্রবক্ষে তরী ভগ্ন হলো। ভেসে ভেসে উঠলাম এক অজানা দ্বীপে। সেই দ্বীপের এক নির্জন গিরিগুহায় পেয়েছি এই অমূল্য মাণিক্য।

অতি আধুনিক কোন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফের বই নয়। ঋগ্বেদ, সামবেদের পৃষ্ঠাতেও ছড়ানো রয়েছে শুল্কের কথা, শুল্কের বিভিন্ন রেটের কথা, ক্রয়বিক্রয়ের কথা ইত্যাদি বাণিজ্য বিষয়ক আরও নানা কথা।

কোথা থেকে আসে সুপ্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থে ব্যবসা-বণিজ্যের কথা এবং কোথা থেকেই বা আসে দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবাণের সেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের কথা?

কল্পনা করে গল্প-উপন্যাস হয়তো লেখা যায় কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, হাজার হাজার বছরের পুরানো মহাগ্রন্থ বেদে এতটুকু মিথ্যার বেসাতি নেই।

যখন সমগ্র বিশ্বচরাচরে আদিমতার অন্ধকার অনড় হয়েছিল, যখন এই ভূমণ্ডলের অনেক দেশের মানুষ পশুবৃত্তির পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারে নি, যখন মানুষের মনে দু'টি মাত্র কামনা জঠর ও দেহ উগ্র ক্ষুধায় অগ্নিগোলকের মত জ্বলতো; সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালেই বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, বাণিজ্যে আর সম্পদে অতি উন্নত ছিল এই দেশ। হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর মনীষা, তার ব্যবসা-বাণিজ্য যজ্ঞাগ্নির মত সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল। তাই স্বভাবতই ঋগ্বেদে আর সামবেদে এবং আরও অনেক ধর্মগ্রন্থে এবং পুরাণে রয়েছে আমাদের সুদূরকালের বাণিজ্যপটুতার ইতিবৃত্ত।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥[২]

এই সুপ্রাচীন মন্ত্রটিও ঋগ্বেদের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। আজ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকটি একটি শুষ্ক মন্ত্র মাত্র। এই মন্ত্রটুকুর আড়ালে পূর্বসূরীদের দীর্ঘ যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা আছে, আছে শত সমুদ্রের উচ্ছসিত কলরোল, আছে শত সহস্র প্রাচীন নাবিকের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সর্বপ্রথম এই শ্লোক। সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি পেরিয়ে কোন কুয়াশাময় দিগন্তে গেলে পাওয়া যাবে ধনেজনে পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী দেশ সেসব তাঁদের নখদর্পণে ছিল।

খুবই বিস্ময়ের কথা। সেদিন কম্পাস আবিষ্কৃত হয় নি। ছিল না উন্নতধরনের যন্ত্রসমন্বিত আধুনিক জলযান, তবুও বরুণদেব উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। দূরদেশে স্থাপন করেছিলেন বাণিজ্যিক সম্বন্ধ। তাই ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইণ্ডিয়ান শিপিং' গ্রন্থে লিখেছেন—Rigveda contains several references to sca voyages undertaken for commercial and other purposes. One passage represents 'Varuna' having full knowledge of the ocean routes along which vesseles sail.[৩] সেইজন্যেই শুনঃশেপ ঋষি সগর্বে বলেছিলেন এই মন্ত্রটি,—বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ—অর্থাৎ তিনি (বরুণদেব) সমুদ্রের নৌকো সমূহের পথ জানেন।

তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।[৪]

ঋগ্বেদেরই আরো একটি শ্লোক। ঋগ্বেদের অনুবাদক এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকলদিকে সঞ্চরণ করে সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবায়ী শ্রোতারা সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করে ঋগ্বেদের এক ভাষ্যকার বলেছেন, সেকালের বণিকদের গতিবিধি ছিল অবাধ ও অবারিত। বিশাল ও অন্তহীন সমুদ্রবেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের এমন জায়গা নেই যেখানে তারা যেতেন না। শুধু সমুদ্রযাত্রার নির্মল আনন্দে নয়, অ্যাডভেঞ্চার নয়, 'ইন্-দি পারসুট অফ গেন' রীতিমত লাভের ব্যবসার আকর্ষণেই তাঁরা ঘরের নিশ্চিন্ত জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়তেন।

খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছর আগের সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পাতায়

পাতায় ছড়ানো রয়েছে আরো অনেক অনেক শ্লোক। এই সব মন্ত্র আর শ্লোকের ভেতর হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা আর বাণিজ্যের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ বলছেন, আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রের 'ভেতরে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণা করিয়াছিলাম—জলের উপরে গমনশীল্ নৌকায় ছিলাম তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম···সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে জলযান তাঁরাই পাঠাতে সমর্থ হয় যাঁরা সুদক্ষ নাবিক। বেদের ঋষিরা বলছেন, তাঁরা উত্তমরূপে নৌকা পাঠিয়েছিলেন। অতএব মহাজ্ঞানী মুনিদের যে নৌবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল বশিষ্ঠের সেই উক্তির ভেতরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋষিরা যে শুধুমাত্র শান্ত রসাস্পদ তপোবনে বসে বেদের মন্ত্র আওড়াতেন না, শুধু হোম যাগযজ্ঞ করতেন না, সমুদ্রপারের দূরদেশে বাণিজ্যের জন্যও যথেষ্ট দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করতেন ঋগ্বেদের শ্লোকগুলোর ভেতরে তার আভাস ফুটে ওঠে।

বৈদিকযুগের এক প্রতিপত্তিশালী ঋষি তুগ্র! তুগ্র তাঁর একমাত্র পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য—বাণিজ্য।

ভুজ্যু একমাত্র সন্তান। সমুদ্রের অন্তহীন উত্তাল জলরাশি পেরিয়ে যাবে বাণিজ্য করতে। অজানিত একটা বিপদের আশঙ্কায় পিতার বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করে কাঁপছিল। কিন্তু তাই বলে তো পুত্রকে ঘরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসিয়ে রাখা যায় না!

সমুদ্রের ভেতরে কিছুদূর অগ্রসর হতেই আকাশের কোণে একটুকরো মেঘ দেখা দিল। দেখতে দেখতে সেই মেঘ ছড়িয়ে পড়ল সারা আকাশে। ঝড় এল। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দে ঢেউয়ের সবোষ গর্জনে ও মত্ত বাতাসের সাঁ সাঁ আর্তনাদে যেন পৃথিবীটাকে এক মহাপ্রলয়ের ভেতরে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। ভুজ্যুর নৌবহর ঝড়ের আক্রোশ সহ্য করতে পারল না। তালগাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউ ডুবিয়ে দিল তার বজরাগুলোকে।

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় ভুজ্যু রক্ষা পেয়েছিল। ঝড় থেমে গিয়েছিল। পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আকাশ। তখন একটুকরো কাঠের পাটাতন নির্ভর করে ভুজ্যু ভাসতে ভাসতে চলছিল। এমন সময় যেন বিধাতা প্রেরিত আর এক নৌবহর তাকে রক্ষা করেছিল। তাই ঋগ্বেদে বলেছে :

তুগ্রো হ ভুজ্যমশ্বিনোদমেঘ রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথু নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরীক্ষ প্রূদ্ভিরপোদকাভিঃ॥[৫]

এই শ্লোকের ভেতরে ঋষি তুগ্রের আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস জীবন্ত হয়ে আছে। তুগ্র বলছেন, 'ম্রিয়মাণ মানুষ যেমন তার ধনসম্পদ ত্যাগ করতে মনে মনে বিশেষ কষ্ট পায় তেমনি কষ্ট স্বীকার করে আমি আমার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রযাত্রায় পাঠিয়েছিলাম।'

কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে সমুদ্রের সেই ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে এবং অনিবার্য মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিল তার সন্তান। তুগ্র তাই দেবতাদের সম্বোধন করে বলছেন—

'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমাদের নৌকাগুলোর সাহায্যে তোমরা তাকে (ভুজ্যুকে) ফিরিয়ে এনেছিলে। তোমাদের তরীগুলো জলে (সর্বদা) ভেসে থাকে। সেগুলোতে তো জল প্রবেশ করতে পারে না।

এই সুপ্রাচীনকালের বৈদিক মন্ত্রের ভেতরে শুধু শত শত শতাব্দী পূর্বের ঋষি তুগ্রের দীর্ঘশ্বাস আর দুঃখবরণের হাহাকার নেই; আছে সেকালের এক বাণিজ্য অভিলাষী পুত্রের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ায় দেবতাদের প্রতি পিতার অকৃপণ আর উচ্ছ্বসিত প্রসন্নতা।

দ্বিতীয় প্রবাহ

বণিক্ যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥[১] মহাভারত

শুধু বেদ, মনুসংহিতায়, ঋগ্বেদে নয়, আমাদের পূর্বসূরীদের বাণিজ্যের জয়যাত্রার কাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মহাকাব্য অভিজ্ঞানশকুন্তলমে, কুমারসম্ভবে, রামায়ণে এবং মহাভারতে।

মহাভারতের পর্বে পর্বে ছড়ানো বিভিন্ন শ্লোকে আর তার উপমার ভেতরে বাণিজ্যে সমৃদ্ধ অতীত ভারতবর্ষের ছবি ফুটে ওঠে। যেমন উপরোক্ত শ্লোকে ঘোষণা করা হয়েছে, বণিক যেমন সমুদ্র থেকে যথার্থ ধন লাভ করে তেমনি কর্মের দ্বারা মুক্তি অথবা জ্ঞান লাভ হয়। রামায়ণে আছে, সেইসব সওদাগরদের ইতিবৃত্ত যারা সমুদ্রের অন্তহীন জলরাশি উত্তীর্ণ হয়ে চলে যেত দেশ-দেশান্তরে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দুলতো সপ্তডিঙ্গা, ময়ূরপঙ্খী।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, রাজা সুগ্রীব নেতৃস্থানীয় বানরদের কোষকারদের দেশে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কোথায় এই কোষ-কারদের দেশ? পণ্ডিতরা অনুমান করেন,[২] কোষকারদের দেশ হচ্ছে সেই দেশ, যেখানে গাছের পাতায় পাতায় এক ধরনের কীট জন্মায় যা থেকে উৎপন্ন হয় রেশম। স্মরণাতীতকাল থেকেই চীন-দেশের রেশমের খ্যাতি ছিল। রেশমের আর এক নাম 'চীনাংশুক', 'চীনচেল'। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমে আছে, চীনাংশুকমিক কেতোঃ···আছে কুমারসম্ভবের সপ্তমসর্গে, সন্তান-কাকীর্ণমহাপথং[৩] তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্। উমার বিয়েতে সারা নগর উৎসবের সাজে সেজেছে। তাই কবি বলছেন,—

চীনাংশুকের কেতনে আকুল
মহাপথ নগরের
ঝলকি উঠিল সোনার আলোক।[৪]

রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উল্লিখিত পৌরাণিককালের সেই কোষকার আধুনিককালের চীনদেশ বলেই অনুমান করা হয়। সেই রামায়ণের যুগে, সেই সুদূর কুয়াশাময় অতীতেও যে রেশম-শিল্পের অস্তিত্ব ছিল এবং বণিকরা উৎকৃষ্ট পণ্যের আকর্ষণে সমুদ্র পার হয়ে দেশদেশান্তরে যেত, তার আরও প্রমাণ আছে রামায়ণে। অযোধ্যাকাণ্ডে আছে, এক নৌযুদ্ধের প্রস্তুতির ইঙ্গিত। পাঁচশত রণতরী ভাসছিল সমুদ্রের জলে। প্রত্যেক রণতরীতে ছিল রণনিপুণ শত শত যুবক। এই রণসজ্জার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটি সত্য—নৌবিদ্যা ও সমুদ্রবিজ্ঞান সেকালের মানুষদের অজানা ছিল না। বানররাজ সুগ্রীব সীতাকে খুঁজতে তার অনুচরদের যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপেও যেতে বলেছে, যেতে বলেছে লোহিতসাগরে।

ততো রক্তজলং শোভং লোহিতং নাম সাগরম্। এই যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ আধুনিককালের জাভা ও নিম্ন ব্রহ্মদেশ। মহাসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে সওদাগররা দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেত। আমদানী করতো বিচিত্র পণ্যসম্ভার। রাজাকে খুশি করার জন্য নিয়ে আসতো বর্ণাঢ্য আর সুদৃশ্য উপঢৌকন—তার নজীর ছড়িয়ে আছে রামায়ণে।

রামায়ণ আর মহাভারত ঃ

এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাচীন অশ্বত্থগাছের নীচে সন্ধ্যাপ্রদীপের মৃদু আলোয় মায়াময় গৃহকোণে হাজার হাজার বছর ধরে এই দুইটি মহাকাব্যকে পরম ভক্তি ভরে পড়ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রজানুরঞ্জন রাজা রাম, জন্ম দুঃখিনী সীতার চোখের জলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আর অন্যান্য সব

প্রসঙ্গ। মনেও হয় না, মনে হওয়া সম্ভবও নয় যে কোথায় এই কোষকারদের দেশ?—কোথায় লোহিত সমুদ্র আর কোথায় সুবর্ণদ্বীপ।

তেমনি মহাভারত। 'মহাভারত' এই পবিত্র শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আদর্শবাদী সৌম্য পাঁচ ভাই। করুণমুখে বনবাসে চলেছে বীরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব। অজস্র চরিত্র ও ঘটনার ভীড়ে আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বিলীন হয়ে যায় সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয়যজ্ঞের সমারোহে বিচিত্র মণিমুক্তার সমাবেশ—

শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য মণি মরকত লীলা॥
প্রবাল মুকুতা হীরা স্বর্ণ বিশাল।
বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল॥[৫]

আমাদের মনেও পড়ে না, কত দূরদূরান্তরের দেশ থেকে সেই যজ্ঞে যোগদান করতে এসেছিল রাজরাজড়া—

উত্তরে হিমাদ্রি পূর্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী॥[৬]

কোথা থেকে আসে এই প্রবাল মুক্তা হীরা ইত্যাদি বিচিত্র রত্নসম্ভার! বিভিন্ন দেশের নৃপতিরাই বা উত্তরে হিমাদ্রির বিস্তীর্ণ ভূভাগ, দক্ষিণে লঙ্কা থেকে হস্তিনাপুরে আসে কেমন করে? সবটাই কি মহাভারতকার বেদব্যাসের কল্পনা? স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, সেই সুদূর কুয়াশাময় অতীতেও সমুদ্রবাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল। সওদাগররা সমুদ্রপারের দেশ থেকে নিয়ে আসতো নানা ধরণের পণ্য আর বিদেশের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল অতীতে। কনিষ্ঠতম পাণ্ডব সহদেব সমুদ্রের পরপারে বহু দ্বীপে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানকার ম্লেচ্ছ অধিবাসীদের পরাজিত করেছিলেন।

দ্রোণপর্বে আছে তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লোক:

বিষগ্বাতহতা ক্বগ্না নৌরিবাসীন্মহার্ণবে ।৭

অর্থ কি এই মন্ত্রের ? এই মন্ত্রের ভেতরে একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। সে দেখতে কি রকম ? বিশাল সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়ে বিপর্যস্ত ভগ্ন তরীর মত।

আবার কর্ণপর্বেও আছে, আরও একটি সমুদ্রকেন্দ্রিক অনবদ্য উপমা। কৌরব সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেয়ে হঠাৎ একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কি রকম ?

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নৌকা হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে যে নাবিকের তার মত হতাশায় মূঢ় মুখ।

এই পর্বে আরও আছে, সেই সুদূর পৌরাণিককালের সমুদ্র-যাত্রার আর বাণিজ্যের অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত। দ্রৌপদীর পুত্ররা তাদের মাতুলকে রক্ষা করেছিল। রক্ষা করেছিল যেমন করে নৌকাডুবি হওয়া সওদাগরদের উদ্ধার করা হয় নৌবহর পাঠিয়ে।

মহাভারতের পর্বে পর্বে ছড়িয়ে আছে, সমুদ্র-বাণিজ্যের অজস্র ও অগণন উপমা,: বড় বড় রাজসূয়যজ্ঞ হয়েছে। দেশদেশান্তরে গিয়েছে অর্জুন। কত মানুষ, কত দেশ, কত নগর ও বন্দর পরিভ্রমণ করেছেন তিনি! তিনি কি রকম ?—বহুদর্শী পৃথিবী ভ্রমণকারী বণিকের মত।

মহাভারতের পাতায় পাতায় সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে সেই সুপ্রাচীনকালের হিন্দুর বাণিজ্যের অজস্র স্বাক্ষর।

তৃতীয় প্রবাহ

শুকেন সহ সংপ্রাপ্তা মহান্তংলবণার্ণবম।

পোতারূঢ়াস্ততঃ সর্বে পোতবাহৈরুপোষিতাঃ ॥[১] বরাহপুরাণ

সহস্র সহস্র বৎসর আগের স্মৃতি, সূত্র আর পুরাণের পৃষ্ঠাও এদেশের সুদূরকালের বাণিজ্যের অন্ধকার ইতিহাসে ফেলে মশালের আলো। খ্রীষ্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগের মনুসংহিতায় আছে—

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানাং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্ (৭ম অধ্যায়, ১২৭ শ্লোক)—অর্থাৎ বাণিজ্যপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য এবং সেগুলো কতদূর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তার ট্রান্সপোর্ট কস্ট কত হয়েছে ইত্যাদি বাদ দিয়ে বাণিজ্যদ্রব্যের ওপর কর দিতে হবে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ জর্জ ব্যুহ্লার সেই সুপ্রাচীনকালের ব্যবসা সংক্রান্ত এই ট্যাক্সের আইন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: In the case of merchandise one twentieth must be paid by the seller as duty.[২] বোধায়ন ধর্মসূত্রের পাতায় পাতায়[৩] ছড়ানো রয়েছে বাণিজ্যবিষয়ক বিচিত্র শব্দসম্ভার যেমন চক্রবৃদ্ধি সুদ, কারিতাবৃদ্ধি, কায়িকাবৃদ্ধি—একালের মত সেযুগেও ধারে কারবার চলতো—তা নাহলে বিভিন্ন রকম সুদের কথা আসে কি করে? সেই সুদূর অতীতকালেও যে দূরসমুদ্রপারের দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য চলতো তার প্রমাণও জ্বলজ্বল করছে বোধায়ন ও গৌতমধর্মসূত্রে আর্যঋষিরা কো-অপারেটিভের কথাও ভেবেছেন। গৌতমধর্মসূত্রে আছে—'কর্ষক-বণিক-পশুপাল কুসীদি কারবঃ স্বে স্বে বর্গে-[৪]—কৃষক, বণিক, পশুপালক সুদের বিনিময়ে যে টাকা ধার দেয় এবং কর্মকার প্রভৃতি সকলে সমবেত হয়ে সমবায় সমিতি তৈরী করে তাহলে তাদের নিজের নিজের

কাজের সহজাত পটুত্ব সমষ্টিগতভাবে দেশের সমাজের কল্যাণ করতে পারে। তাই ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যাকার[৫] বলেছেন : It is interesting to note that cultivators, cattle rearers, traders, money lenders and craftsmen used to form a sort of guild within their respective circles. আজ দেশজুড়ে সমবায় সমিতি অর্থাৎ 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' নিয়ে কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বসূরী সমাজ-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন সমবায় সমিতির গুরুত্ব। তাই ব্যবসায়ীকে কৃষকের সঙ্গে, কৃষককে কর্মকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্মসূত্রে, জাতকে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বারে বারে সমুদ্র-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে এবং বাণিজ্য বিষয়ক উপমা আছে।

জার্মান অধ্যাপক ব্যূহ্লার[৬] বলেন, ধর্মসূত্রে সমুদ্রযাত্রা আর বাণিজ্যের দুইটি চমৎকার প্রমাণ রয়েছে।

(ক) দূর সমুদ্র যাত্রায় যারা যেত, তারা সমাজে পতিত হয়ে যেত। সমাজে মেলামেশা করার চেষ্টা করলে তারা কঠিন শাস্তি পেত।

(খ) কিন্তু যদি তারা পশমের ব্যবসা করে ও একটু মদ্যপান করে আর ওপর ও নীচের মাড়িতে দন্তযুক্ত জন্তু বিক্রি করে তাহলে তারা সমুদ্রযাত্রা করতে পারে।

ব্যূহ্লার আরও বলেন, এই অদ্ভুত প্রথা দেখে মনে হয়, এঁরা উত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসী। আর ওপরের ও নীচের মাড়িতে দন্তযুক্ত জন্তু নিশ্চয়ই ঘোড়া আর খচ্চর। এই জন্তু দুইটির উল্লেখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তারা পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসী। আর তাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে।

ধর্মসূত্র নয়, স্মৃতি নয়। একটি ব্যাকরণ। সেই সমাস-সন্ধি-

বিভক্তিতে কণ্টকাকীর্ণ একটি ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণেও পৌরাণিককালের বাণিজ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। ব্যাকরণের নাম—পাণিনির ব্যাকরণ। বিশ্ববিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি শুধু নীরস ব্যাকরণ চর্চাই করেন নি কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যানুশীলনের ইতিহাস বিস্মৃতির অতলান্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে। শুধু যুগযুগান্তর থেকে বৈয়াকরণ হিসেবে তাঁর খ্যাতির পতাকা উড়ছে।

সে যাই হোক। পাণিনির ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। এই অষ্টাধ্যায়ীতে[৭] ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক অনেক কথা আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য। এই শব্দ দুইটির জন্য পাণিনি একটি মাত্র শব্দ চয়ন করেছেন। এই শব্দটি হলো—ব্যবহার। (২.৩.৫৭) মনে হয় ব্যবহার শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে আমদানী-রপ্তানীকেও বুঝিয়েছেন পাণিনি।

'বণিক', 'বাণিজ্য', 'পথ' (trade route), 'পণ্য' প্রভৃতি ব্যবসা সংক্রান্ত শব্দের পরিভাষা রয়েছে অষ্টাধ্যায়ীতে।

অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে বণিকেরা এই প্রদেশ থেকে অন্যপ্রদেশে সওদা করতে যেত। সঙ্গে থাকতো তাদের পণ্যসম্ভার—বিচিত্রবর্ণের 'কৌষেয়' (Silk Fabric), ঊর্ণা (Wool), 'উমা' (linen)। কোন কোন্ বণিক দূর গান্ধার দেশ থেকে আমদানী করতো পাণ্ডু-কম্বল; আফগানিস্তানের কপিশা থেকে নিয়ে আসতো মহামূল্যবান কপিশায়ন।

উৎকৃষ্ট মাখন, হৈয়ঙ্গবীন আর সুরাও নিয়ে আসতো বণিকরা। গান্ধারদেশে যে বণিক বাণিজ্য করতে যেত, তাকে বলা হতো গান্ধারবাণিজ, কাশ্মীর ও মদ্রদেশের বণিকদের অষ্টাধ্যায়ীতে বলেছে কাশ্মিরীবাণিজ এবং মদ্রবাণিজ।

এইবার দেখা যাক স্মৃতি কি বলেছে সমুদ্রজাত বাণিজ্যের বিষয়ে। স্মৃতির ভেতরে জ্বলজ্বল করছে একটি শ্লোক। মহাকাল

তাকে এতটুকু জীর্ণ করতে পারে নি। যুগযুগান্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু স্মৃতির সেই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত মন্ত্র আমাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য আর অনুশাসন বহন করে চলেছে। মন্ত্রটি কি—

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥[৮]

—অর্থাৎ যারা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, যারা অসতী রমনীর হাতে অন্নগ্রহণ করে, যারা সোমরস পান করে, যারা সমুদ্রযাত্রায় যায়, যারা তৈল প্রস্তুত করে এবং উৎকোচের বিনিময়ে মিথ্যাসাক্ষী দেয় তারা শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি হিন্দুদের শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না।

আবার সমুদ্রযাত্রীদের যেমন একঘরে করা হয়েছে তেমনি তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতাকে। মনুর এই শ্লোক—

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥[৯]

সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই একমাত্র ঋণের ওপরে সুদ স্থির করার অধিকারী। সেই সুদূর পৌরাণিককালের ভারতবর্ষে নৌ-বিদ্যা নৌ-যান তথা বাণিজ্য যে সমাজজীবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিল তার প্রমাণ মনুর এই মন্ত্রগুলো—

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরী ভবেৎ।
নদীতীরেষু, তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥[১০]

দীর্ঘযাত্রার জন্য গন্তব্যস্থল এবং সময় অনুযায়ী নৌকার ভাড়ার পরিমাণ স্থির করা হয়। শুধু নদীর ওপরে ভ্রমণের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য—সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে ভাড়ার অঙ্কের সঠিক নির্দেশ নেই।

একথা বলাবাহুল্য, যুগযুগান্তর থেকে নৌ-যানের সঙ্গে বাণিজ্য

ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি ডিঙিয়ে দূরদেশে কেউ নিছক ভ্রমণের নেশায় পাড়ি দিত না। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের চারশো দশ শ্লোকে বলে বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশং কুসীদং কৃষিমেব চ...অর্থাৎ স্পষ্টই বলেছে হিন্দুদের ভেতরে একটি বিশেষ জাত আছে যারা ব্যবসা করে, অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্য এবং উৎপাদনের খোঁজখবর রাখে। ব্যবসায় অভিজ্ঞ সেই শ্রেণীর মানুষরা বিভিন্ন দেশের ভাষা জানে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসার সঙ্গে যা কিছু জড়িত সে সম্বন্ধে তারা খুবই অবহিত।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আছে—

কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্বে সর্বাসু জাতিষু॥[১১]*

হিন্দুরা ধনলাভের উদ্দেশ্যেই সমুদ্রযাত্রার রোমাঞ্চকর নেশায় মত্ত হয়ে উঠতো। জ্যোতিষশাস্ত্রেও আছে, দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি আর সমুদ্র বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত। শুধু কি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আছে বাণিজ্যের ইতিহাস? কবে কোন সুদূরকালে এক দুঃসাহসী বণিক মুক্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সওদাগরদের সঙ্গে সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহণ করে দূরদেশে পাড়ি দিয়েছিল—বরাহপুরাণের পাতায় সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে সেই সগর্ব ঘোষণা।

অথবা সমুদ্রতীরে কুশলাগতরত্নপোত সম্বাধে।
ঘননিচুললীনজলচরসিতখগশবলীকৃতোপান্তে॥[১২]

বিপুল স্বর্ণ-সম্ভারের আমদানী হয় এমন কোন সমুদ্রবন্দর এবং ঘাটের ইঙ্গিত রয়েছে বৃহৎসংহিতার এই শ্লোকে। দূর সমুদ্র থেকে আগত ধনশালী বণিকরা এই সব বন্দরে ও ঘাটে এসে ভীড় করে। আরও একটি সুপ্রাচীন মন্ত্রে আছে, নাবিক এবং জাহাজের মালিকদের গৌরবময় অস্তিত্বের স্বাক্ষর। বলা হয়েছে সমুদ্রগামী

* এই অধ্যায়ের শুরুতে বরাহপুরাণের শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নাবিকদের স্বাস্থ্য চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শুধু স্বাস্থ্য নয়, তাদের ভাগ্যও ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের গ্রহ-নক্ষত্র অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৃহৎসংহিতার পাতা জুড়ে রয়েছে নাবিক ও সওদাগরদের সর্বসার্থক ইতিবৃত্ত সমন্বিত আরো অনেক—অনেক মন্ত্র। শুধু যে দূরসমুদ্রে পাড়ি দিত সেকালের সওদাগররা তা নয়। দেশের অভ্যন্তরেও সেদিন নদীর জলে বাণিজ্যের তরী ভাসিয়ে বণিকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে কানের কাছে গুন গুন করে ওঠে বৃহৎসংহিতার সেই প্রাচীন মন্ত্র—

তুরগ-তুরগোপচারক-কবি-বৈদ্যামাত্যহার্ক জোঽশ্বিগতঃ।
যামো নর্ত্তক-বাদক-গেয়জ্ঞ ক্ষুদ্র নৌকৃতিকান্॥[১৩]

দেশের অভ্যন্তরেও যে বাণিজ্য অব্যাহত ছিল এই শ্লোকই তার প্রমাণ। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের আরও উল্লেখ রয়েছে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। খ্রীষ্টাব্দ সূচনার কাছাকাছি সময়ে মৌর্যবণিকেরা সোনার বিনিময়ে হিন্দুদের কাছে বিক্রী করতো দেবদেবী মূর্তি।

মৌর্যৈহিরণ্যার্থিভিঃ অর্চ্চাঃ প্রকল্পিতাঃ॥[১৪]

সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় নাবিক, বণিক ও সওদাগরদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান ছিল। তাদের স্বাস্থ্য, সমুদ্রপীড়া এবং নিরাপত্তা নিয়ে সমাজের কর্তৃপক্ষ অনেক চিন্তা করেছেন।

শুধু বৃহৎসংহিতায় নয়, বরাহপুরাণেও আছে পৌরাণিককালের সমুদ্র বাণিজ্যের বিচিত্র ইতিবৃত্ত। বরাহপুরাণের পাতায় আছে সন্তানহীন এক হতভাগ্য সওদাগর গোকর্ণের এক বেদনাভিষিক্ত স্মৃতি।

গোকর্ণ বহুদর্শী সমুদ্রবাণিজ্যে অভিজ্ঞ, প্রতিপত্তিশালী এক বণিক। তার বিশাল ও সুদৃশ্য সৌধের প্রোকোষ্ঠে দূর সমুদ্রের অতলে বহুমূল্য মুক্তা-রত্নরাজি জ্বলজ্বল করে। অতুলনীয় ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ঘরে সুখ নেই। শান্তি নেই গোকর্ণের

মনে। গৃহে শিশুর কলকাকলী নেই। সমস্ত বাড়ী শ্মশানভূমির মত শুধু খাঁ খাঁ করে। ঘরের অশান্তি আর সন্তানহীনতার জ্বালা ভুলে থাকার জন্যই বণিক গোকর্ণ দূরদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু—

সমুদ্রে ঝড় ওঠে। উত্তাল ঢেউয়ের মত্ত রোষে গোকর্ণের নৌবহর প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সুদূর অতীতের এক দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত সওদাগরের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আর ব্যথার ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বরাহপুরাণের পাতায়।

মনে পড়ে মার্কেণ্ডেয়পুরাণ! সহস্র ব্রাহ্মণ একসঙ্গে গম্ভীরকণ্ঠে আবৃত্তি করে মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই মন্ত্র—

রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা।
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ॥[১৫]

সম্মিলিত কণ্ঠে এই মন্ত্রের আবৃত্তির ভেতরে এক করুণ বিষাদের ছবি ফুটে ওঠে। উত্তাল সমুদ্রে এসেছে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ। মত্ত আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে অজস্র ঢেউ। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সওদাগরের বাণিজ্যতরী!

দিকচিহ্নহীন তমসা। শুধু ক্ষুব্ধ বাতাসের অবিশ্রান্ত গর্জন আর ঢেউয়ের একটানা আর্তনাদ। নাবিকরা সেই দুর্যোগে দিগন্তের নিশানা হারিয়ে ফেলল।

নৌবহর ভেসে চলল অজানার উদ্দেশ্যে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মন্ত্রের সুরে যেন উত্তাল সমুদ্রের সেই ভয়াবহ কলরোল শোনা যায়।

চতুর্থ প্রবাহ

যস্যাঙ্কিং তীর্ণা প্রাবনৌ ররাজ্যপি কীর্ত্তিরবস্থতা।১

—রামচরিতম্

বেদ, সূত্র আর পুরাণেই শুধু নয়। প্রাচীনকালের বাণিজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ছড়িয়ে আছে মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশে', আছে 'শকুন্তলা'য়, আছে 'রত্নাবলী'তে।

সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রা, বিদেশী বাণিজ্য, নৌযুদ্ধ এবং দেশদেশান্তরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ইতিবৃত্ত জ্বলজ্বল করছে।

কালিদাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন "কালিদাসের সময়ে আমরা দেখতে পাই ভারতবাসী বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বাণিজ্য ভারতেব বাইরে, জলপথে ও স্থলপথে বিপুল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।"

চীনাংশুকমিক কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ২

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের রচয়িতা কালিদাসের এই উক্তিই নিসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় যে সেই সুদূর অতীতকালে চীনদেশে রেশমবস্ত্রের উৎপাদন হতো। আমাদের দেশেও আমদানী হতো সেই চীনা রেশম।

'কুমারসম্ভব' লিখতে গিয়েও সেই চীনাংশুককে ভুলতে পারেন নি কালিদাস।

'তচচীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্৩

মনে পড়ে হতভাগ্য বণিক ধনমিত্রের সেই ব্যাথাহত ইতিহাস। 'শকুন্তলার' সেই প্রভূত বিত্তবান সওদাগর ধনমিত্র।

ধনমিত্রের বিশাল সম্পত্তি ছিল। কিন্তু পুত্র, কন্যা বা আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

দূরদেশে সমুদ্রযাত্রা করেছিল ধনমিত্র। যেমন বহুবার করেছে। বহু সমুদ্র পার হয়ে বহু দেশদেশান্তর পরিক্রমা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে। কিন্তু—

একবার সমুদ্রের ঝড়ে তার বিশাল নৌবহর অতলজলে তলিয়ে গেল। বণিক ধনমিত্রের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

ধনমিত্রের দেশের রাজা বহুদিন বহু বছর অপেক্ষা করলেন, যদি সওদাগর ফিরে আসে। কিছুই তো বলা যায় না, ধনমিত্র মাছের চেয়েও ভাল সাঁতার কাটতে পারে। যদি সমুদ্রের ঝড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জাহাজের কোন ভাঙ্গা পাটাতন অবলম্বন করে ভেসে ভেসে মাটির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে আসে। কিন্তু—

সমুদ্র ব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্র নাম নৌব্যসনেন বিপন্নঃ ৪

না। মহারাজের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হলো। আর ফিরে এল না ধনমিত্র। তার কোন সন্তান নেই, নেই কোন উত্তরাধিকার। তাই বেদনাহত মনে মহারাজ তার বিপুল ধনসম্পত্তি রাজসম্পদের অন্তর্ভূক্ত করলেন।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আছে :

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ ॥৫

সেই অমিতবিক্রম সেই খ্যাতিমান মহারাজা রঘু। এই শ্লোকের ভেতরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে তার বীর্যবত্তার সেই বিচিত্র ইতিহাস। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কয়েকজন রাজা মিলিত হয়ে নৌবিদ্যায় নিপুণ মহারাজ রঘুকে আক্রমণ করেছিল। পরাক্রমশালী বীর রঘু পরাজিত করেছিল সেই অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের রাজাদের। গঙ্গার ভেতরে এক দ্বীপে রঘু তাঁর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন।

সেই সুদূরকালেও নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল। এই নদীমাতৃক

দেশের নদনদীতে নৌবহর ভাসিয়ে রণযাত্রা আর বাণিজ্যযাত্রা সেকালে খুব স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল।

মনে পড়ে সেকালের বিখ্যাত নাটক শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী।[৬] রত্নাবলীতে আছে কৌশাম্বী নগরের বণিকদের এক অভূতপূর্ব সাহস আর বীরত্বের ইতিবৃত্ত।

যমুনার বাঁদিকে আধুনিককালে এলাহাবাদের ত্রিশ মাইল পশ্চিমে একটি গ্রাম—কোশাম। এই নগণ্য গ্রামটিই একদা ছিল ধনেজনে পরিপূর্ণ কৌশাম্বীনগর।

কৌশাম্বীর সওদাগররা ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে নৌবহর ভাসিয়ে দূরদেশে চলেছিল বাণিজ্য করতে।

শান্ত সমুদ্র। কাছে, দূরে যতদূর চোখ যায়, সমুদ্রের ঢেউগুলো মাথা তুলে তুলে যেন নাচছিল। হঠাৎ একজনের চোখে পড়ল দূরে বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর দিয়ে কি যেন ভেসে আসছে।

—ওটা কি ?

—কোন জলজন্তু!

—না, মানুষ মনে হচ্ছে!

—হতে পারে গত রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। সেই ঝড়ে হয়তো জাহাজ ডুবি হয়েছে। নয়তো তাদের কেউ—

অস্থির আর চঞ্চল হয়ে ওঠে কৌশাম্বীর বণিকবৃন্দ। সমুদ্রে ভাসমান বস্তুটি ধীরে ধীরে কাছে আসে। আর তাদের চোখের অপলক দৃষ্টি তীব্র বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এ কী! মনে হচ্ছে কোন রমণী!

—বাঁচাও, বাঁচাও যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে তাকে।

বণিকদের নির্দেশে সুনিপুণ কয়েকজন নাবিক সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। জাহাজসংলগ্ন ছোট তরী নিয়ে তারা অগ্রসর হলো সমুদ্রের জলে প্রায় ডুবন্ত দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত সেই রমণীর দিকে।

নিরাপদে নাবিকরা তাকে নিয়ে জাহাজে ফিরে এল। আর

বণিকদের চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেল! শুধু রমণী নয়!

তরুণী রূপবতী। পিঠের ওপরে তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙ্গে পড়া বিপুল কেশরাশি থেকে তখনো জল ঝরছে। দেবী প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়ব।

—কে মা তুমি? কৌশাম্বীর বয়োজ্যেষ্ঠ বণিক প্রশ্ন করে।

কথা বলে না! শুধু বড় কালো দুটো আয়তচোখের কোণায় কোণায় জল জমে ওঠে। আস্তে আস্তে নিজেকে সংযত করে নেয়। কান্নায় ভাসা ভাসা গলায় বলে, আমি সিংহল রাজকুমারী!

—সে কি! তুমি সিংহল-মহারাজ বিক্রমবাহুর কন্যা!

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকায় রাজকুমারী। বলে কেমন করে প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ গ্রাস করেছিল তাদের জাহাজকে।

দশকুমারচরিতে[৭] বর্ণিত বণিক রত্নোদ্ভবের হাহাকার যেন কানের কাছে বেজে ওঠে।

মগধ অধিপতির মন্ত্রীপুত্র ধনী প্রতিপত্তিশালী সওদাগর রত্নোদ্ভব। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল কালয়বন দ্বীপে। সেখানে কালগুপ্ত নামে এক ব্যবসায়ীর অপূর্ব রূপসী কন্যা সুবৃত্তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। তন্বী। বরতনু। সুঠাম দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে।

রত্নোদ্ভব তার পিতার কাছে পরিণয়ের প্রস্তাব করলেন। বিপুল সম্পদের মালিক। উচ্চবর্ণের পুরুষ। তরুণ। রূপবান।

পিতা আপত্তি করলেন না। রত্নোদ্ভব নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে স্বদেশে রওনা হলো। না ঠিক স্বদেশ নয়, নিজের সহোদর অনুজকে দেখার জন্য শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে পুষ্পপুরে অর্থাৎ আধুনিককালের পাটনায় যাবে এই সিদ্ধান্ত করেছিল। দণ্ডী রচিত সেই করুণ কাহিনীটি যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রত্নোদ্ভব চলেছে পুষ্পপুরে। সঙ্গে সালঙ্কারা নববধূ। যেন মূর্তিমতী প্রতিমা। কিন্তু সমুদ্রে ঝড় উঠল। তালগাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউ ভেসে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত—

আর শেষ রক্ষা হলো না। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ রত্নোদ্ভবের বাণিজ্যতরীকে গ্রাস করল। নববধূকে নিয়ে সুখের নীড় রচনার স্বপ্ন গভীর সমুদ্রের অতলান্তে চিরকালের মত বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু—

আজও যেন বহু বছরের ওপার থেকে কানের কাছে গুন গুন করে ওই দশকুমারচরিতের সেই করুণ মন্ত্র—

ততঃ সোদর বিলোকনকুতুহলেন···৭

রত্নোদ্ভবের পর বণিক চিত্রগুপ্ত।

মিত্রগুপ্ত এক যবনের অর্ণবযানে চড়ে দূরদেশে চলেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশির ভেতরে দিক হারিয়ে ফেলল নাবিকরা। চারিদিকে আদি অন্তহীন দুর্ভেদ্য কুয়াশা। তাদের মনে হয়েছিল, যেন পাতালের কোন অজানা অন্ধকারে চলেছে তারা। শেষপর্যন্ত পথ হারিয়ে মিত্রগুপ্ত পৌঁছে গিয়েছিল এক জনমানবহীন নির্জন দ্বীপে।

'শিশুপালবধ'। সেই বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থেও পৌরাণিক-কালের বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত রয়েছে। কৃষ্ণবিদ্বেষী মহারাজা মহা-ভারতের সেই শিশুপাল। শিশুপালবধ-রচয়িতা কবি মাঘ বলেছেন : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে। পথে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, বিদেশী বণিকরা পণ্যদ্রব্য বোঝাই জাহাজ নিয়ে আসছে। তাই শিশুপালবধ কাব্যের শ্লোকে আছে—

বিক্রীয় দিশ্যানি ধনান্যুরূনি দ্বৈপ্যানসাধুও মলাভভাজঃ ।৮
তরীষু তত্রত্যমফল্গুভাণ্ডং সাংযাত্রিকানাবপতোঽহ ব্যনন্দৎ ।।

শুধু যে বিদেশী বণিকরা তাদের দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছিল তা নয়। তিনি দেখেছিলেন—

ভারতীয় পণ্যও সেই বিদেশীরা রপ্তানী করছে। 'শিশুপালবধে'র উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ: He (Sri Krishna) was glad to see merchants of distant islands after realizing great profits from the sale of the products of many countries reload their vessels with merchandice of Indian origin.

বিক্রীয় দিশ্যানি ধনান্যরুনি···এই শ্লোকের ভেতরে মহাভারতের সেই সুদূর অতীতকালের ছবি ফুটে ওঠে। বন্দরে বন্দরে বিদেশী জাহাজ এসে নোঙর ফেলছে। মাল খালাস করছে। পাইকাররা দরদাম করছে। চড়া দরে বিক্রী করে দুটো পয়সা লাভ করছে তারা। আবার আমাদের দেশের পণ্য বোঝাই করে নিচ্ছে সেই দূরদেশের সওদাগররা। পাইকার, মহাজন, কুলিকামিনের হাঁকে-ডাকে মুখর ও কর্মব্যস্ত বন্দরের আভাস পাওয়া যায় 'শিশুপালবধের' এই শ্লোকে।

কাশ্মিরী কবি সোমদেবের রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। কথা সরিৎসাগরের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে সেকালের সওদাগরদের বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আর তাদের দুঃসাহসের ইতিবৃত্ত। সেখানে যেমন আছে পুষ্করাবতীর বণিক ব্রহ্মদত্ত, চিত্রকূটের সওদাগর রত্নবর্মন আর ব্যবসায়ী কুসুমসারার উপাখ্যান তেমনি আছে হর্ষপুরার শ্রেষ্ঠী সমুদ্রশূরের[৯] সমুদ্র অভিযানের এক ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সমুদ্রশূর চলেছে বাণিজ্য করতে। ভারত মহাসমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে তার জাহাজ চলেছে সুবর্ণদ্বীপের দিকে। শান্ত সমুদ্র। অনুকূল বাতাস। তর তর করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গন্তব্যস্থলের দিকে। দিন শেষ হয়ে যেই রাত্রি নামল অমনি আকাশে দেখা দিল এক টুকরো ঝড়ো মেঘ। দেখতে দেখতে সেই মেঘ ছড়িয়ে পড়ল সারা আকাশে। ঝড় উঠল। বাতাসের গর্জনে, ঢেউয়ের শব্দে

মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকে, সারা বিশ্বচরাচর জুড়ে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল। সমুদ্রশূরের নাবিকরা শক্ত হাতে ধরল হাল। কিন্তু কিছুই হলো না। বিক্ষুব্ধ আর উত্তাল সমুদ্রের ক্ষ্যাপা ঢেউ গ্রাস করল সমুদ্রশূরের বজরাকে। সেই নিবিড় অন্ধকারের কালিঢালা সমুদ্রে কে যে কোথায় ভেসে গেল সমুদ্রশূর জানতেও পারল না। কিন্তু সে নিজে মাছের মত সাঁতারে পটু। তাই সে যতক্ষণ পারল সাঁতরাতে লাগল। ঝড় থেমে গেল। শান্ত হলো সমুদ্র। কিন্তু প্রমাদ গুনল সমুদ্রশূর। হাত পা যে অবশ হয়ে আসছে। বন্ধ হয়ে আসছে দম। ইস্ এই সময় হাতের কাছে যদি এক টুকরো কাঠ বা অন্য কিছু পাওয়া যেত। হঠাৎ নজরে পড়ল, কি যেন একটা ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই জাহাজের ভাঙ্গা পাটাতনের টুকরো। যেই সেটা কাছে এল অমনি বিপুল উল্লাসে জড়িয়ে ধরল সমুদ্রশূর। সর্বনাশ ! এ যে মড়া। হোক মড়া। শবদেহ কাঠেরই সামিল। বরং আরো একটু বেশি সুবিধাই হলো। কাঠের টুকরোর তো দুটো হাত নেই। সমুদ্রশূর সেই মড়ার ওপর চেপে বসল। আর সেই মরা মানুষটার ঠাণ্ডা আর শক্ত শক্ত দুটো হাত দিয়ে প্যাডেলের মত করে জল কেটে কেটে এসে উঠল অজানা একটা দ্বীপে।

এদিকে দীর্ঘদিন বাবা ফিরে আসছে না দেখে ছেলে চন্দ্রস্বামী তাকে খুঁজতে গিয়েছিল সিংহলে, গিয়েছিল পশ্চিম উপকূলের বন্দরে বন্দরে। সে কাহিনী দীর্ঘ এবং অবান্তর। কিন্তু সেকালে যে সমুদ্র-বাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল, আর ছিল বহুদর্শী ও নির্ভীক সওদাগরদের ভয়ঙ্কর দুঃসাহস সেই সত্যটিই ঘোষণা করছে কথাসরিৎসাগরের এই উপাখ্যান।

এই গুপ্তযুগেরই নাট্যকার শূদ্রকের বিখ্যাত নাটক।

মৃচ্ছকটিকের[১০] নায়িকা সেই রূপসী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার মুখে শোনা যায় বণিকের বিচিত্র স্বভাবের কথা।

বসন্ত সেনা। তন্বী স্বর্ণলতার মত তার অপরূপ দেহসৌষ্ঠব। প্রতিটি রাত্রে যার ঘরে বসে বারোবাসরের লীলা, যার রূপে মুগ্ধ অসংখ্য ভক্ত, সেই উজ্জয়িনীর নগরসুন্দরী বসন্তসেনার মুখে বিষাদের ছায়া। সখী মদনিকা একটু অবাক হয়। কামদেবের উদ্যানের সেই প্রমত্ত উৎসবের পর থেকেই রূপধন্যা বসন্তসেনা কেন যেন আনমনা। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে মদনিকা জিজ্ঞাসা করে—কার জন্য তোমার মন পুড়ছে সখী ?

কোন কথা বলল না বসন্তসেনা। কাজল টানা দুটো বড় বড় চোখে বর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করে উঠল। তুমি কি কোন বিদ্বান ব্রাহ্মণ যুবককে মনে মনে কামনা করছো ?

—না, না, ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।

—তাহলে কি দেশদেশান্তরের নগরে নগরে ঘুরে ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তি করেছে এমন কোন বণিক যুবককে ?

—না, মদনিকা, ব্যবসায়ীদের স্বভাব তুমি জানো না। মনে যার স্নেহ বদ্ধমূল হয়েছে এমন ভালবাসার মানুষকেও ফেলে রেখে দূরদেশে চলে যেতে একটুও দ্বিধা করে না বণিক। তাই ব্যবসায়ী মানুষকে ভালবাসলে দুঃখ অনিবার্য।

কথায় কথায় মদনিকা জানতে পেরেছিল, উৎসবের রাতে বাড়ীতে ফেরার সময় বসন্তসেনাকে যখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত অনুসরণ করেছিল সেই সময় যে তাকে রক্ষা করেছিল, সেই রূপবান যুবকের জন্য তার মন পুড়ছে। বসন্তসেনা তার নাম জানে না। তখন মদনিকার নিশ্চয়ই দুঃখ হয়েছিল সঙ্গীর জন্য। কারণ বসন্তসেনা যাকে ভাল বেসেছে সে 'দ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ' অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র শুধু নয়, তার জীবিকা হলো ব্যবসা।

আবার চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, নগরশোভনা বসন্তসেনার সুরম্য প্রাসাদের ষষ্ঠপ্রকোষ্ঠে ইন্দ্রধনুর মত নীলমণি খচিত স্বর্ণ ও রত্ন নির্মিত তোরণ। শিল্পীরা বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল,

কর্কেতর, পদ্মরাগ ও মরকত ইত্যাদি রত্ন সাজিয়ে রাখছে। সোনার সুতোয় মাণিকের মালা গাঁথছে। বৈদূর্যমণিগুলোকে ঘষছে। শঙ্খ কাটছে। শানযন্ত্রে ফেলে গোল করছে প্রবালগুলো।

গল্পে, উপন্যাসে বা নাটকের ঘটনার বিন্যাসে কিছু কল্পনার মিশেল থাকে। কিন্তু সমাজজীবনের যে চিত্র শিল্পী আঁকে তা একেবারে নিখুঁত সোনার মত খাঁটী। ব্যবসায়ীকে ভালবেসে বসন্তসেনার আক্ষেপ আর তার ঘরে ধনরত্নের এই প্রাচুর্যের ভেতরে বণিকশ্রেণীর সততা ও চার শতকের সেই ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ সমাজ কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল শূদ্রককে তার আভাস পাওয়া যায়।

বণিক কন্দর্পকেতুর কাহিনী আছে হিতোপদেশে।[১১] এই হিতোপদেশেই বলা হয়েছে, সমুদ্র অতিক্রমনের একমাত্র যান হলো জাহাজ।

ভর্তৃহরির নীতিশতকেও[১২] অর্ণবযান সমুদ্র-বাণিজ্যে একমাত্র অবলম্বন সমুদ্রগামী জাহাজের জয়গান করা হয়েছে। পোতো দুস্তর-বারিরাশি তরণে···প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে দূরীভূত করে তেমনি সমুদ্রের দুস্তর জলরাশিকে অতিক্রম করতে পারে একমাত্র জলযান।

কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'তে[১৩] আছে—

সন্ধিবিগ্রহকঃ সোথ গচ্ছন্ পোতাচচ্যুতোম্বুধৌ

কাশ্মীররাজ জয়াগীড়ের যুদ্ধ ও শান্তির মন্ত্রী অর্ণবযানে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। সেই সময় তিনি পোতাচ্যুত অর্থাৎ জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর এই ভাগ্য বিড়ম্বিত মন্ত্রীর সেই কাহিনী অতীব বিচিত্র ও রোমঞ্চকর।

সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে লাগলেন মন্ত্রী মহাশয়। একটা বিশালকায় তিমি মাছ তাঁকে গ্রাস করল। কিন্তু তিনি মন্ত্রবলে সেই তিমি মাছের পেট চিরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর দিব্যি সুস্থ দেহে সমুদ্র পার হয়ে পৌছেছিলেন লঙ্কায়। লঙ্কেশ্বর বিভীষণের

কাছ থেকে পাঁচজন রাক্ষস বাস্তুশিল্পীকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' গ্রন্থেও আছে বাংলাদেশের জল-বাণিজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ইঙ্গিত। রামচরিতম্ একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ তথা পালবংশের অগ্রগতির এক অমর আলেখ্য।

রাজা ধর্মপাল। পরাক্রমে তিনি ভীম। তেজস্বীতায় তিনি ইক্ষ্বাকু। বিশ্বচরাচরের দিগদিগন্তে ভেসে যেত তার অর্ণবযান। আর সেইসব অর্ণবযানে থরে থরে সাজানো থাকতো এই বাংলাদেশেরই মাটির বিচিত্র পণ্যসম্ভার।

রাম চরিতম-এ আছে, যস্যাব্ধিং তীর্ণা গ্রাবনৌ[১] 'ররাজ্যাপি কীর্তিরবহুতা লবণাক্ত' সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আঘাত আর সাঁ সাঁ হাওয়ার চাবুককে হেলায় তুচ্ছ করে নিরুদ্বিগ্নে চলে যেত সেইসব পণ্যতরী। তাই ধর্মপাল সস্নেহে তাদের নাম দিয়েছিল 'গ্রা-বনৌ অর্থাৎ পাথরে গড়া নৌকা।

এই প্রসঙ্গে রামচরিতমের ভাষ্যকার বলেছেন, "তিক্ত অলাবু যেমন জলে ভাসে সেইরূপ তাঁহার (ধর্মপালের) শিলা নৌকা নামক অর্ণবযানসমূহ সমুদ্রতীরস্থ প্রাসাদ হইতে দিকচক্রবাল লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া শোভা পাইত। তাঁহার কীর্ত্তির বত্ত সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।"

সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে আছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্র। আছে মণিমুক্তোর কথা। বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে মণিমুক্তোর প্রচলন খুব বেশী ছিল। একথা বলাবাহুল্য, গভীর সমুদ্রের অতলে যে মণিমুক্তো থাকে তা নৌবিদ্যায় নিপুণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নাবিক ছাড়া আর কেউ আহরণ করতে পারে না।

বরাহমিহির এবং গরুড় পুরাণ ও ভোজের মতে মুক্তা সংগ্রহের প্রচলন ছিল সারা মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর জুড়ে। আর মণি-মুক্তার ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল সিংহল, পারলৌকিক সৌরাষ্ট্র, পারসব, কৌবের, পাণ্ডবাটক এবং হৈমদেশ।

সিংহলবাসীরা নকল মুক্তা তৈরী করতে পারতো। মান্নার উপসাগরে প্রচুর পাওয়া যেত মুক্তা। তাই তারা এই উপসাগরকে বলতো আলাভম্ অর্থাৎ লাভের সমুদ্র।

বহু দূর অতীতে সমুদ্রের সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা যে আমাদের অতীত বংশধরদের ছিল এবং সমুদ্রের সাহায্যেই যে তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতো তার বিপুল স্বাক্ষর বহন করছে বেদ, সূত্র, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য আর উপাখ্যান।

পঞ্চম প্রবাহ

তম্ অথং সখা অভিনন্দো হুত্বা কথেন তো
বাণিজা সমিতিং কত্বা নানারট্ঠাতো আগতা
ধনহারায় পকম্মিংসু একং কত্বান গামণিম্ ॥

—মহাবাণিজজাতক

বেদ, সূত্র, পুরাণ আর সংস্কৃত সাহিত্যের কালজয়ী কাব্যে, নাটকে, রূপকথায় সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রমাণগুলো পৌরাণিককালের কুয়াশায় ঢাকা তারার মত ঝিকমিক করে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে, জাতকে, সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে। সেই প্রমাণগুলোই কালের আবরণ সরিয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

'রাজা রত্নচারী,' 'রাজবল্লীয়ে' আর 'মহাবংশ'—সিংহলের এই তিনটি ধর্মীয় ইতিহাসে (Sacred and historical books of Ceylon) আছে বাঙ্গালীর সমুদ্র বাণিজ্যের অজস্র স্বাক্ষর ; আছে বাঙ্গলাদেশের তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলে নিয়মিত পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতের আভাস। সেদিন ধর্মচর্চা আর বাণিজ্য চলতো পাশাপাশি। ব্যবসায়ীরা যে সমুদ্রপথে জাহাজ ভাসিয়ে দূরদেশে যেত—সেই পথেই যেত ধর্মপ্রচারকরা, যেত সাধারণ মানুষ। তাই মহারাজ বঙ্গাধিপতি সিংবাহুর পুত্র বিজয়সিং নির্বাসিত হয়ে সিংহলে যেতেই মনস্থ করেছিলেন। আর সেদিনের বাঙ্গালীর যে নৌবিদ্যায় ছিল সহজাত পটুত্ব তার প্রমাণ নির্বাসিত রাজপুত্রের সহযাত্রী হয়েছিল সাতশো সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত নাবিক। তাদের নৌবহর রওনা হয়েছিল প্রাচীন বন্দর সিংহপুর থেকে। সিংহপুর থেকে রওনা হয়ে সুপারা বন্দরে নোঙর করেছিল বিজয়সিংহের নৌবহর। কোথায় এই সুপারা বন্দর? ঐতিহাসিক ডক্টর বার্জেস বলেন—দাক্ষিণাত্যের

পশ্চিম উপকূলে বেসিন থেকে কিছুদূরে অবস্থিত এই সুপারা বন্দর। রাজবল্লীতে[২] আছে বিজয়সিংহ সিংহল দ্বীপে প্রবেশ করেছিলেন দক্ষিণদিক থেকে: They landed at the place called Tammenue-tota (the Southern third part of Ceylon) and went to rest under the shadow of a neighbouring tree Nogigaha। রাজপুত্র বিজয়সিংহ 'নোগিগাহ' গাছের নীচে বিশ্রাম করতে করতে হয়তো ভাবছিলেন কেমন করে এই অজানা দেশটাকে জয় করা যায়। তার রক্তের ভেতরে যেমন ছিল যুদ্ধের নেশা আর দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার উন্মাদনা তেমনি ছিল ব্যবসায়ীর মত তার মূল্যবান পাথর সংগ্রহের ঝোঁক। রাজার ছেলে। কিন্তু পাকা জহুরীর মত নানারঙের, নানা শ্রেণীর পাথর চিনতেন। তারই একটি মহামূল্যবান পাথর উপহার পাঠালেন পাণ্ড্যদেশের রাজাকে। সেই অমূল্য আর সুদৃশ্য প্রস্তর দেখে খুব খুশী হয়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন রাজকুমারী আর তার সাতশো সহচরী। এই রাজকুমারীই কেমন করে তার রাণী হয়েছিল আর কেমন করে লঙ্কা জয় করে নিজে রাজা হয়ে বসেছিলেন সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর উপাখ্যান আছে মহাবংশে।[৩]

সুপ্পারকের[৪] এক বিপুল সম্পদশালী সওদাগর পুন্ন।

পুন্ন তার অনুজ চুলপুন্নের সঙ্গে সমবায় ব্যবসা করতো। তারা সুদূর উত্তর কোশলে গিয়েছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

শ্রাবস্তী নগরে এসে তারা শুনতে পেলো, বুদ্ধদেব এইখানে তাঁর বাণী প্রচার করছেন। পুন্ন ব্যবসার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যে এল। তাঁর মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণী শোনামাত্র পুন্নর মনের ভেতরে এক বিপুল আলোড়ন বয়ে গেল। শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

শুধু তাই নয়। পুন্নও তার সহধর্মী ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করল শ্রাবস্তী নগরে এক বিহার নির্মাণ করতে।

ব্যবসায়ীদের জাহাজে ছিল সুদৃশ্য সুগন্ধময় ও রক্তবর্ণ চন্দন-কাষ্ঠের নয়নাভিরাম পণ্যসম্ভার। এই চন্দন কাঠ দিয়েই শ্রাবস্তী নগরে নির্মাণ করা হয়েছিল বৌদ্ধবিহার।

সেই সুদূর অতীতকালের পুন্নর উপাখ্যানে আছে তাদের অর্ণবযানের বিস্ময়কর বর্ণনা। সেই কুয়াশাময় বিগতকালে এই বিশাল জাহাজ তারা কেমন করে তৈরী করেছিল তার ইতিহাস কোথাও লেখা নেই। শুধু আছে তার বিশদ বিবরণ।

পুন্নর জলযান এত বিরাট ছিল যে এর ভেতর তার প্রায় তিনশত সওদাগর সহকর্মী আরামে ভ্রমণ করতে পারতো। সেই তিনশত সওদাগরকে বহন করেও দাক্ষিণাত্যে চন্দনকাষ্ঠের পণ্য-সম্ভারের জন্য স্থানের অসঙ্কুলান হতো না।

টাপুসা আর প্যালেকাট।[৫] দুই ভাই। জাতে বর্মী, ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত সওদাগর। এই দুই ভাই বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে দূরদেশে গিয়েছিল ব্যবসা করতে। তাদেব জাহাজে ছিল প্রায় পাঁচশত শক্ত মজবুত মালটানা গাড়ী। তারা ভারতের পূর্ব-উপকূলে কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত এ্যাডমিয়েট্টা বন্দরে তাদের জাহাজ নোঙর করেছিল। তারা মগধে যাওয়ার পথে সুভামা বন্দরে তাদের পণ্যসম্ভার কিছু বিক্রয় করেছিল। এই টাপুসা আর প্যালেকাটের উপাখ্যান আজও স্বাক্ষর বহন করছে সেকালের বিপুল বাণিজ্য বিস্তারের। সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে সমুদ্র পার হয়ে আরও—আরও দূর দেশদেশান্তরে ব্যবসাব বিস্ময়কর প্রসার হয়েছিল।

শুধু ব্রহ্মদেশ কেন? সিংহল রাজকুমারী রত্নাবলীর উপাখ্যানে আছে শ্রাবস্তীর সওদাগরদের সমুদ্রযাত্রার বিচিত্র বর্ণনা। বৌদ্ধ-যুগের অজস্র কাহিনীতে, উপাখ্যানে এমন অনেক ঘটনার বিবরণ আছে, যা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এ দেশের সঙ্গে পারস্যের, সিংহলের এবং আরও বহুদেশের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ছিল।

'দীপবংশ'। বৌদ্ধযুগের আর একটি গ্রন্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রেভারেণ্ড টি ফাউলকেস মন্তব্য করেছেন : এই গ্রন্থের কাহিনীর আড়ালে একটি সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের উপকূল পর্যন্ত সমুদ্রপথের অস্তিত্ব ছিল। আর একটি বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু'[৬] এই গ্রন্থে আছে, ভারতীয় বণিকরা 'জম্বুদ্বীপ' অর্থাৎ ভারতবর্ষেরই এলাকা থেকে যেত ব্যবসার জন্য দূর দেশদেশান্তরে। একবার সমুদ্রে উঠল ঝড়। সেই ঝড়ো বাতাস আর উত্তাল ঢেউ মত্ত আক্রোশে বণিকদের অর্ণবযান ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। দুর্ভাগ্য বিড়ম্বিত বণিকেরা অতিকষ্টে সাঁতরে এসে উঠল এক অজানা দ্বীপে। বিচিত্র সেই দ্বীপের প্রতিটি অধিবাসীই স্ত্রীলোক। মহাবস্তুর পাতায় জ্বলজ্বল করছে সেই প্রমীলাদ্বীপের ইতিবৃত্ত।

জাতক কাহিনীর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে বুদ্ধের সমসাময়িককালের বণিকদের ব্যবসার বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

'বাবেরুজাতকে'র[৭] কাহিনীটি বৌদ্ধযুগের সমুদ্র-বাণিজ্যের আভাস বহন করে। কি সেই গল্প?

বারাণসীর সওদাগরেরা ছিল সমুদ্রযাত্রায় অত্যন্ত নিপুণ। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে তারা চলে যেত দেশদেশান্তরে।

বারাণসীর নৃপতি ব্রহ্মদত্ত। তিনি শুধু প্রজানুরঞ্জন ছিলেন না, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের দিকেও তাঁর খুব সজাগ দৃষ্টি ছিল। বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তিনি একদল বণিককে বাবেরু-রাজ্যে (আধুনিককালের ব্যবিলন) বাণিজ্য করতে পাঠিয়েছিলেন।

সওদাগরেরা বারাণসী থেকে সমুদ্রযাত্রা করেছিল। সঙ্গে ছিল একটা 'দিশা কাক'। জাতকের কাহিনীকার ও অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষের মতে 'দিশা কাক' অর্থে পোষা কাক। সেকালে সমুদ্রের দিগদিগন্তব্যাপী বিপুল জলরাশির ভেতরে স্থির নিশ্চিতভাবে দিক

নির্ণয় করার জন্য পোষা কাক সঙ্গে নিতেন সওদাগরেরা। যখন নাবিকেরা বিপুলব্যপ্ত সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেলতো তখন এই কাককে উড়িয়ে দেওয়া হতো আকাশে।

কাক ডানা মেলে বিশাল আকাশে উড়ে যেত। যেত কুয়াশাময় কোন একটা সুদূর দিকচক্রবালের দিকে। নাবিকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতো। সিদ্ধান্ত করতো কাক যেদিকে উড়ে গিয়েছে সেইদিকেই আছে মাটির নিশানা, আছে আশ্রয়ের আশ্বাস। সেইদিকেই জাহাজ চালাতো তারা।

বারাণসীর বণিকরা এই রকম একটি সুশিক্ষিত ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বায়স নিয়ে বাবেরুর বন্দরে যেই পৌঁছলো অমনি বাবেরুবাসীরা বলতে শুরু করল—আহা কী সুন্দর পক্ষী! কি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ!

—সে কী! তোমাদের এই রাজ্যে কি কাক নেই?

—না, নেই, তোমরা এই পক্ষীটি বিক্রি করবে?

চলল দরকষাকষি। শেষ পর্যন্ত একশো কাহন নিয়ে বারাণসীর বণিকরা বিক্রি করে দিল সেই 'দিশা কাক'।

আর একবার বারাণসীর সওদাগরেরা বাবেরুরাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল অনেকগুলি সুদৃশ্য বিচিত্রবর্ণের ময়ূর। বলাবাহুল্য ময়ূররূপী বোধিসত্ত্ব!

বাবেরুবাসীরা ময়ূর দেখে মুগ্ধ। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুদৃশ্য শিখীর চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছের দিকে। এবারও তারা বারাণসীর বণিকদের কাছে কাকুতি-মিনতি করে হাজার কাহন দিয়ে এই ময়ূর ক্রয় করল।

এই ময়ূর পাওয়ার পরই কাকের অনাদর সুরু হলো। মৎস্য বন্যফল, মধু, শর্করামিশ্রিত জল খেয়ে ময়ূর দিনে দিনে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আর কাক কা কা করে ডাকতে ডাকতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো।

জেতবনে বসে এই কাহিনী বলতে বলতে শাস্তা শিষ্যদের

উপদেশ দিয়েছিলেন, যখন মহাধার্মিক বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই তখন অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিকেরাই জনসাধারণের পূজা পেত।

যতদিন দেখে নাই চিত্রপুচ্ছ, স্নিখাবান, মঞ্জুস্বর ময়ূর কেমন মৎস্য-মাংস উপচারে, বাবেরুবাসীরা সবে করেছিল কাকের পূজন।

রূপক গল্প। শিখীরূপী বোধিসত্ত্বের জয়গান। সব জাতকের কাহিনী যেমন এও তেমনি। কিন্তু—

কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেই একটি ঐতিহাসিক সত্য আছে। অধ্যাপক মিনায়েফ (Profesor Minayef) বলেছেন, Hindu merchants expoted peacocks to Baveru. হিন্দু সওদাগরেরা বাবেরুরাজ্যে অর্থাৎ ব্যাবিলনে ময়ূর রপ্তানী করতো।

বাবেরুজাতকের মত আর এক জাতক হলো সূচীজাতক।[৮] এই সূচীজাতকের কাহিনী আর ছড়া সেই সুদূর অতীতে ব্যবসার ইতিহাসের ঘন অন্ধকারে যেন আলোকপাত করে।

'সূচ বল বঁড়শী বল, যে জন যা চায়
এইখানে তা তৈয়ার হয়ে অন্য গাঁয়ে যায়।
হেথা হাজার ঘর কামার,
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

হাজার হাজার বছর পূর্বে যখন পৃথিবীর কোথাও কেউ ধাতুর ব্যবহার জানতো না, জানতো না তার অস্তিত্ব তখন কেমন করে এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে নিপুণ কর্মকারেরা ললিত অঙ্গুলি বিন্যাসে নির্ভুল ছন্দে-যতিতে ফুটিয়ে তুলতো আশ্চর্য সব কারুকার্য। কেমন করে কর্মকাররূপী বোধিসত্ত্ব সুন্দর ও নিখুঁত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূচ নির্মাণ করেছিলেন?

বোধিসত্ত্ব নিজেই তাঁর সূচের গুণমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন:

শানে ঘষা সরু অতি সূচ কিনবে কে?
খুব চোখালো আগাটি তার দেখনা এসে।

মাজা ঘষা আগাগোড়া সুগোল সূচ নিবে ?
এমন শক্ত, ঘা দিলে তার নেহান বিদ্ধিবে !

শুধু গুণ বর্ণনা নয়, বোধিসত্ত্ব কর্মকার অধ্যুষিত গ্রামে সহস্র কর্মকারের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর সূচের কার্যকারীতাও দেখিয়েছিলেন।

এই সূচ এত সূক্ষ্ম যে জলে ভাসতো। এত দৃঢ় যে লোহার পাত একেবারে ভেদ করে চলে যেত। একটা নয়, পর পর সাতটা কোষের (সূচাকৃতি ফ্রেমের মত ভেতরে রাখতে হতো এই সূচ)— এত সরু এই সূচ।

নেহাত রূপক গল্প। কিন্তু সত্যকে অবলম্বনে গড়ে ওঠে রূপক গল্প। নিপুণ ও সুদক্ষ কর্মকার বোধিসত্ত্বের সূচ বিক্রির ভেতরে ফুটে ওঠে সেকালের লোহা, রূপোর ব্যবসার প্রসারতার ইতিহাস।

বৌদ্ধযুগে ব্যবসায়িক বিপুল সমৃদ্ধির ইতিহাস। জেতবনে বসে শাস্তা বলছেন—

'নানা রাজ্য হতে আসি মিলিয়া বাণিজগণ
নেতৃপদে একজনে করিল বরণ
শকট পুরিয়া পণ্যে যায় সব একসঙ্গে
করিতে বাণিজ্য দ্বারা ধন আহরণ।'

এই ছড়াটুকুর ভেতরে অজস্র বণিকের পদশব্দে মুখরিত কর্ম-চঞ্চল বাণিজ্যনগরী বারাণসীর ছবি ফুটে ওঠে।

এই বারাণসীর উপকণ্ঠে ছিল তৃনহীন, শস্যহীন এক দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আর এই প্রান্তরের শেষপ্রান্তে ছিল একটি ন্যগ্রোধ অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ।

একদল বণিক প্রান্তর পেরিয়ে এসে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে এই বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিল। কিন্তু তারা জানতেও পারলো না যে

এক মহাশক্তিধর নাগরাজ এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষটিকে দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় রাখে।

বণিকেরা সবিস্ময়ে দেখল, বৃক্ষটির সতেজ শাখাগুলি খুব জলসিক্ত। সঙ্গে সঙ্গে তারা পূর্বদিকের একটি শাখা ছেদন করল। তৎক্ষণাৎ নির্গত হতে লাগল তালস্কন্ধপ্রমাণ জলধারা। সওদাগরদের তৃষ্ণা দূর হলো। তাদের লোভ আরও বাড়ল।

কাটল দক্ষিণের শাখা। বেরিয়ে এল নানাবিধ সুরস খাদ্য। কাটল পশ্চিমদিকের ডাল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষে নূপুরনিক্কনের ধ্বনি শোনা গেল। সালঙ্কারা সুঠাম তনু রমণীদের আবির্ভাব হলো। কাটল উত্তরের শাখা। আকাশ থেকে সপ্তরত্ন বর্ষণ শুরু হলো।

সওদাগরদের রক্তে রক্তে লোভের বিষ। দু'পয়সা রোজগারের জন্য বহু ক্লেশ বরণ করে তারা। তারা ঠিক করল, এত যখন পেয়েছি তখন ন্যগ্রোধকে সমূলে ছেদন করলে আরও অনেক কিছু পাবো।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। নাগকন্যা প্রচণ্ড আক্রোশে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠলেন। সওদাগরদের প্রাণ রেখে যেতে হলো।

'মহাবাণিজজাতকে'র গল্প। উপদেশমূলক গল্প। কিন্তু বৌদ্ধযুগের সওদাগরদের বাণিজ্যের জন্য অসাধারণ কষ্ট বরণের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

এই প্রসঙ্গে 'সেরিবাণিজ জাতকে'র [২] সেই দুর্দান্ত লোভী বণিক সেরিবার কথাও মনে পড়ে। বোধিসত্ত্ব আর সেরিবা একই গ্রামে ফেরি করে কলসী বিক্রি করতে গিয়েছিলেন।

সেরিবা কেমন করে একটি সুবর্ণনির্মিত কলসীকে একেবারে বিনামূল্যে ঠকিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল এবং কেমন করে মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করেছিল সে কাহিনী অনেকেই জানেন। কাহিনী এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পিতল-কাঁসার

নির্মিত কলসী তথা লৌহ ইত্যাদি ব্যবসার অস্তিত্ব ছিল সেই প্রাচীনদিনের ভারতবর্ষে।

জরুদাপান জাতক।

জরুদাপান জাতকের[১০] কাহিনী আমাদের নিয়ে যায় শতসহস্র বছর আগে, নিয়ে যায় সেই ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন অতীতে যখন পৃথিবীর এই প্রাচীনতম ভূমি ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে বিচিত্র পণ্যসম্ভার-বাহী শত শত শকট যাওয়া-আসা করতো দূর দূরান্তরে—যখন অগণিত বণিক স্বজন-পরিজন পরিত্যাগ করে ধন সম্পদ আহরণের জন্য চলে যেত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দূরদেশে।

সেই পুরাকালের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র বারাণসী। বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। এই সময় এক সম্পদশালী শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব। বয়সকালে একজন সুদক্ষ ও প্রকৃত সার্থবাহ (বণিক) হয়ে উঠলেন তিনি।

শ্রাবস্তীবাসী কয়েকজন বণিক এল বারাণসীতে। তাদের পণ্য বিক্রি করে বারাণসীর পণ্যে তাদের শকটগুলি পরিপূর্ণ করল।

—আপনি একজন কৃতী সার্থবাহ। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন বিদেশে? বিদেশী বণিকেরা ভগবান তথাগতের সঙ্গ কামনা করল।

বোধিসত্ত্ব সম্মতি দিলেন। শুরু হলো সম্মিলিতভাবে বাণিজ্য যাত্রা। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি বহুগ্রাম ও নগর অতিক্রম করে এক দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে এসে পৌঁছলো তারা। মাথার ওপরে আকাশে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য জ্বলছে। প্রচণ্ড দাবদাহে চারিদিক যেন পুড়ে যাচ্ছে। বণিকরা পিপাসার্ত হলো। কিন্তু—

কোথায় জল? ধুধু দিগ্‌বিস্তীর্ণ বিশাল ভয়ঙ্কর মরুভূমির মত সেই প্রান্তর! কোথাও এতটুকু সবুজ তৃণের আভাস নেই, নেই

কোন বৃক্ষের স্নেহচ্ছায়া। দিকদিগন্তে শুধু সাঁ সাঁ বাতাসে বালির ঝড় উঠছে।

—আসুন, আমরা এই মরুপ্রান্তরে কূপ খনন করি। আমাদের তৃষ্ণার অবসান হবে। ভবিষ্যতেও যারা এই ভয়াবহ প্রান্তর অতিক্রম করবে তারা আমাদের মত তৃষ্ণায় এত কষ্ট পাবে না। তথাগত আপত্তি করলেন না।

শুরু হলো কূপ খনন। একটু খুঁড়তেই লৌহ থেকে আরম্ভ করে বৈদূর্য্যমনি পর্যন্ত বহুবিধ খনিজদ্রব্য বেরোতে লাগল। লোভের আভায় দগদগে ঘায়ের মত সওদাগরদের চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করল।

—আর আপনারা খুঁড়বেন না, বিপদ হবে। ভগবান তথাগত সতর্ক করলেন। কিন্তু—

কিন্তু অর্থলোভী সওদাগরেরা তাঁর সতর্কবাণী শুনল না। মৃদ্ভেদী নাগরাজ একেবারে স্থির নিশ্চিত মৃত্যুর মত তাদের সামনে এল। লোভী বণিকেরা সাঙ্গ করল ভবলীলা।

এই হলো জরুদাপান জাতকের গল্প। কিন্তু মহাকালের শাসন এড়িয়ে, হাজার হাজার বছরের বিস্মৃতির ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে আধুনিককালের মানুষকে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই রূপক গল্প? কিসের আভাস দিচ্ছে এই ছড়া?

উদকার্থে পুরাতন, কম্নিয়া কূপ খনন
পেয়েছিল বণিকের দল;
লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা বহু
বৈদূর্য্য রতন সমুজ্জল।

সেই সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগের ধাতুর ব্যবসারই একটা আভাস স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই গল্পে, ফুটে উঠেছে এই ছড়ায়।

"আমার গৃহে ধনক্ষয় হইলে আর দান করিতে পারিব না।

ধনক্ষয় হইবার পূর্বেই পোতারোহণে সুবর্ণভূমিতে গমনপূর্বক তথা হইতে ধন আনয়ন করা যাউক" শঙ্খজাতক।[১১]

স্মরণাতীতকালের বাণিজ্যকেন্দ্র পুণ্য বারাণসীধামের এক প্রভূত বিত্তশালী বণিকের উক্তি। বণিকের নাম শঙ্খ। নগরের চতুর্দ্বারে নগরের মধ্যে ও নিজের গৃহদ্বারে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করেছিলেন তিনি। প্রতিদিন সেই প্রাগূষা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুঃস্থ, কাঙ্গাল ও বিদেশী পথিককে বিপুল অর্থ দান করতেন শঙ্খ।

বারাণসীর জনসাধারণের মনে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করতেন সওদাগর। তিনি ধার্মিক, দানশীল ও উদার। তাই—

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সমুদ্রযাত্রায় ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে এলেও তিনি বোধিসত্ত্বের দয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় অনেক দুঃখবরণ করার পরে সপ্তরত্নময় একটি পোতও উপহার পেয়েছিলেন।

এই অর্ণবপোতের নিখুঁত বিবরণ বৌদ্ধযুগের নৌশিল্পের প্রভূত উন্নতির কথাই যেন হাজার হাজার বছরের বিস্মৃতির ওপার থেকে ঘোষণা করছে।

সেই দানফল আজি ফলক নির্মিত।
পোতরূপ ধরিয়া করুক মোর হিত॥
প্রবেশে না জল যেন ভিতরে তাহার।
সুবাতাস পেয়ে হোক পারাবার পার॥

সওদাগর শঙ্খ একসময় ভগবান তথাগতকে একটি ছত্র ও পাদুকাযুগল, দান করেছিলেন। তাই তিনি পরিতৃপ্ত অন্তরে চিন্তা করছেন—তার দানফল যেন অর্ণবপোতের রূপ ধরে আসে। কিন্তু সে পোত হবে দৃঢ়, মজবুত······

সেই অর্ণবযানের বর্ণনা শুনুন। দৈর্ঘ্য আট উসভ অর্থাৎ (১৪০ × ৮) বিস্তার চারি উসভ এবং বেধ ২০ যষ্টিক (২০ × ৭ হাত) ছিল। আর—

মাস্তুল ?

মাস্তুল ছিল ইন্দ্রনীল মণিময়। রজ্জুগুলি ছিল সুবর্ণময়। আর রূপো দিয়ে নির্মিত হয়েছিল অর্ণবযানের গাত্র।

মনে হয় শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির ঘন কুয়াশার ওপার থেকে বৌদ্ধযুগের সমুদ্র বাণিজ্যের ও নৌ-শিল্পের বিস্ময়কর প্রসারের ইঙ্গিত বহন করছে 'শঙ্খজাতকের' কৃতী সার্থবাহ শঙ্খের এই বিচিত্র অর্ণবযান।

সেই সুদূর অতীতকালে পৃথিবীর এই সুপ্রাচীন মৃত্তিকা শুধু বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের পদশব্দে মুখরিত ছিল না ; আকাশে বাতাসে শুধুই ঝঙ্কৃত হতো না সেই বিখ্যাত স্তোত্র ধর্মং শরণং গচ্ছামি···ভারতের নগরে নগরে রাজপথে রাজপথে অব্যাহত ছিল বণিকদের পণ্যবাহী শকটের গৌরবময় বাণিজ্যযাত্রা। কৃতী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সওদাগরদের অর্ণবপোত হংসবলাকার মত পাল তুলে চলে যেত দূর বন্দরে বন্দরে।

তাই দেখা যায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত দরিদ্র যুবক তার দুঃখিনী মা-কে বলছে—তুমি ভেব না, আমি দূরদেশে যেয়ে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে নিয়ে আসবো।

মহাজনকজাতকে[১২] বর্ণিত রাজকুমার অরিষ্টজনকের পুত্র বলেছিল ওপরের এই কথাগুলো। অরিষ্টজনককে তার অনুজ পোলজনক যুদ্ধে নিহত করেছিল। অরিষ্টজনকের গর্ভবতী পত্নী আশ্রয় নিয়েছিল অরণ্যে।

কালক্রমে সেই জনমানবহীন বিজন অরণ্যে জন্ম হলো অরিষ্ট-জনকের পুত্রের। দিনের পর দিন কাটে। মাসের পর মাস কেটে যায়। ধীরে ধীরে যৌবনপ্রাপ্ত হলো সেই পুত্র। কিন্তু সহায়হীন সম্বলহীন দীন-দরিদ্রের জীবন আর কতদিন—আর কতদিন যাপন করা যায় ? তাই অরিষ্টজনকনন্দন বলেছিল—মা, আমি দূরদেশে যেয়ে ব্যবসা করে অর্থোপার্জ্জন করবো।

এই ঘটনার ভেতর এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধযুগে ব্যবসা করে অর্থ রোজগারের উপায় খুব সুগম ছিল। হাজার হাজার বছরের তমাসাচ্ছন্ন অতীতের ভেতর থেকে যেন আলো-ঝলমলে একটা ছবি ফুটে ওঠে, "কুমারের পোতে তিনশত আরোহী ছিল··· সাত দিনে সপ্তযোজন অতিক্রম করিল অতি দ্রুতবেগে···এই পোতে সার্থবাহ কুমারের পণ্য ও বাহনপোযোগী পশু ছিল······

জাতককাহিনী যেমন অজস্র তেমনি অজস্র ও অগণন তার ভেতরে শ্রেষ্ঠী আর বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত। মনে হয় সেই পুরাকালে যখন এই দেশের নগরে গ্রামে 'ইণ্ডাষ্ট্রি'র জন্ম হয় নি—জন্ম হয় নি কল-কারকানার, তখন মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল বাণিজ্য।

মহাকৃপণ কৌশিক শ্রেষ্ঠীর কথা আছে 'সুধাভোজন[১৩] জাতকে'। 'পীঠজাতকে'[১৪] আছে তপস্বী ও শ্রেষ্ঠীর কাহিনী। পাণ্ডর-জাতকের[১৫] শুরুতেই আছে—পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে পঞ্চাশশত বণিক সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল···

জেতবনের নিবিড় নীলাভ ছায়ায় বসে শাস্তা অর্থাৎ ভগবান তথাগত তাঁর শিষ্যদের যে জাতককাহিনী বলেছিলেন, সেই জাতকের গল্পে যেন মুখর হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ এই দেশের নিঃশব্দ ইতিহাস। আর—

আর যেন হাজার হাজার বছর পরের সপ্তসাগর প্রসারিত পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের সেই দূর ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দিয়ে যায় মহাকালের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে।

হিন্দুযুগ

ষষ্ঠ প্রবাহ

> মহাস্থানের ব্রাহ্মীলিপিতে 'গণ্ডক' (Gandak) নামক মুদ্রার ও 'পুণ্ড্রনগরের' উল্লেখ আছে ; এ নগরের সঞ্চয় গৃহ (Store-house) 'গণ্ডক' ও 'কাকনিক' নামক মুদ্রায় পরিপূর্ণ থাকতো।[১]
>
> —বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস

মৌর্যযুগের পূর্বের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই প্রাক-মৌর্যযুগে ভারতীয় অর্থাৎ বাঙালীর জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন ছিল তা জানা যায় না। তবুও—বেদ-স্মৃতি-সূত্র-পুরাণের মন্ত্রে. জাতকের কাহিনীতে অন্যান্য বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের উদার বাণীতে সেই আদিকালের ব্যবসার কথা ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টের জন্মেরও শত শত বছর পূর্বে বাঙালী পৃথিবীর দূর দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং আর্যদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটি সত্য—দীর্ঘ ত্রিশ-শতাব্দী ধরে (খ্রীষ্টের জন্মের আগে) ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত রাণীর মহিমায় বিরাজ করতো। তাই এক মনস্বী ঐতিহাসিক বলেন[২]

India···cultivating trade relations successively with Phoenicians, Jews, Assyrians, Greeks, Eygptians and Romans in ancient times.

গ্রীস, এ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো বাঙালী সেই সুদূর অতীতকাল থেকে। বাবেরুজাতকে ব্যাবিলনের সঙ্গে পূর্বপ্রাচ্য অর্থাৎ বঙ্গদেশের ব্যবসার আভাস আছে সে কথা আগে বলা হয়েছে।

সেই সাবেকদিনের বাণিজ্যের এক বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন ঐতিহাসিক ডক্টর সেস (Dr. Sayce)[৩]—ব্যাবিলনের বাজারে আমদানী জিনিসের ভেতরে একধরণের মসলিন দেখা যেত, তার নাম ছিল "সিন্ধু"। যারা এই বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রসম্ভারের পণ্য নিয়ে আসতো তারা কেউ 'স' বলতে পারতো না। বলতো "হিন্দু"। এই সিন্ধু মসলিনের পণ্য যেত বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের উপকূলের গা ঘেঁষে সেই সুদূর ব্যাবিলনে।

প্রাকমৌর্যযুগের ব্যবসার আরও অনেক—অনেক স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে দূর বিদেশের পথে-প্রান্তরের ধ্বংসজীর্ণ দেবায়তনে, বিশাল সৌধের কঙ্কাল চূর্ণের ভেতরে। সুদূর বিদেশের সেকালের এক বিখ্যাত রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে পাওয়া গেছে একটি বিশাল বরগা। শাল কাঠের তৈরী বরগা, তাতে কালের এতটুকু স্পর্শ পড়েনি। এতটুকু বিবর্ণ হয়নি সেই শাল কাঠ।

কোথা থেকে যায়, কেমন করে যায় সেই বাংলা দেশের শাল তরুর কাঠ দূর বিদেশে? গ্রীসে, পারস্যে আরও অন্যান্য দেশে ধান, ময়ূর এবং চন্দন কাঠের নাম অজ্ঞাত ছিল না সেই দূর অতীতেও।

সেই সুপ্রাচীনকালে যখন সোনার ব্যবহার এবং তার মূল্য পৃথিবীর বহুদেশ জানতো না তখন এই দেশের বণিকরা পারস্যের রাজা ডেরিয়াসকে নজরানা দিয়েছে সোনা দিয়ে। হেরোডোটাসের[৪] মত বিদগ্ধ ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন যে—All the other nations paid in silver. অর্থাৎ সবাই সম্রাটকে নজরানা দিত রূপো দিয়ে।

প্রাক্‌মৌর্যযুগের ব্যবসায়ের প্রসার নিয়ে কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। কিন্তু দেশে ও বিদেশের ভ্রমণকারী, ধর্মপ্রচারকদের বিবরণে, পুরাণশাস্ত্রে স্বাক্ষর পাওয়া যায় এক সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসারতার।

দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার দৃপ্ত গর্বিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ভারতবর্ষের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে।

৩২৫ খ্রীষ্টপূর্ব।

দেশে চলেছে মৌর্যশাসন, বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আসীন। চাণক্যের মত মহাজ্ঞানী মহামাত্য। বিদ্যায়, সংস্কৃতিতে আর ব্যবসাবাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধ তখন এই দেশ।

ইতিহাস বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার। তাঁর রক্তের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রাজ্য বিস্তারের দুর্বার লোভ। কিন্তু সিন্ধু নদের তীরে সবিস্ময়ে এসে দেখলেন[৫]—সেই বিশাল ভয়ঙ্কর নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত শত শত রণতরী দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছে। তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে বিদেশী শত্রুর। ঝিলমের মত পাহাড়ী খরস্রোতা নদীতে পর্যন্ত সৈন্য বোঝাই অসংখ্য নৌকা দীর্ঘ সেতুর মত করে সাজানো। এই দুটি নদী পার হতে না পারলে সোনার দেশ "গঙ্গাহ্রদীতে" যাবেন কি করে! কিন্তু পার হতে গেলেই সম্মুখযুদ্ধ অনিবার্য। রণনিপুণ বীর আলেকজাণ্ডার ভীত হলেন না। তার মনে চিন্তার প্রবাহ বয়ে যেতে লাগল। এত নৌকা! এই বিপুল রণতরীরবহর গুপ্তচরের মুখে শুনেছেন—৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০০০ পদাতিক এবং ২,০০০ চার ঘোড়ায় টানা রথ নিয়ে শত্রুরা তৈরী হয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন—সত্যি সত্যি ধনেজনে সমৃদ্ধ একটা দেশের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সিন্ধুর ওপারে গঙ্গাহ্রদিকে সমৃদ্ধশালী দেশ মনে করার আরও কারণ ছিল, তক্ষশীলার রাজা অম্ভী শুধু যে গ্রীকবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন তা নয়—আলেকজাণ্ডার এবং তার প্রত্যেক সেনাপতিকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন সোনার মুকুট আর ভারী ভারী ওজনের হাজার রৌপ্য মুদ্রা। যে দেশে সোনা-রূপার এত প্রাচুর্য সেই দেশ নিশ্চয়ই ব্যবসাবাণিজ্যে ছিল খুব উন্নত।

গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান (Arryan) এবং কার্টিয়াস

(Curtius) মনে করেন[৬] বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যে এই দেশ খুবই যে সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ এই বিশাল নৌবহর।

প্রমাণ শুধু মেগাস্থিনিস, প্লিনি আর স্ট্র্যাবোর মত বিদেশীদের লেখাতেই নেই—আছে একটি অতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে। সংস্কৃত সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। দুই হাজার বছর আগের মৌর্যশাসিত ভারতবর্ষের ব্যবসাবাণিজ্য আর অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি জীবন্ত ছবি আছে এই গ্রন্থের ভেতরে।

কৌটিল্য[৭] বলেছেন, বাৎসরিক ১৫৲ টাকা সুদ হলো ব্যবসার জন্য প্রদত্ত ঋণের ওপরে (Commercial Loan) এবং আমদানীকৃত পন্যের ওপরে শতকরা ২০ টাকা শুল্ক দিতে হবে। আরও—

আরও আছে। শুধু অর্থশাস্ত্রের শ্লোকগুলোর ভেতরেই মৌর্য-যুগের এই গাঙ্গেয় ভূমির ব্যবসা সমৃদ্ধ চিত্র ফুটে ওঠে—

পাওনানুবৃত্তং শুল্কভাগং বাণিজো দদ্ধো।

অর্থশাস্ত্র বলছে প্রত্যেক সওদাগরকে বন্দরে পৌঁছেই বন্দরে অবস্থানের জন্য কর দিতে হবে।

শঙ্খমুক্তগ্রাহিণো নৌভাটকং দদ্যুঃ।

যে সওদাগর মুক্তা এবং শঙ্খ সংগ্রহ করতে চায় তাদের নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে সরকারী নৌকা ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।

যদি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কোন জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে আসে এদেশের বন্দরে, যদি তার পণ্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ছিল তার প্রতিকার। ঝড়ে অথবা সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত আধুনিক-কালের কোন জাহাজের কাপ্তেনকে যদি অর্থশাস্ত্রের সেই শ্লোক বলা যায়, তাহলে সে শুধু নীতির উদারতায় মুগ্ধ হবে না, বিস্মিত হবে না। মনে হবে তার কানের কাছে কে যেন গান গাইছে—

মূঢ়বাতাহতানাবঃ পিতে বানুগৃহ্ণীয়াত্।

ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটির দিকে পিতার মত সস্নেহ হাত বাড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে বন্দরের কর্তৃপক্ষকে। জাহাজের পণ্যের যদি

ক্ষতি হয়, তাহলে তাকে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। কিম্বা অর্দ্ধেক কর নিতে পারে কর্তৃপক্ষ।

আরও আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে বাঙালাদেশে রেশম চাষের চমকপ্রদ বিবরণ।

মাগধিকা, পৌণ্ড্রিকা সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণা।
পীতিকানাগবৃক্ষিকা গোধূমবর্ণা লৈকুচী, শ্বেতা॥
বাকুলী শেষা নবনীত বর্ণা। তাসাং সৌবর্ণকুড্যকা শ্রেষ্ঠা।
তয়া কৌশেয়ং চীন—পট্টাশ্চ চীনভূমিজা ব্যাখ্যাতাঃ॥

ওপরের সূত্র থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙলাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো কি চারশো বছর আগেও রেশমের চাষ হতো। রেশমের খুব উৎকৃষ্ট কাপড়ের নাম ছিল পত্রোর্ণ। পত্রোর্ণ শব্দের অর্থ—কীট পাতা খেয়ে খেয়ে যে রেশম বের করে। নাগবৃক্ষ (নাগকেশর) লিকুচ (মাদার) বকুল ও অশ্বত্থ গাছে এই রেশমকীট জন্মাতো হাজারে হাজারে। নাগবৃক্ষ থেকে হলদে রঙের এবং লিকুচ থেকে গম রঙের রেশম উৎপন্ন হতো। আর বকুল গাছের রেশমকীট থেকে কেমন রেশম হতো ?

হতো বকুলের মতো শ্বেতশুভ্র, দুগ্ধফেননিভ। অন্যান্য বৃক্ষের রেশম মসৃণতায় ও বর্ণে উৎকৃষ্ট দুগ্ধজাত মাখনকেও হার মানিয়ে দিত।

কোথায় পাওয়া যেত এই বিচিত্র বর্ণের পত্রোর্ণ ? মৌর্যযুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিলে সে কথা আছে। মগধের (দক্ষিণবিহার) পথে প্রান্তরে জন্মাতো এই রেশমকীটের বৃক্ষ। সুপ্রাচীনকালের পৌণ্ড্র্যদেশে (বরেন্দ্রভূমি—উত্তর বঙ্গে) ও সুবর্ণকুড্যেও (টিকাকারদের মতে কামরূপের কাছে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[৮] মতে কর্ণসুবর্ণ অর্থাৎ আধুনিককালের মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল জেলাই হলো সেই দূর অতীতের সুবর্ণকুড্য) অজস্র ও অগণন এই রেশমকীটের বৃক্ষ দেখা যেত।

কৌটিল্যের শ্লোকের শেষাংশে আছে 'কৌশেয়ং চীন পট্টাশ্চা,— অর্থাৎ কৌশেয় বস্ত্র চীনাভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্র। এখানে শাস্ত্রী মশাই সুদূরকালের সেই অতীত ইতিহাসের অন্ধকারে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়ে কল্পনা করেছেন, "কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধহয় তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন।" কারণ কৌটিল্য মন্তব্য করেছেন সুবর্ণকুড্যের পত্রোর্ণ সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

এইসব শ্লোকের ভেতরে বাণিজ্যসমৃদ্ধ ও সুশাসিত ধনেজনে পূর্ণ একটি সুখী জনপদের চিত্রই কি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না?

কিন্তু কোন জনপদ বা কোন সমৃদ্ধিশালী দেশকে দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার? ডক্টর রমেশ মজুমদার* বলেছেন, When Alexander reached the Beas and was eager to cross over to the Ganges valley, the information reached his ear that the King or Kings of Gangaridi and prasioi were awaiting his attack with powerful army.

গঙ্গারিডির শক্তিশালী নৃপতি রণবিদ্যায় নিপুণ বিপুল সৈন্য নিয়ে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু—

কোথায় এই গঙ্গারিডি জনপদ? প্রাচীনদিনের ক্লাসিক লেখকরা বলেছেন, গঙ্গার দুই কূলের সন্নিহিত যে বিস্তীর্ণভূমি অর্থাৎ গাঙ্গেয়ভূমিই হলো গঙ্গারিডি। কার্টিয়াস (Curtius), প্লুটার্ক (Plutarch) এবং সলিনাস (Solinus) ইত্যাদি অতীতদিনের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ বলেছেন—গঙ্গারিডি হলো গঙ্গার পূর্ব-উপকূলের দেশ। কিন্তু এই নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে।

Ptolemy স্পষ্টই বলেছেন—All the country about the mouth of Ganges is occupied by the Gangaridi.

ডিয়োডোরাসের[১০] নিজের লেখায় আছে গঙ্গারিডির জাতির শক্তিমত্তার কথা। আছে তার ভৌগোলিক স্থান নির্দেশ—The region is separated from further India by the greatest river in those parts, for it has a breadth of 30 stadia, but it adjoins the rest of India, which Alexander has conquered.

সেই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদীর দ্বারা বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। মনে হয় এই অঞ্চলটিই ডিয়োডোরাস বর্ণিত 'Eastermost' অঞ্চল অর্থাৎ বঙ্গভূমি।

গঙ্গারিডির সমৃদ্ধির কথা বলেছিল পুরু গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারকে। তাই স্বভাবতই মনে হয়, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের অনেক-অনেক আগে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অস্তিত্বেরও বহুপূর্বে এই বঙ্গভূমিতে ছিল সুনির্দিষ্ট একটি সমাজব্যবস্থা, ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সুদূরপ্রসারী বিস্তৃতি। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ সনে যদি গ্রীকবীর সিন্ধুর জলে অসংখ্য রণতরী দেখে থাকেন, তাহলে নৌশিল্প তথা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র এবং সেইসঙ্গে দেশজুড়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে সমৃদ্ধি ছিল সেকথা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। জাতকের কাহিনীগুলো (খ্রীষ্টপূর্ব)তেও আভাস পাওয়া যায় উন্নততর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির। প্রমাণ আরও আছে—

'Periplus of Erythraean Sea' প্রথম শতাব্দীতে লেখা—এক বিচিত্র 'মেরিণ গাইড বুক' সুদূর অতীতের বাণিজ্যের অনেক অজানা তথ্যের ইঙ্গিত দেয়। সুপ্রাচীনকালের অমূল্য গ্রন্থটি এমন একজন সওদাগরের লেখা যিনি লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর মালাবার এবং করোমণ্ডল উপকূলের বন্দরে বন্দরে দীর্ঘদিন পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল এই পেরিপ্লাস অফ এরিথ্রেইয়ান সি। এই বইতে আছে[১১]—One its (Ganges) bank is a market town which has the same name as

the river Ganges. Through this place are brought mala-bathrum gangetic spikenard, pearls and muslins of the finest ports···গঙ্গাবিডির বিখ্যাত বন্দর 'গঙ্গে' থেকে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে রপ্তানী হয়ে চলে যেত তেজপাতা (malaba-thrum), গাঙ্গেয় জটামাংসী (Gangetic spikenaıd) নামে একধরনের উগ্রসুগন্ধী পণ্য, মুক্তা আর বাংলাদেশের গৌরব তার সেই অপূর্ব সুন্দর আর মসৃণ বস্ত্রসম্ভার মসলিন। গঙ্গে থেকে এই পণ্য-সম্ভার দূরদেশে চলে যেত কোলান্দিয়া নামে একধরনের জাহাজে। গঙ্গে বন্দরের কাছে সোনার খনি ছিল, সেকথাও আছে এই লোহিত সাগরের বিবরণীতে (Periplus of Erythraean sea)। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সেই যুগে এই দুষ্প্রাপ্য ধাতুর বহুল উৎপাদন ও ব্যবহার ছিল।

শুধু পেরিপ্লাসের সময় থেকে নয়, খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে থেকেই এই 'গঙ্গে' বন্দর থেকে সুদূর ব্যাবিলনে যে পণ্যসম্ভার রপ্তানী হতো তার প্রমাণ দিয়েছেন ঈজিপ্ট এবং অ্যাসিরিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেস[১২] (Dr. Sayce)। ব্যাবিলনে এই সময় রাজত্ব করতেন আর বাগাস (Ur. Bagas) নামে প্রবল প্রতাপান্বিত এক সম্রাট। তাঁর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে পাওয়া গিয়েছে ভারতের অরণ্যের শালকাঠের বরগা। ভারতের আদি ইতিহাস বিশেষজ্ঞ মিঃ হিউয়িট (Mr. Hewitt)[১৩] অনুমান করেন, মালাবার এবং করোমণ্ডল উপকূলের নিবিড় শালবন থেকে এসেছে এই শক্ত মজবুত কাঠ। সেই সুদূর অতীতে বিদেশে এই কাঠ রপ্তানী করা ছিল বেশ লাভজনক ব্যবসা। ডক্টর সেস্ পুরানোকালের ব্যাবিলনের বস্ত্রসম্ভারের তালিকার ভেতরে দেখতে পেয়েছেন আমাদের সুপরিচিত একটি নাম—মসলিন।

বাংলাদেশের মসলিনই 'গঙ্গে' বন্দর থেকে রপ্তানী হয়ে চলে

যেত সিংহলে, যেত দক্ষিণ ভারতে এবং সেখান থেকে সুদূর ব্যাবিলনে। তেজপাতা, গাঙ্গেয় জটামাংসী ও মুক্তা বহন করে ভারত মহাসাগরের ঢেউ কেটে কেটে অনেক জাহাজকে যেতে দেখা গিয়েছে করোমণ্ডল থেকে মালাবারে। তাই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কৌটিল্য উল্লিখিত 'রেশম' বা মসলিনের সঙ্গে যখন তেজপাতা ইত্যাদি রপ্তানী হতো দূরদেশে তখন অর্থাৎ মৌর্যযুগে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ যে দেশে মসলিনের মত বস্ত্র উৎপন্ন হতো সে দেশে যে বস্ত্রশিল্পের কি বিপুল উন্নতি হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। নৌশিল্পও সমৃদ্ধ ছিল। নতুবা 'গঙ্গে' বন্দর থেকে উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে নিয়মিত সিংহলে যেত কি করে পণ্যবাহী জাহাজ! তাই কানের কাছে বেজে উঠে মৌর্যযুগের সেই প্রামাণিক গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের সেই নির্দেশ—

পুরুষোপকরণহীনায়ামসংস্কৃতায়াং বা নাবি[১৪]

বিপন্নায়াং নাবধ্যক্ষো নষ্টং বিনষ্টং বাভ্যাবহেত্।

অর্থাৎ যদি কোন মালবাহী জাহাজের পণ্য তদারকীর কিম্বা জাহাজের কোন ত্রুটির জন্য বিনষ্ট হয় তাহলে নাবাধক্ষ্যকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই বহুমূল্য পণ্যসম্ভারের ক্ষতি হওয়ার মূলে পণ্যের মালিকের কোন দোষ নেই। রাষ্ট্রীয় জাহাজের দোষেই পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সরকারী তহবিল থেকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে—এইসব যুক্তিসঙ্গত নিয়মাবলীই মৌর্যযুগে বৈদেশিক বাণিজ্যেব স্বাক্ষর বহন করছে।

কিন্তু এই 'গঙ্গারিডি' অর্থাৎ গঙ্গে বা 'বঙ্গভূমি' কি চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল? মহাস্থানের 'ব্রাহ্মীলিপি' বলে, মৌর্যযুগে পুণ্ড্রনগর খুব বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল। এই নগরের সরকারী স্টোরে 'গণ্ডক' ও 'কাকনিক' মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই মুদ্রা অগ্নি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে দেওয়া হতো। কিন্তু কোথায় এই পুণ্ড নগর? প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যেসব

শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে সেই শিলালিপি বলে—পুণ্ড্রনগরের অস্তিত্ব আজও রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে আধুনিককালের বগুড়া জেলার মাটিতে।

চন্দ্রগুপ্তের অনেক পরে অশোক। অশোকের সময় সমুদ্র বাণিজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। তার প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে কাশ্মিরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্ববদানা কল্পলতা' নামে কাব্যগ্রন্থে। তার তিয়াত্তর অধ্যায়ে আছে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী—পাটলিপুত্রের সিংহাসনে সমাসীন হয়ে আছেন সম্রাট অশোক। এমন সময় এল একদল সওদাগর। তারা জানালো, তাদের পণ্য এবং জাহাজ ধ্বংস করেছে জলদস্যু নাগারা (অনুমান করা যায়, চীনা জলদস্যু। সেই সময় চীনারা ড্রাগনের পূজা করতো।) এই কাব্যগ্রন্থে এবং ইতিহাসেও আছে অশোক তার প্রতিকার করেছিলেন।

বণিকরা 'চম্পা' (ভাগলপুর) থেকে চলে যেত বারাণসীতে। বারাণসী থেকে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে তাম্রলিপ্তে। অশোকের সমসাময়িক সিংহলের নৃপতি ছিলেন 'দেবনামপ্রিয়াটিস্সা।' তিনি বহুমূল্য উপঢৌকন সহ রাজদূত অরিষ্ঠকে পাঠিয়েছিলেন অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রে। অরিষ্টের ভারতে আগমনের পথ ছিল সিংহলের 'জাম্বুকোলা' থেকে তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র। এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু অশোকের যুগে বাংলার বন্দর ও অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি ঘোষণা করছে।

সপ্তম প্রবাহ

গুপ্তযুগে স্বর্ণমুদ্রার বিপুল প্রচলন থেকে বুঝতে পারা যায়, এই সময়ে বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসার হয়েছিল[১]
—ভারতের প্রাচীন ইতিহাস (স্মিথ)

গুপ্ত যুগ।

হিন্দু রাজত্বকালের ইতিহাসে আলোকজ্জল যুগ। অনেক—অনেক দিন আগে বিস্মৃতির অতলান্তে বিলীন হয়ে গেছে এই ধনজনে সমৃদ্ধ বিশাল রাজ্য। কিন্তু—

আজও এদেশের মাটিতে লাঙ্গলের ফালে ফালে উঠে আসে জীর্ণ শিলালিপি। কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে অচল ধর্মচক্র। হাজার হাজাব বছরের ওপার থেকে আলোর দিকে চোখ মেলে তাকায়। ভরা বর্ষায় যখন পুকুরের উঁচু পাড় কেটে কেটে বৃষ্টির ধারা নামে তখন তার সঙ্গে হঠাৎ গড়িয়ে আসে একটুকরো স্বর্ণমুদ্রা "শ্রীশ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য……"অতি অস্পষ্ট সেই লিপি।

কিন্তু ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনি করে সুপ্রাচীনকালের মুদ্রাটির দিকে তাকালে দেখা যাবে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অশ্বারূঢ় এক দৃপ্ত বলশালী পুরুষ—সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।[২] আর একদিকে আছে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি। আবার কখনো হয়তো সেই সুবর্ণমুদ্রার একদিকে আছে হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন নৃপতি আর একদিকে লক্ষ্মীর মূর্তি। মুদ্রার একদিকে আছে, ভারত অধীশ্বর সস্নেহে আহার্য দিচ্ছেন ভবনশিখীকে আর অপরদিকে আছে যথারীতি কমলাসনার পদাঙ্ক লেখা।

বিচিত্র আকৃতি।

বিচিত্রতর তার নক্শা।

সমুদ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের রাজকোষে স্বর্ণের সঞ্চয় ছিল বিপুল। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছিলেন, বিস্তৃত করেছিলেন সাম্রাজ্যের পরিধি দূরদূরান্তরে। কিন্তু—

রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধের নেশা গ্রাস করতে পারেনি গুপ্তনৃপতিদের সহজাত গভীর শিল্পানুরাগ। হয়তো অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, এই যজ্ঞকে চিরস্মরণীয় করার জন্য বিচিত্র ধরনের সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। আবার কোন নতুন রাজ্য জয় করেছেন। এই বিজয়োৎসবকে মহাকালের পটে নীহারিকার মত জ্বালিয়ে রাখার জন্য আর একরকমের মুদ্রা প্রচলন করেছেন।

এই সুবর্ণমুদ্রা কিম্বা গুপ্তযুগের মিশ্রিত সুবর্ণমুদ্রাই সেই দূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়ের মূক সাক্ষী (Numanistic evidence)। শুধু তাই নয়—

সুবর্ণমুদ্রার বিপুল প্রচলন থেকে এই সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, ব্যবসাবাণিজ্য তখন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।

মহাকবি কালিদাস গুপ্তযুগেরই শুধু নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি। এই কবির বহু রচনায় ধনেজনে পরিপূর্ণ নগরীর বিবরণ আছে। শহরের উপকণ্ঠে এবং রাজপথের দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধ বিপণিগুলোতে থরে থরে সাজানো থাকতো বিচিত্র পণ্যসম্ভার।

মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার ইতিবৃত্তের ভেতরে আছে : সমুদ্রগামী বণিকেরা প্রণয়িনী বা স্ত্রীর প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন হয়। গুপ্তযুগের কাব্যে-কাহিনীতে, গাথায় সেকালের বাণিজ্যের ইতিহাস মুখর হয়ে উঠেছে।

গুপ্তযুগে দেশে বৈশ্যজাতিই প্রধানত ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করতো। ফা-হিয়েনের বিবরণে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তিনি পূর্ব-ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। এখানে এই চীনা পরিব্রাজক সবিস্ময়ে দেখেছিলেন, দূর থেকে নীল আকাশের গায়ে আঁকা অগণিত দীর্ঘশীর্ষ মাস্তুল। এক

একটি মাস্তুলে এক এক দেশের পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। প্রতিটি জাহাজই পণ্যবাহী সওদাগরী জাহাজ। দূর বিদেশের পণ্যসম্ভার নিয়ে এসেছে। তারা তাদের সওদা তাম্রলিপ্তের বন্দরে বিক্রি করবে। আর বাংলার রেশম, মসলিন, তেজপাতা, পিপুল নিয়ে আবার স্বদেশে ফিরে যাবে।

ফা-হিয়েনের বিবরণ পড়তে পড়তে গুপ্তযুগের সমৃদ্ধিশালী বন্দর তাম্রলিপ্তের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিদেশী বণিক, তাদের কর্মচারী, দেশী সওদাগর, পাইকার, কুলী-কামিনদের হাঁকে ডাকে মুখর হয়ে উঠেছে তাম্রলিপ্তের বন্দর। শহরের ভেতরে রাজপথের দুই পাশে ধনী শ্রেষ্ঠীদের সুদৃশ্য বিশাল সৌধ। এই পঞ্চম শতাব্দীর বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত।

শুধু ফা-হিয়েনের অবস্থানকাল (৩৯৯—৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ) নয়, গুপ্তযুগে নয়, ভারতের ইতিহাসে যতদিন হিন্দুর গৌরবসূর্য দেদীপ্যমান ছিল ততদিন বাংলার এই বন্দর তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি ছিল অক্ষুণ্ণ। এই বন্দর থেকেই বাঙালী বণিকেরা সমুদ্রযাত্রা করতো। বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হয়ে যেত এই ব্যবসাকেন্দ্র থেকেই সুদূর প্রাচ্য চীনে, ব্রহ্মদেশে, যবদ্বীপে, রোমে—

ফা-হিয়েন এই বন্দর থেকেই স্বদেশে রওনা হয়েছিলেন[৩] "In the early years of the fifth century A. D. Chinese Pilgrim F-a-hien embarked on board a great merchant vessel and sailed to Ceylon enroute to China, the voyage taking fourteen days and nights" এই বন্দর থেকে সওদাগরী জাহাজে চড়ে সিংহল হয়ে চীনে গিয়েছিলেন।

শীতের কুয়াশাময় দিকদিগন্ত ছিল আচ্ছন্ন। শান্ত সমুদ্র অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিয়ে হংসবলাকার মত তার জাহাজ জলে ভেসে ভেসে চলে গিয়েছিল সুদূর সিংহলে।

তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহল। মাত্র চোদ্দ দিনের পথ। মুক্তা

ব্যবসায়ী বণিকেরা, তেজপাতা, পিপুল আর মসলিনের সওদাগররা এই বন্দর থেকেই বিদেশে রওনা হতো। যেত পান, গুবাক বা সুপারী ও নারিকেলের ব্যবসাদাররা।

গুপ্তযুগের বাংলার আর্থিক-অবস্থা ব্যবসাবাণিজ্য যাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণে আমরা জানতে পারি—সেই ফা-হিয়েনের চীন থেকে ভারতে এসে পৌঁছানোর পথের আলোচনাও এসে পড়ে। কারণ স্মরণাতীতকাল থেকেই বণিকদের পায়ে চলা পথ ধরেই আসতো পরিব্রাজকেরা, আসতো ধর্মপ্রচারকেরা। এই পরিব্রাজক চীনের চ্যাঙ্কগান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম চীনের সিকিয়াং প্রদেশে এসে ছিলেন। সিকিয়াং থেকে খোটান। খোটান শুধু যে সেকালের বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেন্দ্র ছিল তা নয়, ছিল অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। এই খোটানে বাংলার মসলিন বিক্রি হতো। এই খোটান থেকেই পাহাড়ের পর পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে মরুভূমি পার হয়ে আসেন ডারডাসে। ডারডাস থেকে সিন্ধুনদ পার হয়ে উ-চাঙ অর্থাৎ উদয়ন। উদয়নের আর এক নাম সোয়াট। চীনা পরিব্রাজকেরা এই অঞ্চলকে বলতো মধ্যরাজ্য বা Middle Kingdom. সোয়াট থেকে কান্দাহার। কান্দাহার থেকে তক্ষশিলা। সেখান থেকে দক্ষিণে পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার। পেশোয়ার থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন ফা-হিয়েন। আফগানিস্তান থেকে সোজা মথুরা হয়ে পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত। ঐতিহাসিক R.N. Saletore[৪] এর মতে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যও চলতো এই পথে, ফা-হিয়েন থেকে দণ্ডী পর্যন্ত দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে।

পূর্ব ভারতে যেমন তাম্রলিপ্ত পশ্চিম ভারতে তেমনি সৌরাষ্ট্র ছিল বিখ্যাত বন্দর। সওদাগররা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের উপকূল দিয়ে সৌরাষ্ট্রে যেত। টলেমি এবং পেরিপ্লাস দুজনেই তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন। স্ট্র্যাবো বলেছেন[৫] ascent of vesseles from the sea by the Ganges to Palibothra.

বাংলার বাণিজ্য এই তাম্রলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করেই বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

ভারতের পূর্ব-উপকূলে শুধু তাম্রলিপ্ত নয়, মসলিপট্টমের উল্লেখও রয়েছে বিদেশী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে, ভ্রমণকারীর ভ্রমণবিবরণে। প্রথম শতাব্দীতে লেখা ভারত মহাসাগরের ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অফ এরিথ্রেইয়ান সী'তে আছে [৬] By the town of Ganges is probably meant Tamralipti, the modern Tamluk (22·18 'N. 87·56'E) which gave its name Tamraparni river in the Pandya kingdom and to the island of Ceylon. This was the seaport of Bengal in the Post vedic and Buddhist periods being frequently mentioned in the great epic. বেদ বৌদ্ধশাস্ত্র এবং মহাকাব্যে এই সমুদ্র বন্দরের নাম বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে।

বিদেশী সওদাগররা দূরপ্রাচ্য থেকে কি করে আসতো? তারা প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে একদিকে বিশাল ভারত মহাসাগর আর একদিকে ভারতের উপকূল সংলগ্ন সাগর পাড়ি দিয়ে মৃদু বাতাসে পাল তুলে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্তে গিয়ে পৌঁছতো। একে বলা হতো coastal voyage.

বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম হিপ্পালাস[৭]। (Hippalus) তিনি একজন সামান্য নাবিক, নেভিগেটার। কিন্তু তিনিই প্রথম অনুকুল বাতাসে ভেসে ভেসে উপকূল দিয়ে পশ্চিম ভারতবর্ষের তীরে এসে পৌঁছেছিলেন।

এই 'অনুকুল বাতাস'টিই হলো মৌসুমী বায়ু। নাবিক হিপ্পালাসের যুগান্তকারী আবিষ্কার এই মৌসুমী বাতাস। (৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)। পেরিপ্লাস বলে, এই বাতাসের অস্তিত্ব জানার পর থেকে রোমের নাবিকেরা সোজাসুজি মালাবার উপকূলের মিউজিরি (Muziri)

বন্দরে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে আসতো। স্থলপথে হিংস্র মরু-দস্যু আর উপকূলের জল-ডাকাতদের ভয় আর বণিকদের রইল না।

এই ঘটনা বাংলার বহির্বাণিজ্যে এক যুগান্তর নিয়ে এল। এতদিন ভারতের পশ্চিমাংশে আরবদের আধিপত্য একেবারে এক-চেটিয়া ছিল। কিন্তু এর পরে বাঙালী বণিকেরা হিপ্পালাস প্রদর্শিত পথে পশ্চিমে যেতে শুরু করল। প্রসারিত হয়ে গেল, স্ফীত হয়ে গেল বাংলার বাণিজ্য।

গুপ্তযুগের মহাকবি কালিদাসের সেই কালজয়ী শ্লোক কানের কাছে গুন গুন করে ওঠে। 'রঘুবংশে' আছে—শুধু সমুদ্র নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদীপথ ছিল একমাত্র সহায়। এই প্রসঙ্গে মহাকবি আভাসও দিয়েছেন যে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ছিল সুদক্ষ নাবিক।

সেই সুদূরকালের বাংলাদেশের বাজারে বাজারে কি কি পণ্যের আমদানী হতো তারও একটি বিশদ তালিকা পাওয়া যায় গুপ্তযুগের অনেক কাব্যে, অনেক গাথায়। বাংলাদেশের বাজারে আসতো হিমালয় থেকে ভেড়া ও খচ্চরের চামড়া, মৃগনাভি। হস্তী আসতো কলিঙ্গ থেকে, অঙ্গ থেকে, আসাম থেকে। আর সুদূর উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে আসতো তেজস্বী ও বলশালী অশ্ব আর সোনা, তামা, লোহা আর অভ্র আসতো দক্ষিণ বিহার থেকে এবং মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি থেকে আমদানী হতো দলা দলা সোনা।

এই বাজারে আমদানী পণ্যের তালিকা থেকেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বাংলার বাণিজ্য গুপ্তযুগে কি বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

রাজ্যে যদি সুশাসন না থাকে, যদি দেশের দিকে দিকে দুঃখ-দুর্দিনের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে তাহলে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হতে পারে না। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি বিবরণের ভেতরে ফুটে উঠেছে বণিকদের প্রতি সরকারী দাক্ষিণ্যের চিত্র।

দূর পথ অতিক্রম করতে হবে বণিকদের। কষ্ট হবে। অতএব পথের পাশে দু'তিন মাইল পর পর চটি কিম্বা ছত্র প্রতিষ্ঠা কর। হুকুম দিয়েছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তাই প্রতি চটিতে চটিতে কিছু ওষুধ রাখতে হবে। পথে দুর্বৃত্তেরা তার অর্থসম্পদ কেড়ে নিয়ে একেবারে নিঃস্ব করে দিতে পারে, তাই ব্যবস্থা থাকবে অর্থদানের।

শিলালিপি আজও ঘোষণা করছে, চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই ছত্রকে পরিচালিত করতো সরকার।

গুপ্তযুগে[৮] অর্ণবযানেরও বিপুল উন্নতি হয়েছিল। নীচে কয়েকটি জলযানের নাম দেওয়া হলো।

	নাম	দৈর্ঘ্য*	প্রস্থ	উচ্চতা
১	দীর্ঘিকা	৩২	৪	৩$\frac{১}{৫}$
২	লোলা	৬৪	১০	৬$\frac{২}{৫}$
৩	প্লাবিনী	১৪৪	১৮	১৪$\frac{২}{৫}$
৪	ধারিণী	১৬০	২০	১৬
৫	বেগিনী	১৭৬	২২	১৭$\frac{৩}{৫}$
৬	উর্ধ্বা	৩২	১৬	১৬
৭	মন্থরা	৯৬	৪৮	৮

কিন্তু অর্ণবযানের যত উন্নতিই হোক না কেন আধুনিককালের মত বাষ্পচালিত স্টীম লাইনার তো ছিল না! প্রকৃতির খেয়ালের ওপরে নির্ভর করতে হতো।

ফা-হিয়েনের[৯] বিবরণে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রার উজ্জ্বল চিত্র আছে: দিগন্ত প্রসারিত অসীম সমুদ্র। কোন দিকটা উত্তর কোনটা দক্ষিণ খুব সহজে দিকনির্ণয় করা যেত না। শুধু সূর্য, চন্দ্র আর আকাশের তারা ছিল প্রাচীনযুগের নাবিকদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু তবুও গুপ্তযুগেই বাংলাদেশে বাণিজ্যের বিপুল বিস্ময়কর প্রসার ঘটেছিল।

* কিউবিট বা অঙ্কের হাত

অষ্টম প্রবাহ

'পালযুগে বিপুল ঐশ্বর্যের আভাস পাওয়া যায় সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষ্যে—'অতুল ধনের অধিকারী সেই রামপাল সকল প্রজা-জনকে রক্ষা, সংসারের আপদরূপ বিপ্লব করপল্লবের·· লীলাদ্বারা খণ্ডিত···করিলেন'—রামচরিত[১]

প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর তাঁহার হস্তে ধারণ করাইল, দিঙমণ্ডল-প্রসারিত তাঁহার যশ পূর্ণিমা-রাত্রির জ্যোৎস্না-তুল্য অম্লান শুভ্রতায় পরিব্যপ্ত হইয়া গেল।[২]

খালিমপুরের তাম্রশাসনে[৩] পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল-দেবের মহিমা উৎকীর্ণ করা আছে।

অষ্টম শতাব্দীর বাংলা। দিকে দিকে প্রাকৃতিক-দুর্যোগের অন্ধকার ঘন হয়ে জমেছে। অরাজকতা দেশে চরমে উঠেছে মাৎস্যন্যায়। মাংসলোভী গৃধিনীর মত বিদেশী শক্তিগুলি বাংলাদেশের ওপর হানা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অবিচার, অত্যাচার আর নিপীড়নে হাহাকার করছে মানুষ। কিন্তু···

সেই দুঃসময়ে জেগে উঠল দেশের গণশক্তি। অরাজকতা দূর করার জন্য বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে জনগণ বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থাৎ জনতা কিম্বা প্রজাগণ তাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম গণনির্বাচন। কিন্তু দীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী যে দেশে কোন সুনির্দিষ্ট নৃপতি ছিল না, ছিল না কোন সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কী এমন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা থাকতে পারে? তবে—

'গৌড় ভুজঙ্গ' শশাঙ্কগুপ্তের মৃত্যুর পরই বাংলার গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই স্বর্ণযুগ—গুপ্তযুগ। সেসময়ে শুধু ব্যবসা-

বাণিজ্য নয়—বিদ্যায়, সংস্কৃতিতে হিন্দুশক্তি সহস্র শিখায় গৌড়ের আকাশকে আলো করে দিয়ে জ্বলছিল অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নির মত। তারপরেই বাংলার বুক জুড়ে নেমে এসেছিল অন্ধকার। এই তমসাচ্ছন্ন দীর্ঘ একশো বছরের ইতিহাসে বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ নেই। থাকতেও পারে না। কারণ—

সবল তখন দুর্বলকে নিধন করছে মহোল্লাসে। যে কেউ সামান্য শক্তি নিয়ে রাজা হয়ে বসে নির্বিচারে দুর্বল জনগণের ওপরে নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের হাহাকারে আকাশ-বাতাস আড়ষ্ঠ ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যের কোন ইতিহাস থাকতে পারে না। হয়তো এদেশের পথে-প্রান্তরে রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে কত বণিকের পণ্যসম্ভার লুঠে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। কত পণ্যবাহী অর্ণবযানকে সমুদ্রের কালো জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। রাজা নেই। কে তাদের রক্ষা করবে? এদের কথা কোন ইতিহাসে লেখা নেই।

অনেক অনেকদিন পরে রাজা ধর্মপালের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি না হলেও বাংলার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বনিয়াদ বেশ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। খালিমপুরের তাম্রশাসনে ধর্মপালের সময়ে চারটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই চারটি গ্রামের সঙ্গে ছিল “হাট্টিকা”।

ঐতিহাসিক কীলহর্ন[৪] (kielhorn) বলেন ‘হাট্টিকা’ অর্থে হাট। ইর্দা তাম্রশাসন[৫] ব’লে আরও একটা পল্লীগ্রাম দান করা হয়েছিল যার সঙ্গে একটি বৃহৎ বাজার সংযুক্ত ছিল। এই হাটে-বাজারে যে প্রজানুরঞ্জন রাজা ধর্মপাল সুন্দর সুন্দর ও মজবুত চালা তৈরী করে দিয়েছিলেন তার নিদর্শন আছে ভাটেরার[৬] শিলালিপিতে। হাজার হাজার বছরের বিস্মৃতির ওপার থেকে এই তাম্রশাসন আর শিলালিপি ঘোষণা করছে, ধর্মপালের সময়ে বাংলার বাণিজ্য আবার নতুন পথ খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিল

হাটে হাটে বাজারে বাজারে। সওদাগরদের জন্য নতুন চালা নির্মাণ হলো। দেশের দূরে দূরে আবার বড় বড় রাজপথ তৈরী হলো। এই দীর্ঘ রাজপথের পাশে পাশে নির্মিত হলো এক একটি চটি। আবার—

দিনের আলোয়, রাত্রির অন্ধকারে জলে-স্থলে পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকদের যাতায়াত একেবারে শঙ্কামুক্ত হলো। হলো নিরাপদ।

পাহাড়পুর।

হিলি (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার অধীনে) থেকে রেলে মাত্র দু'টি স্টেশন গেলেই জয়পুরহাট। এই জয়পুরহাট থেকে কয়েক মাইল দূরে বিশাল ধ্বংসাবশেষ পাল রাজত্বের বহু অবলুপ্ত কীর্তি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়পুর।

যে দিকেই তাকাও বিশাল প্রান্তর জুড়ে অসুর মুণ্ডের মত উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি। লাঙ্গলের ফালে ফালে ওঠে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। কাঠবাদাম আর পুরানো নিম গাছের ছায়ার নীচে স্বর্ণলতায় ছেয়ে থাকা লাটাবন আর মনসাকাঁটার আবেষ্টনে ভাঙ্গা মন্দির তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়া পরিখা প্রাচীরের ফাটলে ফাটলে অশ্বত্থের শিকড় নেমেছে নাগপাশের মত। কোথাও বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থিশেষ। নকশা কাটা ইট, খোদাই করা গ্র্যানাইট আর কষ্টিপাথরের টুকরো, তারপরেই কিছু দূরে একটা উঁচু মিনারের স্তূপ। লোকে বলে 'পালবুরুজ"। হয়তো অবজার-ভেটরী ছিল পাল-রাজাদের আমলে। এইখানেই—

বুনো ওল আর ঘেঁটুফলের একরাশ জঙ্গলের ভেতরে মাটির নীচে তিনটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, বিগ্রহপালের[৭] সময়ে এই তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রার একদিকে বৃষ আর একদিকে তিনটি মৎস্য অঙ্কিত করা আছে।

শুধু পাহাড়পুরে নয়, বাংলা ও বিহারের দু'একটি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে পালযুগের রজত ও তাম্রমুদ্রা। 'শ্রীবীগ্র' উপকথা

অনুসারে অনুমান করা হয় রাজচক্রবর্তী বিগ্রহপালই এই মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। মুদ্রার নাম ছিল "বিগ্রহপাল দ্রম্ম"।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে এই মুদ্রার কথা বলছি। তার কারণ ইতিহাস গবেষক কে. এন. দীক্ষিত বলেছেন, এইসব মুদ্রা বেশীর ভাগই পরিমিত ধাতবমূল্য থেকে হ্রস্বমূল্যের (Debased Coins)। এই ঘটনা থেকে একটা সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে,—ধাতবমূল্যের অভাব অর্থাৎ রাজকোষে অর্থাভাব ছিল। তাই অনুমান করা শক্ত নয় যে সারা দেশে বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল।

গুপ্তযুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ গড়ে উঠেছিল। তাল তাল সোনা জমেছিল রাজভাণ্ডারে। কিন্তু রাজা শশাঙ্কের পরেই দেশজুড়ে অরাজকতা আর দুর্নীতি শুরু হয়েছিল। আর—

বাঙালীর বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র, বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্তের সেই শত শত শতাব্দীর গৌরবসূর্য চিরকালের মত অন্ধকারের অতলান্তে হারিয়ে গেল।

মহাকবি কালিদাসের সেই নৌসাধনোদ্ধতান বাঙালী হৃতগৌরব হয়ে শুধু অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে রইল। বহির্বাণিজ্যের তুলনায় অন্তর্বাণিজ্যে লাভের অঙ্ক বরাবরই কম। তাই বাঙালী এই সময় তার বাণিজ্যের যুগযুগান্তরের বিপুল বৈভব হারিয়ে ফেলেছিল, আর বিশাল সমুদ্রে বাঙালীর সওদাগরের নৌবহর দেখা গেল না। জাভায়, বালিতে, যবদ্বীপে আর সিংহলে আর কোন সওদাগর তার পণ্য নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করল না।

এই সময় বাঙালী সমুদ্রের ওপারে বিশাল পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে একান্তভাবে দেশের মাটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। হয়ে উঠল কৃষিজীবি!

ধর্মপালের পর দেবপাল, দেবপালের পর বিগ্রহপাল। এই পাল নৃপতিদের প্রত্যেকের যুগে এমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা পাওয়া যায় না। তবে—

রামচরিতের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষ্যে রামপালের রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্যের আভাস আছে। রামাবতী নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজাধীরাজ রামপাল। সন্ধ্যাকর নন্দী বলেছেন,[৮] এই সমৃদ্ধিশালী জনপদে রাজপথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদশ্রেণী ছিল। কণক-পরিপুর্ণ ধবলপ্রাসাদ শ্রেণী মেরুশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হতো। প্রতিটি প্রাসাদের শিখরে শিখরে স্বর্ণকলস ঝকমক করতো।

'রাজতরঙ্গিনী'তেও আছে এই 'রামাবতী নগরের অধিবাসীদের ঐশ্বর্যের পরিচয়। হীরা-মণি-মুক্তা স্বুবর্ণ নির্মিত তৈজসপত্র শহরবাসী-দের ঘরে ঘরে থরে থরে সাজানো থাকতো। কিন্তু এরা যে ব্যবসায়ী ছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে—

পাল রাজত্বের দীর্ঘ বিবরণে মাঝে মাঝে "দরিদ্রশালা" ও "লঙ্গর-খানার" উল্লেখ আছে। এই থেকে মনে হয়, শহরবাসী ছাড়া বাংলার গ্রাম্যজীবনে কোন বৈভব ছিল না—ছিল না কোন ঐশ্বর্য। কিন্তু—

সমাজের উঁচুতলার অর্থাৎ রাজা-সেনাপতি মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চিত ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি প্রাচীন পুঁথিতে। তিব্বতের এক দুর্গম গুহায় বহুকাল লোকচক্ষুর অগোচরে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে ছিল সেই বিচিত্র বিবরণ।

তিব্বতের রাজা[৯] মু-তি-গ-বৎসন-পো। তার সঙ্গে পালবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ধর্মপালের খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। প্রতি বৎসর নিয়ম করে বাংলার শস্য, বাংলার মণিমুক্তা ইত্যাদি উপঢৌকন তিব্বতে পাঠাতেন ধর্মপাল।

এই তথ্য থেকে একটি সত্যই প্রতিভাত হয় যে, কোন সুদূর পরবর্তীযুগে যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই যেন পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল পালযুগে। দেশের শাসকশ্রেণী এবং তাদের সান্নিধ্যের মানুষগুলো (রাজকীয় মর্যাদার দীপ্তি এবং আভিজাত্য যাদের আছে), একমাত্র তাদের কাছেই থাকতো ঐশ্বর্য

সম্পদ। অর্থের সঙ্গত অথবা সম অর্থনৈতিক বণ্টনের সেই নীতি হারিয়ে ঘোরতর বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল।

ধর্মপালের শস্য এবং মণিমুক্তা উপঢৌকনের প্রসঙ্গে গবেষক ঐতিহাসিক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়[১০] বলেছেন, "ইহার (এই উপঢৌকনের অর্থ) কিছু অবশ্য অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ হতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর দেশের সামাজিক ধন ক্রমশঃ যে উত্তরোত্তর কৃষিলব্ধ ধনে বিবর্তিত হইতেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ, পরবর্তী পালযুগে বাংলার সমাজ প্রধানতঃ কৃষি এবং গৃহশিল্প নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশই কৃষিনির্ভর কারণ, রাষ্ট্রে কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের স্থান যদিও বা উল্লিখিত হইতেছে কিন্তু শিল্পী এবং বণিকসমাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইতেছে না।"

—"অবশ্য পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইহা দণ্ডপানি বৈদ্যদেব প্রভৃতির যুগ"—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের[১১] বৃহৎ বঙ্গের ভূমিকার কথাও মনে পড়ে। কেমন করে পালযুগে বণিক সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হবে—কেমন করে সওদাগরেরা সমুদ্র পার হয়ে দূরদেশ থেকে ধনসম্পদ আহরণ করবে? কারণ—

পালযুগ বৈশ্য-প্রাধান্য হলেও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের যুগ। বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজার যুগ। সওদাগরের ছেলেরা তাদের মানদণ্ড আর বাণিজ্যতরীর কথা ভুলে টোলে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সংস্কৃত পড়তো। পড়তো কাব্য, নাটক আর অলঙ্কার। ধ্যানগম্ভীর পবিত্র বেদমন্ত্রে মুখরিত সেই পরিবেশে আমদানী-রপ্তানী, কেনা-কাটার মত স্থূল বিষয় কল্পনা করাও ছিল পাপ।

বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যার ওপরে একান্ত নির্ভরশীল সেই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ দূর বিদেশে গিয়ে এমন আচার-ব্যবহার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিয়ে আসতো যা এদেশের শান্তশিষ্ট

ধর্মভীরু হিন্দুসমাজ একেবারেই সহ্য করতে পারতো না।

আরও কারণ ছিল। এদেশ থেকে একবার লোক বিদেশে গেলে অনেকে আর দেশে ফিরে আসতে চাইতো না। দেশের লোকসংখ্যা কমে যেত। সে যাই হোক—নৌবিদ্যায়, সমুদ্রযাত্রায় বাঙালীর যুগসঞ্চিত গৌরবময় ইতিহাসের ওপরে নেমে এসেছিল বিস্মৃতির যবনিকা। যে দেশের সমুদ্রগামী বাণিজ্য জাহাজে বিশাল বাজার বসতো, যে দেশের বণিক বধূ বলতো "আমাদের পারিবারিক রীতি এই যে বিবাহাদি আমাদের সমুদ্রের জাহাজের ওপরেই নির্বাহিত হয়[১২]" সেই দেশেরই রাজা সমুদ্রযাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করে দিয়েছিল। তাই—

ব্যবসার ইতিহাস—এই যুগের ব্যবসার ইতিহাসের ওপরে ছেদ টেনে দিয়েছিল। অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বিশ্বকোষও বলে[১৩] গৌড় ও মগধের একটি পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজবংশ। সাড়ে তিনশত বর্ষের অধিককাল এই বংশ গৌড় ও মগধের রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিল।...কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই প্রসিদ্ধ বংশের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস এ পর্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই।

শুধু বংশের ইতিহাস কেন? এ যুগের ব্যবসারও কোন ইতিহাস নেই। তার কারণ, এই সময়ের কাব্য রামচরিত, পবনদূত, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত পড়লে আমার মনে হয় দেশের মানুষের মন যত বেশী সমৃদ্ধ হয়, উন্নত হয়, স্থূল বিষয়ে অর্থাৎ টাকাকড়ির উপার্জন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সে ততই পিছিয়ে আসে, আসতে হয়। যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, মন্দির নির্মাণ, স্থাপত্যের উন্নতি, বিদ্যার অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত দেশের সর্বস্তরের মানুষ। ব্যবসা করবে কে?

সেন রাজবংশ।

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ। সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ

সামন্ত সেন কর্নাট দেশ থেকে এসেছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র বল্লাল ও পৌত্র লক্ষ্মণ সেন।

সেনরাজাদের সময়ে বাঙালীর বাণিজ্য প্রসারের কোন প্রচেষ্টার উল্লেখ নেই ইতিহাসে। কোন সমৃদ্ধ জনপদে, বন্দরে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন ইঙ্গিত নেই। কেননা, সেনরাজারা জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছিলেন। তাঁরা বণিকদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় কোনরকম পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। শুধু নিজেদের বিলাসব্যসন, যুদ্ধ, সাম্রাজ্য বিস্তার, জাতিভেদ প্রথা (কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন) ইত্যাদি নিয়ে তারা খুব ব্যস্ত থাকতেন। দেওপাড়ার তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করা হচ্ছে[১৩ (ক)] বিজয় সেনের রাজত্বের সময়ের বিলাসীতার আশ্চর্য কাহিনী। বেদ-পুরাণ নিয়ে ব্যস্ত ব্রাহ্মণদের ঘরে এত বেশী সোনার অলঙ্কার সঞ্চিত হয়েছিল যে নগর থেকে শ্রেষ্ঠীর বাড়ী মেয়েদের ডেকে এনে চিনে নিত কোনটা মুক্তো কোনটা সোনা আর কোনটা রূপো।

সেনরাজাদের সময়ে বণিকদের সমর্থনের ইতিহাস তো নেই, বরং আছে ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধের ইতিহাস। সুবর্ণবণিকদের সমাজে পতিত করেছিলেন বল্লাল সেন। এই ঘটনা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রসারতার পরিপন্থী হয়ে উঠে ছিল। অনেক অনেকদিন পরে বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নৃপতি লক্ষ্মণ সেন বুঝতে পেরেছিলেন বণিকদের সঙ্গে বিরোধ করলে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুদ্রার অভাব হবে রাজভাণ্ডারে।

—তাই সুবর্ণবণিকদের আবার ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অতীত বংশধর অপরিণামদর্শী বল্লালের মত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে ঋণগ্রস্ত হতে চান নি। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রসারিত করে দেশের জনসাধারণের ভেতরে সুস্থ ও

স্বাভাবিক জীবনধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু—

বাণিজ্যিক প্রসারতার ওপরে বল্লাল সেন যে কুঠারাঘাত করেছিলেন সেই অবনতিকে লক্ষ্মণ সেন আর প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

বণিক সম্প্রদায়ের ওপরে কেন বল্লাল সেন বিরূপ হয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।[১৪]

মগধের সম্পদশালী ব্যবসায়ী বল্লভানন্দ। বল্লাল সেন তার কাছে এক কোটি টাকা ঋণ চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, কীকট (kikat) দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করতে হবে। বিপুল সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

বল্লভানন্দ ঋণ দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু একটা শর্ত ছিল। হরিকেলি গ্রামের সমস্ত রাজস্ব তাঁকে দিতে হবে। বল্লাল সেন এই প্রস্তাবকে অসম্মানজনক মনে করলেন। সমস্ত বণিক সম্প্রদায়ের ওপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। জোর করে বহু ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন।

বণিক সম্প্রদায়ের নেতা বল্লভানন্দ আরো একটা কারণে বল্লাল-সেনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বল্লাল সেন রাজপ্রাসাদের এক ভোজ সভায় ব্যবসায়ীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বল্লভানন্দ এসে দেখলেন শূদ্রদের সঙ্গে তাদের জায়গা করা হয়েছে। বৈশ্যসম্প্রদায়ের (ব্যবসায়ী) জন্য আলাদা কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। তাই—

বল্লভানন্দ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। মগধের রাজা তাঁর জামাতা। ঘরে বিপুল সম্পত্তি। তাই তাঁর মনে গর্বও ছিল, ছিল বল্লালের ওপরে তীব্র আক্রোশ।

বল্লাল সেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। দেশময় ঘোষণা করে দিলেন সুবর্ণবণিক আজ থেকে পতিত বলে গণ্য হবে···

উপরোক্ত কাহিনী এবং 'বল্লাল চরিতে'র বিষয়বস্তু অনুযায়ী মনে হয়, সুবর্ণবণিকরা সমাজে বেশ উচ্চস্থানই অধিকার করেছিল। শুধু বল্লাল সেনের নিষ্ঠুর অত্যাচারই এই বণিক-সম্প্রদায়কে আর তার ব্যবসাকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু—

নৈহাটী তাম্রশাসন[১৫] বলে, রাজ অন্তঃপুরের রমণীরা বহুমূল্য স্বর্ণলঙ্কারে ভূষিত থাকতেন। আর দাসীরাও পরতো বহুমূল্য পাথরের ফুল, নেকলেস, কানের দুল—দেওপাড়া তাম্রলিপির কবি সে কথাও বলে। রামচরিতে আছে, তন্বী সুঠামতনু তরুণীরা অনিন্দ্যসুন্দর পদযুগলে হীরকখচিত অলঙ্কার পরতেন। 'তবকত-ই নাসিরী'তে উল্লেখ আছে লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং সোনা-রূপোর বাসনে আহার করতেন।

এই তথ্যই প্রমাণিত করে যে, পালরাজাদের মত সেন-নৃপতিরা সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ শ্রেণীর হাতেই অর্থ সঞ্চিত থাকতো। বলাবাহুল্য এই অর্থ স্বোপার্জ্জিত নয়, বাণিজ্যলব্ধ সম্পদও নয়। শুধু নৃপতি বলেই হয়তো জমির কর পেয়েছিল···কিম্বা অন্য কোন উপায়ে সংগ্রহ করেছিল এই অর্থ। কেননা সেন-রাজাদের ইতিহাসে বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ নেই। বরং আছে—

আছে বিলাসব্যসন, বিদ্যাচর্চা আর জাতিবৈষম্যসৃষ্টির অনেক প্রসঙ্গ। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, রাজপণ্ডিত প্রভৃতির প্রভাব সেনরাষ্ট্রে প্রচুর ছিল। এরা ছিলেন সকলেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোথাও কোন ব্যবসায়ীকে মর্যাদাসম্পন্ন আসনে বাসানো হয় নি।

মনে হয় বণিকদের ওপরে অপ্রসন্ন ছিলেন বল্লালপরবর্তী সেনরাজারাও। আর বিরূপ ছিলেন বলেই রাজকোষে ছিল অর্থের অভাব। তাই নৃপতি হয়েও বল্লালকে ঋণের জন্য প্রার্থী হতে হতো ধনকুবের শেঠ বল্লভানন্দের কাছে। আর সেইজন্যেই এত তীব্রভাবে

বংশ সচেতন রাজা হয়েও তারা গুপ্তনৃপতিদের মত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করতে পারেন নি।

ব্যবসায়ে এই অবনতির অনেক কারণ ছিল। বল্লাল সেনের সমুদ্রযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচারের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে সরে এল। ডক্টর দীনেশ সেন বলেছেন,[১৬] 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র হইয়া গেল।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের সময় মাত্র একবার বণিকদের সমুদ্রযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে আছে—

প্রভাকর নামে এক বণিক তার বিপুল পণ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবে গিয়েছিল।

এই বইতে আছে চট্টগ্রামের বন্দর খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তারপরে আর সেন-রাজত্বের অন্য কোথাও বণিক সম্প্রদায়ের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। শুধু—

শুধু সেন রাজারাই এই ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার নীরবতার জন্য দায়ী নয়। বাংলার সমস্ত বাণিজ্য আরবীয় মুসলমানদের হাতে চলে গিয়েছিল। রোম, মিশর আরো দূরপ্রাচ্যে তারাই বাংলার পণ্য সরাসরি রপ্তানী করতো। বাংলাদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের গৌরব সে সময় তমসাচ্ছন্ন। তাই বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাস একেবারে মূক।

নবম প্রবাহ

'তাম্রলিপ্ত পূর্বদেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল'—বিশ্বকোষ

তাম্রলিপ্ত!

বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে সুপ্রাচীনকালের জনপদের বিপুল গৌরব। পেরিপ্লাসের মতে এই সেই বন্দর যেখান থেকে বাঙালী সওদাগররা পান, সুপারী বা গুবাক, নারিকেল, রেশম, মসলিন, তেজপাতা, পিপুল আরো নানা রকমেব পণ্য নিয়ে চলে যেত সিংহলে, যেত দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান উপকূল ধরে সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশ), চলে যেত কোণাকুণি বঙ্গোপ-সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর মালয় উপদ্বীপে। চার কি পাঁচশতকের মালয়ের একটি তাম্রশাসনে আছে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা। বুদ্ধগুপ্ত বণিক ছিলেন[২] এবং তিনি ছিলেন রক্তমৃত্তিকানিবাসী। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন—রক্তমৃত্তিকা অর্থাৎ রাঙামাটির দেশ, সম্ভবত বাংলাদেশ। অনুমান করা যায় বণিক বুদ্ধগুপ্ত এই তাম্রলিপ্ত থেকেই ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বন্দর থেকে একটা বিশাল সওদাগরী জাহাজ ধরেই প্রায় দু'শো আরোহীর সঙ্গে ফা-হিয়েন যে সিংহল হয়ে স্বদেশের দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন সেকথা আগে বলা হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষু অথবা পরি-ব্রাজকদের বিবরণেই তাম্রলিপ্তের বন্দরের ইতিবৃত্ত বেশী পাওয়া যায়। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ইণ্ডিয়ান শিপিং বইতে[৩] স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'Great Buddist harbour of the Bengal seaboard'-বাংলার উপকূলে বৌদ্ধদের বিশাল বন্দর। ফা-হিয়েনের ঠিক দু'শো বছর পর অর্থাৎ সাতের দশকে এসেছিলেন আর বৌদ্ধ-পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ (Yuan Chwang)[৪] বা হুয়েন্ সাঙ

তিনিও তাম্রলিপ্ত প্রসঙ্গে বলেছেন, বঙ্গোপসাগরের মুখে খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্দর—এখানে সাগরের জল আর মাটি মুখোমুখি মিশেছে। য়ুয়ান চোয়াঙও তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের আর্থিক সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন।

য়ুয়ান-চোয়াঙ যে বছর (৬৩০ খ্রীস্টাব্দে) ভারতে এসেছিলেন ঠিক তার দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর পরে (৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে) তাম্রলিপ্তের মাটিতে আর একজন স্বনামধন্য বৌদ্ধভিক্ষু ই-ৎ-সিঙের[৫] (I. Tsing) পায়ের ধুলো পড়ল। তাঁর বিবরণ থেকেও জানা যায় বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের খ্যাতির কথা। তিনি বলেছেন, এই বন্দর থেকেই আমরা চীনে ফিরে যেতাম! এখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি যখন স্থলপথে বুদ্ধগয়ায় রওনা হয়েছিলেন তখন তার সহযাত্রী হয়ে ছিল শত শত বণিক। অনুমান করা যায় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা শুধু যে ব্যবসা করতেন তা নয়—তারা ধর্মচর্চাও করতেন। ই-ৎ-সিঙ বলেন[৬] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরও অসংখ্য চীনা ভিক্ষু তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। ' স্বনামধন্য পরিব্রাজক বাংলার এই প্রাচীন বন্দর সম্বন্ধে লিখেছেন, ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে চল্লিশ যোজন দূরে তাম্রলিপ্ত বন্দর। এখানে পাঁচ-ছয়টি বৌদ্ধবিহার আছে। অধিবাসীরা ধনী।

চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভেতরে তাম্রলিপ্তের ইতিহাস নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায়। রামায়ণে, মহাভারতে, বেদে, পুরাণে, সংস্কৃত সাহিত্যে 'পাণ্ডববিজয়', 'দিগ্বিজয় প্রকাশ',- বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশ', 'রত্নবিজয়' প্রভৃতিতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলো দূর অতীতের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তার কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই। তবে অনুমান করা যায়, পৌরাণিককাল থেকেই এই জনপদের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভূগোলবিদ টলেমির লেখায়[৭] (দ্বিতীয় শতাব্দী মাঝামাঝি)—The Greek geographer refers to the city as Tamalities and places it on

ganges in a way which suggests connection with the country of Mandalai…গঙ্গার ওপরে শহর বলে স্বীকার করেছেন টলেমি। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস গঙ্গার পরপারে তালোক্তি (Taluctae) নামে এক জাতির উল্লেখ করেছেন। তার অনুবাদক মাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে তালোক্তি অর্থাৎ তাম্রলিপ্তবাসী। পেরিপ্লাসে আছে, তাম্রলিপ্তের বিপুল খ্যাতি নীল, তুঁত, পশম, শুধু যে রপ্তানীই হতো তা নয়—সিংহল থেকে মুক্তা, প্রবাল, রূপো (রূপোরখনি ছিল সিংহলে) আমদানীও হতো। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার বলেন[৮] বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল হিন্দুযুগের শেষ পর্যন্ত। তাম্রলিপ্তের খবর বলে, হাজারীবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ে উৎকীর্ণ করা উদয়মালার একটা লিপি—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের এই লিপিতে আছে[৯]

অথ কস্মিং শ্চি[ৎ] [স]ময়ে বাণিজ্যভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তাম্রলিপ্তি [ম] যোধ্যায়া যযুঃ পূর্বস্বনিজয়া॥

আটের শতকের মাঝামাঝি সুদূর অযোধ্যা থেকে তিন ভাই তাম্রলিপ্তে এসেছিল ব্যবসা করতে। কিছুকালের ভেতরে প্রচুর ধন উপার্জন করে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে অযোধ্যা—এই দূরগামী পথ ধরেই চীন থেকে আমদানী হতো সিল্ক, আসতো রেশমের গুটি, আরবী ঘোড়া—তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে আবার এইসব পণ্যই রপ্তানী করা হতো সিংহলে, দূরপ্রাচ্যে। পশ্চিমগামী এই পথেই বাংলা থেকে উত্তর ভারতবর্ষে রাজরাজড়ারা সামরিক অভিযানে যেত।

১

আধুনিককালের তমলুক শহর পুরানোকালের তাম্রলিপ্ত—পেরিপ্লাস অফ এরিথেইয়ান সী'র অজ্ঞাতনামা লেখক সেকথা বলেছে। তমলুক বহু নামে খ্যাত ইতিহাসের পাতায়। 'তাম্বলিপ্তি' 'দামলিপ্তি' তামালিপি' ইত্যাদি। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বলে,—it

first emerges in authentic history as a port···ইতিহাসের পাতায় তাম্রলিপ্তের প্রথম অস্তিত্ব পাওয়া যায় বন্দর হিসেবেই। কেন এত বড় বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল জানতে হলে তাম্রলিপ্তের ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা দরকার। তাম্রলিপ্তের অবস্থান ছিল গঙ্গা নদীর মোহনার ঠিক মুখে একটু পশ্চিমে আর সমুদ্রের উত্তরদিকে। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ মজুমদার বলেন,[১০]— The city which controlled the mouth of Ganges, was commercially most important in Eastern India, যে শহর গঙ্গার একেবারে মোহনায় অবস্থিত সেই শহরই পূর্বভারতের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তাই যতদিন গঙ্গা তাম্রলিপ্তের পাশ দিয়ে বয়ে যেত ততদিন এই বন্দরের গৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু যেই গঙ্গার গতিপথ পাল্টে গেল অমনি গড়ে উঠল ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বন্দর—সপ্তগ্রাম। নদী আবার সরে এল। সপ্তগ্রাম হারিয়ে গেল। গড়ে উঠল হুগলী। হুগলীর পর কলকাতা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ধনেজনে সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্তের পরিধি ছিল একশো পঁচিশ ক্রোশ। গঙ্গা এবং সমুদ্র কাছে পেয়ে তাম্রলিপ্ত দিনে দিনে বিপুল সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছিল। সেকালের বিখ্যাত এই নগরের বৃক্ষশোভিত রাজপথের দু'পাশে অসংখ্য বিপণিশ্রেণী বিপুল সম্ভারে ঝলমল করতো—বিদেশীর বিবরণেও একথা আছে।

বাঙালী বণিকেরা স্বগৃহে বাস করতেন শুধু গ্রীষ্ম-সমাগম থেকে শুরু করে বর্ষা পর্যন্ত। যেই বর্ষার কালো মেঘ আকাশ থেকে মিলিয়ে যেত আর শরতের সোনা রোদে ঝলমল করে উঠতো দিগ্বিদিক্ তখনই শুরু হতো বাঙালী সওদাগরদের দূরদেশে সমুদ্র অভিযানের আয়োজন।

কোন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে গঙ্গা তাম্রলিপ্তকে ধৌত করে সমুদ্রে পড়তো—সেই গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। দূরপ্রাচ্যগামী বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের গৌরব নষ্ট হয়ে গেল।

গঙ্গা মরে গেলেও তার গতিপথের ওপরে যে খাল ছিল, সেই খাল অনেক যুগ ধরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নৌবাহন যোগ্যছিল। সেই সংকীর্ণ জলপথের গর্ভে একটু একটু করে বালি জমেছে। ভরাট হয়ে গেছে সেই একদা বিখ্যাত নদী। আর তাম্রলিপ্তের বুক জুড়ে নেমে এসেছে বিস্মৃতির অমানিশা।

বরেন্দ্রভূমি।

ইতিহাসে এবং প্রাচীনদিনের মহাকাব্যে এই বিশাল জনপদ বরেন্দ্রমণ্ডল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন কিম্বা গৌড় নামে খ্যাত। সেই সুদূরকাল থেকেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন অর্থাৎ উত্তর বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের খ্যাতির কথা ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে (দ্বাদশ শতাব্দী)। আছে হিউয়েন সাঙের বিবরণে। প্রাচীনদিনের এক ব্রাহ্মীশিলালিপি বলে,—পুণ্ড্রবর্দ্ধনই[১১] হলো আধুনিককালের বাংলাদেশের বগুড়া থেকে সাত মাইল দূরে করোতোয়া নদীর ধারে মহাস্থানগড়। ঐতিহাসিক ডক্টর মজুমদার বলেন,[১২] তিনটি কারণে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল বৌদ্ধতীর্থস্থান, দ্বিতীয়ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশের রাজধানী আর তৃতীয়ত উত্তর বাংলার প্রধান বাণিজ্য পথের ওপরে এই নগরের অবস্থান। এবার এখানকার ব্যবসার কথায় আসা যাক—

তাম্রলিপ্তের মতই ইহা একটি প্রাচীন দেশ। বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে, ব্যবসায় আর বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল সেদিন এই বরেন্দ্রভূমির প্রতিটি অঞ্চল।

প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এই দেশ। দূর দূর দেশ থেকে আসতো বিদেশীরা বাণিজ্য করতে, আসতো প্রলুব্ধ হয়ে লুণ্ঠন করতে। যুগের পর যুগ বহির্দেশীয় আক্রমণে মত্ত হস্তীর মত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো এই শান্ত রসাস্পদ জনপদের ওপরে।

পৌরাণিককালের সেই শক্তিশালী নৃপতি পরশুরাম, শিবের উপাসক মহাপরাক্রমশালী রাজা বানের স্মৃতি জড়ানো—এই বরেন্দ্রভূমির একটি প্রধান অঞ্চল মালদহ আর দিনাজপুর। এই দু'টি জেলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা লেখা আছে প্রাচীন পুস্তকে।

মালদহের পথে-প্রান্তরে লাটাগাছের ঝোপে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সরু সরু ইটের তৈরী এক একটি প্রাচীন কুঠিবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। গ্রামের লোক বলে 'রেশমকুঠি'। কে জানে কতদিন আগে এই রেশমকুঠি শত শত মানুষের পদশব্দে মুখরিত হয়ে থাকতো।

হয়তো শত শত শতাব্দী পূর্বে কাটুনী মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে সিল্কের সুতো কাটতো আর দীর্ঘ করে সেই সুতো রোদে শুকোতে দিত।

কত দূর দূর দেশ থেকে বণিকেরা আসতো উত্তর বাংলার এই রেশম কিনতে। উইলিয়াম হাণ্টারের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার[১৩] বলে—

...Staple industry of the district is silk. The industry is said to date back to Hindu Kingdom of Gaur.

গৌড়ের হিন্দু রাজাদের সময় সিল্কের প্রচলন ছিল। ঢাকা, সোনারগ্রাম, সপ্তগ্রামে আরও দূরের অনেক দেশে রপ্তানী হতো পট্টবস্ত্র। এই পট্টবস্ত্রের চাহিদা আজও অম্লান। হিন্দুর পূজায়, যাগযজ্ঞে ও বিবাহে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য।

গৌড়ের শেষতম হিন্দু রাজার ওপরে বখ্‌তিয়ার খিলজীর লুব্ধ তরবারি ঝলসে উঠেছিল। মুসলমান সম্রাটরা নিয়ে এসেছিলেন সৈন্য। নিয়ে এসেছিলেন রণবিদ্যা-নিপুণ দুর্ধর্ষ সৈন্যদল। এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য শত শত পীর সাধু।

এই পীর সাধুরা দেখলেন, ঘরে ঘরে বহুমূল্য ঝলমলে সিল্কের কাপড়। 'ইসলামের উপাসকের কাছে বিলাসিতা এক অমার্জনীয়

অপরাধ। নিষিদ্ধ করে দিলেন রেশমের ব্যবহার। রেশম ব্যবসায়ের ওপরে নেমে এলো দুর্যোগ।

কিন্তু ধর্মভয়ের চেয়ে সংস্কার অনেক বড়। শত শত হিন্দু-মুসলমানের রক্তের ভেতরে রেশমের গুটিসুতোর কাজের নেশা মিশে আছে। তাই ধর্ম আর রাজভয়কে তুচ্ছ করে রাত্রির অন্ধকারে গোপন পদসঞ্চারে বাঙালীদের এই সুপ্রাচীন রেশম ব্যবসা একটু একটু করে পুনরুজ্জীবিত হতে সুরু করল।

যেখানে মাঠের পর মাঠ ছিল মালবেরী গাছ, যে গাছে গাছে রেশম গুটির জন্ম হয়—সেই সমস্ত গাছ নির্মূলভাবে ধ্বংস করেছিল বখ্‌তিয়ার খিলজীর অনুচররা। ধূ ধূ শূন্য মাঠ, নিদারুণ অভিশাপের মত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তরে। সুদীর্ঘ তিনশো পঁয়ত্রিশ বছর পর কেমন করে আবার রেশমের ব্যবসা শুরু হয়েছিল (১৫৩৯) সেই ইতিহাস আজ রূপান্তরিত হয়েছে রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র এক কিংবদন্তীতে—

সেই তুঁতগাছ শূন্য মাঠে একদিন সকলের অলক্ষ্যে এক টুকরো সবুজের আশীর্বাদ দেখা দিল, একটি মালবেরী গাছের চারা।

পীর সাধুরা নিশ্চিন্ত, রেশম গুটির গাছ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তারা জানে না—জানে না কোন জনপ্রাণী সেই জনহীন প্রান্তরে নিশি রাতের স্তব্ধতাকে তুচ্ছ করে আসে এক দুর্ভাগিনী নারী। আসে নিঃশব্দ পায়ে। আসে অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে। শূন্য মাঠের বুকে সেই সবুজ চারাগাছটির গায়ে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দেয়, জল ঢালে। আর গভীর রাতের তারা-জ্বালা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে কে জানে!

ধীরে ধীরে রাত শেষ হয়ে আসে। ভোরের আকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে। আবার সেই রহস্যময়ী নারী দ্রুতপায়ে লোকালয়ের দিকে ফিরে যায়। কে এই নারী?

উত্তর পেতে হলে যেতে হবে আরও আগে। মুশলিম পীর সাধুরা

রেশম ব্যবসা শুধু বন্ধ করতেই চেষ্টা করে নি, তারা ওস্তাদ কাটুনীদের হত্যাও করেছিল।

মালদহ থেকে কিছুদূরে জালালপুরের নুরুদ্দীন ছিল রেশম গুটি থেকে সুতো বের করতে অত্যন্ত সুপটু। রাজরোষকে তুচ্ছ করেও সে গোপনে এই কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

সেদিন জালালপুর গ্রামের প্রান্তে একটি কুটীরের অন্ধকার কোণে বসে শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলেনি সেই দৃপ্ত অসমসাহসী নারী—বুক-ভাঙা শোক, সদ্য স্বামী বিয়োগের সেই মর্মভেদী ব্যথাটাই তার মনের ভেতরে তখন একটি কঠোর প্রতিজ্ঞায় একটু একটু করে রূপান্তরিত হচ্ছিল। যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন এই রেশমের ব্যবসাকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা সে করবে। প্রাণ যায় যাবে।

স্বামীর মৃত্যুর দু'দিন পরই তার ভাইকে নিয়ে রওনা হলো মুর্শিদাবাদ। সেখানে মাঠে মাঠে রেশমগুটি গাছের অবারিত ঐশ্বর্য। কয়েকটি বীজ নিয়ে ফিরে এল স্বগ্রামে। তার নিজের জমিতেই রোপণ করল মালবেরী গাছের সেই বীজ।

হয়তো অপরিণামদর্শী ধর্ম-প্রচারকদের হাতে তাকেও প্রাণ হারাতে হতো নুরুদ্দীনের মত—কিন্তু রাজা পাল্টে গেল। এলেন গৌড়ের সিংহাসনে খিজির খান (১৯৩৯)। তিনি আদেশ দিলেন বাঙালী হিন্দু-মুসলমান বণিকরা অবাধে এই রেশম ব্যবসা করতে পারবে। ইসলামধর্মে এমন কোন অনুশাসন নেই যে, রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করলে অবমাননা করা হয় ধর্মকে।

আবার বরেন্দ্রভূমির দিকে দিকে জেগে উঠল রেশমের সেই অবলুপ্তপ্রায় প্রাচীনতম ব্যবসা। আর সেই সঙ্গে রেশম ব্যবসার ইতিহাসের সঙ্গে সেই নুরুদ্দীন-পত্নী সীতাবাসিনীর[১৪] নাম চিরকাল জড়িয়ে পড়ল।

আজও আছে মহানন্দার তীরে জালালপুর গ্রামের প্রান্তে সীতাবাসিনীর কবর। মহাকাল সেই কবরকে জীর্ণ করেছে, লুপ্ত করে দিয়েছে তার অস্তিত্ব, কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি সীতাবাসিনীর আত্মার অমর মহিমাকে। তার প্রতিজ্ঞা, তার বাসনা, তার স্বপ্নই আধুনিক মালদহের শত শত রেশম সুতোর কাটুনীর বাহুতে বাহুতে আলোড়িত হয়ে উঠছে।

বরেন্দ্রভূমি যেমন প্রাচীন, তেমনি এর নদীগুলিও পৌরাণিক কালের। নদীগুলি এ-অঞ্চলের জীবন-সরণি। রামায়ণে, মহাভারতে তাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

করতোয়া নদীর তর্পণঘাটে মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। পঞ্চপাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে একদিন আত্রাই নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল করদহ গ্রামে।

করতোয়া।

আত্রাই।

পুনর্ভবা।

টাঙ্গন।

মহানন্দা।

এই পঞ্চ নদী। পঞ্চকন্যার মত যুগ যুগ ধরে উত্তর বাংলার রুক্ষ-কঠিন খিয়ার মাটিকে শস্যে সম্পদে শ্রীময়ী করে রেখেছিল। একদিন করতোয়া আর আত্রাই, পুনর্ভবা আর টাঙ্গনের স্রোতে বজরা ভাসিয়ে দূর দূর দেশ থেকে আসতো বাঙালী বণিকরা। ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা চলে যেতো দেশের অভ্যন্তরে জনবহুল নগরের দিকে।

আজ শত শত শতাব্দী পরে আত্রাই, পুনর্ভবারকৃশ-করুণ, রিক্ত-রূপের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করা যায় না যে, একদিন বগুড়া, দিনাজপুর জেলার বাণিজ্য সুসম্পন্ন হতো এই নদীপথে। করতোয়ার

দু'পাড়ে রুক্ষ-অনুর্বর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আজ আর কেউ ভাবতে পারবে না এই নদীর দুই তীরে নিবিড় শালবনের অপরূপ ছবিটি।[১৫] একদিন করতোয়ার তীরের এই শালের ঘন অরণ্য ছিল বাঙালী কাষ্ঠব্যবসায়ীদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। নদীব তীরে নৌকা নোঙর করে তারা লোকজন নিয়ে যেত অরণ্যে। আসতো দূর দেশ থেকে কবিরাজদের অনুচররা। লুব্ধদৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াতো কোথায় আছে অনন্তমূল, কোথায় আছে শতমূলী। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানমতে ঔষুধ প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা ভারে-ভারে নিয়ে যেত শতমূলীর শিকড়, অনন্তমূলের গাছ।

কিন্তু, এই উত্তর বাংলা অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যসম্ভার—তণ্ডুল। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ফলন হয় আমন ধানের। বছরের একমাত্র ফলন। কিন্তু হয় অপর্যাপ্ত। যেই আষাঢ়ে আকাশ কালো করে মেঘ জমে, কৃষকদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামে। বরিন্দের আদিগন্ত প্রান্তব মহাসমুদ্রের রূপ ধরে। কৃষাণরা বীজ ছড়িয়ে দেয়। ভাদ্র-আশ্বিনে উত্তর বাংলার মাঠকে মনে হয় সবুজের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় নীবার ধান্য-মঞ্জরী বাতাসে মাথা দোলায়। ধান পাকলে সে আর এক অপরূপ দৃশ্য। মনে হয় মাঠে-মাঠে কে যেন সোনার স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে। ধানের বিপুল সম্ভারে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তরে। ঠিক এই সময় ঢাকা থেকে, পাবনা থেকে আসতে সুরু করতো বাঙালী তণ্ডুল-ব্যবসায়ীরা।

দিনাজপুরের পশ্চিম অংশের চাউল রপ্তানী হতো মহানন্দা নদী দিয়ে। মহানন্দা নদীর বুকে ব্যাপারীদের নৌকার ভিড় লেগে যেত। নদীতীরে বড় বড় আড়তে মজুত-চাউল বস্তায় করে বোঝাই করা হতো। তারপর বাণিজ্যতরীর বহর আবার একদিন সাদা পাল তুলে চলে যেত বিহারে, যেত উত্তরপ্রদেশের সুদূর অভ্যন্তরে। আর—

এই জেলার পূর্বপ্রান্তের সমস্ত তণ্ডুল-রপ্তানী—তিস্তার উপনদী আত্রাই, করতোয়া আর পুনর্ভবার নদীপথে। কল্পদ্রুমে এই ধানের ব্যবসায়ের ইতিহাস সবিস্তারে লেখা আছে। লেখা আছে পুরাণে।

স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, সমগ্র গণসমাজকে সেকালে পরিশ্রম করে উদরান্ন সংগ্রহ করতে হতো। তখনও জমিদারীপ্রথা চালু হয় নি। বাঙালীর মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে তখনো অলসতা আর স্বপ্ন-বিলাসের বিষ প্রবাহিত হয়ে যায় নি। হয় কৃষিকাজ না হয় কার্পাসশিল্প কিম্বা তাঁতের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতো বাঙালী।

পাবনা জেলার অতি পুরোনো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে দেখেছি সেই এক কথা[১৬]—The weaving of cotton cloths on hand-looms is old industry in Pabna.

বস্ত্রবয়ন পাবনার অতি সুপ্রাচীনকালের একটি শিল্প। অনেক ঝড়-দুর্যোগ গেছে। বহু বাঁধা-বিপত্তি কাটিয়েও এই তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা সাধারণ লোকের পেটের ভাত জোগাতো।

পাবনার তাঁতের সুতোর খ্যাতি সুদূর চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকার সেই বিখ্যাত মসলিন যে সুতো দিয়ে তৈরি হতো সেই সুতোর মত মসৃণতা আর সূক্ষ্মতা ছিল পাবনার কাটুনীদের তৈরি সুতোর।

শুধু মালদহের রেশমবস্ত্র নয়, পাবনার সূক্ষ্ম সুতোর প্রশংসা করলে বস্ত্র-ব্যবসার সব কথা বলা হবে না। দশম শতকে এক আরব[১৭] ভৌগোলিক ইবন খুর্দদবা এসেছিলেন। ইনি বঙ্গদেশকে 'রহমি বা রহম' বলে অভিহিত করেছেন। এই রহমিদেশ সম্বন্ধে আরব দেশীয় সওদাগর সুলেমান বলেছেন—

'এদেশে একপ্রকার সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হইত, অন্য কোন দেশে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত না, এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও

কোমল ছিল যে, একটা আংটির ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যাইত।'

শত শত শতাব্দী পূর্বে এই বঙ্গদেশের শহরে নগরে পরিভ্রমণ করতে এসেছিলেন এক বিদেশী। এই সুপ্রাচীন জনপদের বিদ্যার খ্যাতি, সংস্কৃতির খ্যাতি তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু চমৎকৃত হলেন জ্ঞানে গরিমায় উন্নত এদেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দেখে। বিদেশীর নাম—চাও-জু-কুয়া পিংকলো। কার্পাসবস্ত্রেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

এসেছিলেন দুঃসাহসী মার্কোপোলো[১৮] (১২৯০)। তিনিও এই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কার্পাস-প্রীতি দেখে লিপিবদ্ধ করেছেন কয়েকটি অমূল্য কথা—'এদেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করে এবং তাহাদের ব্যবসা ছিল খুব সমৃদ্ধ।...'

তার অনেক অনেক দিন পরে আরও একজন চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান (১৪০৫) এসেছিলেন বঙ্গদেশে। তাঁর বিবরণের ভেতরে এদেশের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সুখী আর সম্পন্ন জীবনধারার ছবি ফুটে উঠেছে।...এদেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়; এদেশে রেশমের কীট পালিত ও রেশমনির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়...'

কার্পাস-কার্পাস-কার্পাস। বাংলার অতীত ইতিহাসে যেন শুধু কার্পাসশিল্পের খ্যাতির মহিমা ছড়িয়া আছে। এই বস্ত্রশিল্প, তাঁতশিল্প আমাদের সুদূর অতীতের জীবনকে, মনকে একেবারে যেন কুয়াশার মত বেষ্টন করে রেখেছিল। আমার মনে হয়, শুধু ত্রয়োদশ শতক অথবা পঞ্চদশ শতক নয়, একেবারে পৌরাণিককালের সেই রামায়ণ-মহাভারতকেও ছুঁয়ে চলে আসতে হবে চর্যাগীতিরকালে। এখানেও আছে আমাদের দেশের কার্পাসের প্রশস্তি।

চর্যাগীতি আনন্দ-সংগীত[১৯]। গানে আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে। সব কথা স্পষ্ট নয়, তবুও বুঝতে পারা যায়, গায়ক তুলোর বন্দনা গাইছে:

'হেরি সে মেরি তইলা বাড়ি খসমে
সমতুলা ॥
সুকড এসে রে কপাসু ফুটিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না
বাড়ি উএলা ॥
ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ
ফুলিআ ॥

এই ক'টি লাইনের তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃত করা হয়েছে :

মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্টা . খসম সমতুল্যাম্
কার্পাসপুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।

বাড়ির বাগানে কার্পাসের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়াই আনন্দ যেন ঘরের চারপাশে উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল।

শান্তিপাদের একটি পদে আছে—

'তূলা ধুঁনি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুঁনি ধুঁনি নিরবর সেসু ॥
তূলা ধুঁনি ধুঁনি শুনে আহারিউ।
পুন লইয়া অপনা চটারিউ ॥'

তুলো ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ বাহির করা হইতেছে—আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছুই বাকী থাকে না। তূলা ধুনিয় শূন্যে উড়াইতেছি। আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি···

এই বস্ত্রশিল্প যে জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তুলো-ধোনার বাস্তব চিত্রটি তারই প্রমাণ।

শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে ও ব্যবসাবাণিজ্য বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ইতিহাসে বাঙ্গলার এই নিম্নভূমির কয়েকটি স্থানের খ্যাতি সেকালের ইতিহাসের পাতায় সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে।

সেন যুগে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র

হয়ে উঠেছিল। অতীতে যখন চন্দ্র এবং বর্মণবংশীয় রাজারা এই প্রাচীন ভূখণ্ডে রাজত্ব করতেন সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই বিক্রমপুরের শস্যশ্যামলা উর্বর প্রান্তরে অপর্যাপ্ত ফসল ফলতো। মসলিনের জন্য এই অঞ্চলের নাম পৃথিবীর বহুদূরদেশ পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল। আর এই অঞ্চলের পথে-প্রান্তরে হতো প্রচুর কার্পাস। ঘরে ঘরে চরকা কাটা হতো। মাঠে হতো আমন ধান। স্বগৃহের সন্নিহিত মিজাত ফসলেই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়ে যেত স্বচ্ছন্দে।

এই বিক্রমপুরের ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব ছিল সেই দেববংশীয় খ্যাতিমান নৃপতি দশরথ দেবের সময় পর্যন্ত।

দেববংশীয় পরবর্তী রাজারা তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত ক'রে ছিল সুবর্ণগ্রামে অর্থাৎ সোনারগাঁওতে। এই সোনারগাঁওর অবস্থান ছিল বিশাল ভয়ঙ্কর নদী লক্ষ্মীয়া,আর মেঘনার মাঝখানে।

দশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে হরিকেলা (Harikela) নামে আরও একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদের খ্যাতি অনেক—অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত চীনা পর্যটক ইৎ-সিং (I-tsing) বলেন—It was the eastern limit of East India.

কুয়াশায় ঢাকা সুদূর ও অস্পষ্ট অতীতের সেই ধনেজনে সমৃদ্ধ জনপদ হরিকেলার[২০] অবস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের অনেক মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র যে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করতেন, সেই চন্দ্রদ্বীপ হলো আধুনিককালের বাখরগঞ্জ জেলা। আবার কেউ বলে শ্রীহট্টই সেকালের হরিকেলা। বাঙালীর ব্যবসার সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছিল 'হরিকেলা'কে কেন্দ্র করে।

দক্ষিণবঙ্গের সমতট, ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ স্থানের আরও বিশদ আলোচনা করা হবে জেলা পর্যায়ের পরিচ্ছেদে।

দশম প্রবাহ

হাজার হাজার বছর আগে বাংলার রেশম, গাঙ্গেয় জটামাংসী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রোমের বাণিজ্যতরী আসতো 'গঙ্গে' (তাম্রলিপ্ত) বন্দরে।

—পেরিপ্লাস

বাঙালীর বহির্বাণিজ্য।

বাঙালীর বহির্বাণিজ্য অথবা সমুদ্রবাণিজ্যের বিপুল প্রসারতা ঐতিহাসিকের বিস্ময়। কোন সুদূর ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ে রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে ব্যাবিলনের পরাক্রমশালী নৃপতি 'আর নাগাসের' রাজপ্রাসাদের অস্থিচূর্ণ। সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কোথা থেকে এল সেগুন কাঠের বরগা! কোথা থেকে এল সুগন্ধী চন্দন কাঠের টুকরো ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের স্রষ্টিকার আর এক রাজা নেবুকাডনেজারের (৬০৪-৫২৬ খ্রীষ্টপূর্ব) চন্দ্রদেবতার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে—কেন দেখা যায় ব্যাবিলনের ধনী-বিলাসীদের ব্যবহৃত বস্ত্রতালিকার ভেতরে আমাদের বড় আদরের আর গৌরবের সেই নাম মসলিন? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং অ্যাসিরিও-বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেস বলেন[১] খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকেই ব্যাবিলনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য চলতো! বেবারুজাতকেও দেখা যায় হিন্দু বণিকরা 'দিশাকাক' অর্থাৎ দিকনির্ণয়কারী কাক আর ময়ূর নিয়ে ব্যবসা করতে চলেছে সুদূর ব্যাবিলনে। জাতকের কাহিনীতে ভারতীয় সওদাগরদের আরও যে সমুদ্রবাণিজ্যের আভাস আছে সেসব তো বিশদ আলোচনা আগে করা হয়েছে। মিশরের একটি প্রাচীন শিলালিপিও বলছে, খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে সেখানে আবিসিনিয়া আর সোমালিল্যাণ্ড থেকে রপ্তানী হতো আবলুশ কাঠ, হাতীর দাঁত আর ভারতীয় কার্পাসজাত

সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার। ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যেতো আবলুস কাঠ, হাতীর দাঁত ইত্যাদি আবিসিনিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার আরও অন্যান্য দেশে। শুধু পূর্ব আফ্রিকা নয়, শুধু ব্যাবিলন নয়, রোমের সঙ্গেও ভারতের যে ব্যবসাবাণিজ্য চলতো তার প্রমাণ তো জ্বলজ্বল করছে দাক্ষিণাত্যের মাটি খুঁড়ে পাওয়া রোমের রাজকীয় মুদ্রায়—যা আজও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত রেখেছে। পেরিপ্লাসেও আছে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত[২]। পৃথিবীর আরও দূর-দূরান্তরের দেশের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যের যোগসূত্রের নির্ভুল স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে ভিনিসেণ্টের লেখা[৩] প্রাচীন ভারতের ব্যবসার ইতিহাসে, প্লিনি টলেমির আর স্ট্রাবোর গ্রন্থে। ছড়িয়ে আছে পথে-প্রান্তরে পাহাড়ের গায়ে কুড়িয়ে পাওয়া শিলালিপিতে তাম্রশাসনে।

এখন প্রশ্ন হলো, যে দুঃসাহসী হিন্দু বণিকরা উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যেত ব্যাবিলনে, গ্রীসে, রোমে, সিরিয়ায়, যাঁদের বিপুল গৌরবের ঐতিহ্য অনুরণিত হয় বেদের সামগানে তাঁদের ভেতরে বাঙালী কারা? সত্যিই কি পরবর্তীকালের বাঙালী সওদাগরদের রক্তধারায় সেই সুদূরকালের গৌরবোজ্জ্বল হিন্দু বণিকদের ঐতিহ্য নেই? বাঙালী সওদাগররা কি কিছুতেই সেই হিন্দু বা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করতে পারে না? 'বাঙালীর বাণিজ্যের' ইতিহাস লিখতে বসে বারে বারে এই প্রশ্নগুলোই মনের ভেতরে আনাগোনা করে।

ভারতের ইতিহাসের গোড়ার দিকে বাঙালীর অস্তিত্ব অস্পষ্ট; অন্ধকারের যবনিকায় আচ্ছন্ন। সেই ঘন অন্ধকারের ভেতর প্রথম বাঙালী ঝিলিক দিয়ে উঠল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এলেন ভারত অভিযানে। মানবসভ্যতার আদিগুরু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অ্যারিষ্টোটলের যোগ্য শিষ্য আলেকজাণ্ডার শুধু যে

রণনিপুণ আর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল নিয়ে পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে ছিল ঐতিহাসিক, ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ, ছিল ভূগোলবিশারদ। নতুন নতুন দেশের মাটি, মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য উত্তরসূরীদের জন্য লিখে যেতে হবে এই ছিল অ্যারিষ্টোটলের নির্দেশ। তাই গ্রীক ঐতিহাসিক ডিয়োডোরাস, প্লুটার্ক, কার্টিস লিখিত আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ইতিহাস থেকেই প্রথম আমরা গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের কথা জানতে পারি। কার্টিস বলছেন[৪] তারপরেই দেখা গেল গঙ্গা— ভারতের সবচেয়ে বড় নদী। তার ওপারে প্রাচী (Prasii) এবং গঙ্গারিডাই (Gangaridhi) নামে দুটো শক্তিশালী জাতির বসবাস— ডিয়োডোরাস[৫] আরও খবর দিলেন— সিন্ধুর ওপারেও এক বিশাল সমৃদ্ধিশালী দেশের অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। সিন্ধু নদী পেরিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি। সেই মরুভূমি পেরোতে লাগবে বারো দিন—তারপরেই আছে এক নদী—তার নাম গঙ্গা। গঙ্গাব ওপারেই সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তিধর গঙ্গারিডি রাজ্য। সেখানকার রাজার আছে বিশ হাজার ঘোড়া, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই হাজার রথ এবং চার হাজার রণহস্তী। আর প্লুটার্ক[৬] আরও বাড়িয়ে বললেন গঙ্গার ওপারে গঙ্গারিডাই রাজার সৈন্যসামন্তের কথা, সেই দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারকে প্রতিহত করার জন্য বিপুল রণসম্ভার নিয়ে তাদের প্রস্তুতির কথা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ম্যাক্রিণ্ডল তো স্পষ্টই বলেছেন—আধুনিককালের নিম্নবঙ্গই হলো গঙ্গারিডাই জাতির বাসস্থান—The Gangaridae or Gangarides occupied the region corresponding roughly with that now called Lower Bengal…আরও বলেছেন গঙ্গারিডাই বহু জাতির সংমিশ্রণ—তারা ধীরে ধীরে আর্য ভাবধারায় প্রভাবিত হচ্ছে। বিদেশী ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত এই গঙ্গারিডাই যে আধুনিককালের পশ্চিমবঙ্গ—তার আভাস পাওয়া

যায় ম্যাক্রিণ্ডল সংগৃহীত এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকুর ভেতরে৭ Region of Ganges was inhabited by two principal nations Prasii and Gangaridae. Mde-St-Martin thinks that their name has been preserved almost identically in that of Gonghris of South Bihar whose traditions refer their origin to Tirhut and he would identify their royal city Parthalis (or Portalis) with Vardhana (contraction of vardhamana), now Burdwan. ... In Ptolemy, their capital is Gange...গঙ্গারিডাই নামটা দক্ষিণ বিহারের গঙ্গহ্রী নামে জাতি থেকেই আসুক আর তাদের আদিনিবাস তিরহুতেই হোক তারা যে গাঙ্গেয়ভূমির সন্তান এবং হৃষ্টপুষ্ট সবল কুশলী যোদ্ধার জাত—এটা তো ঐতিহাসিক সত্য! কেন না দিগ্বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে গ্রীকবীরকে চলে যেতে হয়েছিল, যাদের রণনিপুণ অশ্ব, গজ ও পদাতিক সেনাবাহিনীর এত বিস্ময়কর প্রসারতা নির্ভুলভাবে ধরা যায়, তাদের নেপথ্যে ছিল দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ সমৃদ্ধিশালী একটি রাষ্ট্র। আর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কোন দেশ রাতারাতি বিপুল রণসম্ভার নিয়ে প্রস্তুত হতে পারে না, পারে না শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আর পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোনকালে রাজস্বের একটা মোটা অংশ দিয়ে পুষ্ট করে তোলা হয় সামরিক শক্তিকে। তাই নিঃসন্দেহে ধরা যায়, আলেকজাণ্ডারের বহু বহু বৎসর পূর্বে প্রাচীন গঙ্গারিডি বা বাংলাদেশ বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে ব্যবসায় আর বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল—অথচ ভারতীয় বণিকদের সেই গৌরবোজ্জ্বল সমুদ্রবাণিজ্য, পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেদের দেশের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব, সেই সোনার ইতিহাসের কোথাও বাঙালীর নাম নেই।

কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের সেই গৌরবদীপ্ত

ইতিহাসে বাঙালী বণিকদেরও যে অস্তিত্ব ছিল তার অস্পষ্ট আভাস মেলে। উইলিয়ম ভিনিসেন্টের 'কমার্স অ্যাণ্ড ন্যাভিগেশান অফ দি এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ান নেশন্স' গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বাণিজ্য করতে ব্রহ্মদেশে যাওয়ার খবর আছে, খবর আছে মালয়ে, সিংহলে, চীনে এবং দূরপ্রাচ্যে। কিন্তু রোমে, ব্যবিলনে, আফ্রিকায় ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ যাচ্ছে মালবার উপকূল থেকে, বারিগাজা (Barigaza) বন্দর থেকে। তাহলে কি করোমণ্ডল উপকূলের জাহাজগুলোর মালবার অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলে যাওয়ার কোন বিধিনিষেধ ছিল? না, যারা উত্তাল ও রাক্ষুসে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চীনে গিয়েছিল, গিয়েছিল সুবর্ণভূমিতে যবদ্বীপে তারা কি রোমে ব্যবিলনে যেতে পারে না?

অনেক খুঁজে পাওয়া গেল ভিনিসেন্টের উক্ত বইতে একটি ছত্রে ...A trade regularly carried on by native traders, between Malabar and Coromandel coasts...আর মনোক্সিল (Monoxyle') নামে এক ধরনের পণ্যবাহী জাহাজ দুই উপকূলেই যাতায়াত করতো। গাঙ্গেয় উপত্যকা অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার সওদাগর পশ্চিমের বন্দরে মসলিন বিক্রি করে নিয়ে যেত মশলা। সেই অপূর্ব সুন্দর মসলিন বস্ত্রসম্ভার চলে যেত আরব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর রোমে, ব্যবিলনে। তাহলে নিশ্চয়ই, এই বঙ্গভূমির পণ্যের সঙ্গে গঙ্গারিডাই জাতীয় ব্যবসায়ীরাও যে থাকতো, দূর বিদেশে পথে-প্রান্তরে গড়তো মন্দির, মসজিদ, ছড়িয়ে দিয়ে আসতো নিজেদের আচার-ব্যবহার আর ধর্মবিশ্বাস—এগুলো কষ্ট কল্পনা নয়! বেদে, পুরাণে, মনুসংহিতায়, বরাহপুরাণে, বোধায়নসূত্রে ধর্মসূত্রে হিন্দুদের সমুদ্রবাণিজ্যের উল্লেখের কোন দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, সনসাল তারিখ নেই 'রঘুবংশে' 'দশকুমারচরি'তে 'কথসরিৎসাগরে' ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্যে, নাটকে তাই ঐতিহাসিকরা বাঙালীর বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস শুরু করেছেন গ্রীক ইতিহাসবিদদের

লিখিত সেই গঙ্গারিডি বা নিম্নবঙ্গের সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত থেকে। কিন্তু পেরিপ্লাসে[৯] আছে, তাম্রলিপ্ত অথবা গঙ্গে বন্দরের খ্যাতি অম্লান ছিল সেই সুদূর কুয়াশাচ্ছন্ন বৈদিক যুগ থেকে। আর এই তাম্রলিপ্ত যদি গঙ্গাতীর সন্নিহিত গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায় তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ভারতীয় বণিকরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে তারাই বাঙালী ব্যবসায়ীদের পূর্বসূরী—এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালীর বহির্বাণিজ্যের ইতিহাসকে বিচার করতে হবে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, ভারত ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পি. টি. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার,[১০] খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের একটি মিশরের শিলালিপিতে ভারতের হাতীর দাঁত, কাঠ আর কার্পাসের খুব আদর ছিল এই দেশে।

ভারতের পশ্চিম উপকূল বারিগাজা (Barigaza) বন্দর থেকে এদেশের পণ্যসম্ভার জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যেত আফ্রিকায়। হয়তো দুই উপকুলের বন্দরে বন্দরে চলাচলকারী সেই মনোক্সিল (Monoxyle) জাহাজেই পণ্য রপ্তানী হতো আফ্রিকায়। আফ্রিকা থেকে দূর দূরান্তরের দেশে ছড়িয়ে পড়তো এই ভারতের তথা বাংলা দেশের বিচিত্র পণ্যবস্তু।

এই বাংলা দেশের আবলুস কাঠ খ্রীষ্টের জন্মের শত শত শতাব্দী পূর্বে রপ্তানী হয়ে যেত আবিসিনিয়ায়, যেত সোমালিল্যাণ্ডে। পূর্ব আফ্রিকার নগরে বন্দরে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো এদেশের তৈরি তলোয়ার, কুড়াল, রঙিন এবং সাদা কাপড়।

সেকালে আবিসিনিয়ার হস্তী শিকারীরা গভীর জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার আগে ভারতীয় অস্ত্র পেলে খুব খুশি হতো। এদেশে তৈরি কাটারির খ্যাতি সম্বন্ধে ছিল তারা নিঃসন্দেহ।

বাঙালী বণিকেরা নিয়ে আসতো মিশর এবং দক্ষিণ আর পূর্ব আফ্রিকা থেকে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য। যেমন এদেশের রমণীরা ব্যবহার

করতো মিশরীয় অগুরু, তেমনি দেখা যায় সুদূর পুরাকালে রাজা সোলেমান মহীশূরের অরণ্যের চন্দন কাঠের সুগন্ধে অভিভূত হয়েছেন। আরব বণিকরা উটের পিঠে করে ভারে ভারে নিয়ে যেত সুগন্ধি চন্দন কাঠ মিশরে, সিরিয়ায়। কিন্তু শুধু চন্দন কাঠ দিয়ে বাণিজ্য হয় না। বহু মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তা, হস্তীদন্ত, বানর আর ময়ূর নিয়ে আসতো মিশর থেকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ-দেশান্তরে সেই প্রাচীন বাণিজ্য বিস্তারে দুটো দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারের আদান-প্রদান হতো অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। মিশরের সেকালের ভাষা ছিল হীব্রু। আমাদের দেশের অনেক জিনিসের নামে হীব্রু নামের প্রভাব আছে, যেমন বানরকে সংস্কৃত ভাষায় বলে কপি, হীব্রুতে বলে 'কাফ'।

হাতীর দাঁতের ইংরাজী 'আইভরি' সংস্কৃতে ইভাদন্ত কিন্তু হীব্রুতে বলে শেন হেভেরিয়ান। কিন্তু ইভাদন্ত থেকেই হীব্রু 'শেন হেভেরিয়ান' কথাটা এসেছে কিনা বলা কঠিন ; সংস্কৃত ভাষা-ভাষী লোকের সঙ্গে মিশরের সিরিয়ার লোকের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিল।

শুধু ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, মিশরীয় উপকথার ভেতরে আমাদের দেশের পুরাণের কাহিনী মিশে রয়েছে।

প্রাচীন এক ঐতিহাসিক কর্নেল উইলফোর্ড লিখেছেন : মিশরের বৃদ্ধ পুরোহিত আর গ্রামবৃদ্ধরা প্রাচীন উইলোগাছের শান্ত ছায়ায় বসে বলে ভারতের মহাভারত আর রামায়ণের কথা।

উইলফোর্ড আরও বলেন, হিন্দু বণিকরা বাঙালী সওদাগররা তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে নিজেদের দেশের অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাসকে মিশরের সিরিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু --

এই সুদূর দেশে বাণিজ্য বিস্তার আর সাংস্কৃতিক ভাবধারার

বিনিময় একেবারে বাধাহীন ছিল না। অনেক বাধা, অনেক ঝড়-দুর্যোগের সঙ্গে দু'হাতে পাঞ্জা লড়ে বণিকদের অগ্রসর হতে হতো।

আমাদের দেশের সঙ্গে মিশরের, আফ্রিকার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল, মিশরের বাজার, আফ্রিকার বাজার ভারতের পণ্যসম্ভারে ছেয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে দেখছিল আরব বণিকরা আর হিংসায় জ্বলে মরছিল। শুধু হিংসা করেই ক্ষান্ত হলো না।

ভারত থেকে মিশরের প্রধান বাণিজ্যপথ লোহিত সাগর আর পারস্য উপসাগর। এই লোহিত সাগর আর পারস্য উপসাগরে রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে এক-একটা জাহাজ ক্ষিপ্রগতিতে চলতে লাগল। দূর থেকে মনে হতো অতিকায় প্রেতচ্ছায়ার মত কতগুলো কালো ছায়া সমুদ্রের বুকে ইতস্তত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হতো তাদের চলা উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন। কিন্তু তা নয়।

রাত্রিচর ক্ষিপ্রগতি রহস্যময় সেই জলযানের আরোহীদের শ্যেন-দৃষ্টি থাকতো অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। বিশাল সমুদ্রের কোথায় কত দূরে রয়েছে বিপুল পণ্যসম্ভারে বোঝাই ধীরগামী ভারতীয় জাহাজ। দেখতে পেলেই হয়, তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। টুকরো টুকরো করে কেটে ভারতীয় বণিকদের সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।

সত্যিই মিশর আর আফ্রিকা যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর আর ভারতীয় বণিকদের কাছে এতটুকু নিরাপদ মনে হল না। তবুও যেত। যাওয়ার চেষ্টা করতো।

বেদ, মনুসংহিতার কাল থেকে যারা সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করতে গেছে, যে দেশের শিশুরা মায়ের বুকে শুয়ে সওদাগরদের সমুদ্র যাত্রার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোয়, তারা তাদের রক্তধারায় প্রবাহিত দুঃসাহসের অহঙ্কারকে বিসর্জন দেবে আরব জলদস্যুদের ভয়ে? কিন্তু—

লোকক্ষয়। হিমালয়ের তরাইয়ের শালকাঠ, মহীশূরের অরণ্যের হাতীর দাঁত আর রেশমের অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার বারে বারে সমুদ্রের জলে বিনষ্ট হবে? এদেশের সওদাগররা নতুন পথ খুঁজতে লাগল। দিন নেই, রাত নেই—তারা চিন্তা করে।

সেদিনের ভারতের সওদাগরদের বাঙালী বণিকদের সেই দুশ্চিন্তার কথা, নতুন জলপথে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করার উপায় বের করার সেই বিচিত্র ইতিবৃত্ত লেখা আছে—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রবন্ধে—By sailing straight to Abyssinia with the help of monsoon, the Indian traders avoided the rapacious pirates of Arabia, who from ancient times dominated the Persian gulf and the Red Sea and prevented Indian goods from being taken straight to Egyptian markets. সিদ্ধান্তের ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এদেশের সওদাগরদের আরব জলদস্যুরা রুখতে পারে নি। বরং বাধা পেয়েই তাদের ওপরে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল।

মিশর ও ব্যবিলনের সঙ্গে এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য যে প্রবলভাবে চলতো তার প্রমাণ আছে বিখ্যাত অ্যাসিরিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেসের লেখায়, মিস্টার জে. কেনেডির প্রবন্ধে,[১১] এবং জাতকের বিভিন্ন কাহিনীতে (পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

এইবার পূর্ব-উপকূল থেকে চীনের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যের আলোচনায় আসা যাক।

চীনের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, 'ত্রিপিটকে' 'মহাবংশে' 'জাতকে' সংস্কৃত সাহিত্যের' বিভিন্ন কাব্যে নাটকে। কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি অটল নয়।

অধ্যাপক ল্যাকৌপেরি (Lacouperi) একটি প্রবন্ধে বলছেন[১২] খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮০-তে হিন্দু বণিকেরা চীনের কোন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেই সওদাগররা যে জাহাজগুলোতে তাদের

পণ্যসম্ভার নিয়ে গিয়েছিল—সেই জাহাজগুলোর গঠন দুইদিকের অগ্রভাগের গঠন পাখীর ঠোঁটের মত। 'যুক্তিকল্পতরু'তে আছে ঠিক এই-রকম তরী নির্মাণের স্পষ্ট নির্দেশ। পেরিপ্লাসেও আছে কোলান্দিয়া নামে একধরনের জাহাজ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যেত সিংহলে, চীনে। ম্যাক্রিণ্ডলও অনুমান করেছেন—কোলান্দিয়াই চীনের উপকূলে যেত। সেই সুপ্রাচীনকালের বেশির ভাগ সমুদ্রগামী তরীর দুইদিকের অগ্রভাগ পাখীর ঠোঁটের মত সরু। হয়তো কোলান্দিয়ার আকৃতিও ছিল যুক্তিকল্পতরুর নির্দেশ অনুযায়ী। আর সেই কারণেই উপনিবেশ স্থাপনকারী সেই হিন্দু বণিকরাই যে বাঙালী সওদাগরদের অতীত বংশধর—এটা স্বীকার করতে হলে দূর বিসর্পিল কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। আর সেই স্মরণাতীত কাল থেকে যে গঙ্গে বা তাম্র-লিপ্ত বন্দর থেকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যে বাঙালী বুদ্ধিজীবি, পুরোহিত, শিল্পী, কারিগররা দলে দলে চীনে যেত তার প্রমাণ পাওয়া যাবে চীনের পথে-প্রান্তরে, মন্দিরের পাথরে পাথরে উৎকীর্ণ করা বাঙলা দেশের বাণিজ্যযানের অবিকল প্রতিকৃতিতে, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীতে।

ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চোয়ান. ই-ৎ-সি-ঙ স্বনামধন্য এই তিন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বর্ণনায় ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমারোহের কথা পড়ে সহজেই কল্পনা করা যায় বাঙালীর বহিবাণিজ্য সুদূর অতীতকাল থেকেই খুব সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বিদেশী পরিব্রাজকরা তো ভারতে এসেছিলেন কেউ চতুর্থ, কেউ সপ্তম শতকে। তার আগে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে সেই কুয়াসাচ্ছন্ন অতীতে কি চীনা সওদাগরদের দল বাংলায় আসতো না? পেরিপ্লাসও[১৩] কোন আলোকপাত করতে পারেনি এই বিষয়ে। শুধু দ্বিধাগ্রস্ত একটি উক্তি আছে, হয়তো খ্রীষ্টাব্দ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই চীনা সিল্ক আসতো তিব্বত ডিঙিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা আসাম পেরিয়ে পূর্ববাঙলা হয়ে গঙ্গার মোহনায় তাম্রলিপ্তে। পরবর্তীকালে অবশ্য বাঙলাদেশে

চীনা সিল্কের আমদানীর অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ আছে। আর আছে বাঙলাদেশের গঙ্গার উপকূল থেকে চীনে প্রচুর পরিমাণে তেজপাতা (Malabatharum) জটামাংসী (Gengetic spikenard) মসলিন আর কচ্ছপের খোল (Tortoiseshel) ও নীল রঙের সুদৃশ্য পাথর রপ্তানীর তথ্যনির্ভর ইতিহাস[১৪] গঙ্গার বয়োবৃদ্ধ কচ্ছপের শক্ত খোল রঙ করে চীনা শিল্পীরা তাদের নিপুণ অঙ্গুলিবিন্যাসে তৈরি করতো টুকিটাকি ঘর বিন্যাসের সামগ্রী।

শুধু সমুদ্র নয়। স্থলপথেও স্মরণাতীতকাল থেকে চীনের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য চলতো তার আভাস পাওয়া যায় চীনের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি চ্যাং-কিয়েনের (Chan-Kien) উক্তিতে। এই রাষ্ট্রদূত ১২৬ খ্রীষ্টপূর্ব উ-চি প্রদেশে ছিলেন। তিনি ব্যাকট্রিয়ার (উত্তর আফগানিস্তান) বাজারে বাংলাদেশের বাঁশ ও রেশম বিক্রি হতে দেখেছিলেন। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন চীনের য়ুনান এবং মেকওয়ান প্রদেশ থেকে ব্যাকট্রিয়া প্রদেশ থেকে এসেছিল এই পণ্য। আরও জানলেন একটা চমকপ্রদ তথ্য[১৫] পণ্য-সম্ভার ভারতবর্ষের ভেতর থেকে চীনদেশে এসেছিল—চীন থেকে গিয়েছিল আফগানিস্তানে (ব্যাকট্রিয়া) হিমালয়ের গিরিপথগুলোর ভেতর দিয়ে সিকিম ও চুম্বি উপত্যকা ডিঙিয়ে তিব্বত ও চীনের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য চলতো। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন এই পথে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই দুই দেশের পণ্যসম্ভারের আমদানী রপ্তানী চলতো। তার প্রমাণ চীনা ভ্রমণকারী কিয়া-টান (Kia-Ten) খ্রীষ্টীয় ৭৮৫-৮০৫ সনে উক্ত পথ ধরেই ভারতে পৌঁছানোর বিবরণ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ব্যাকট্রিয়া এবং সেখান থেকে আরও সুদূর পশ্চিমের রোমে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বন্দরে নগরে বাংলাদেশের রেশম, বাঁশ, তেজপাতা ইত্যাদি বিচিত্র পণ্যসম্ভারের জয়যাত্রার মূলে আছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের চীনের সম্রাট সিন-চি-হোয়াংটির (Tsin-hwangti) আশ্চর্য একটা কৃতিত্ব।[১৬]

He began the great wall across the Gobi desert and prepared the way for direct communication with Bactria and regular Caravan trade between China and Bactria began in 188 B. C.···হঠাৎ হোয়াংটি গোবি মরুভূমির সেই মহাপ্রাচীর তৈরী করতে গেল কেন? সেকথাও বলেছে পেরিপ্লাস[১৭]—অসংখ্য বর্বর ও দুর্দ্ধর্ষ পার্বত্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল ব্যাকট্রিয়ার এই পথ। তারা বণিকদের পণ্যসম্ভার নিয়ে মন্থরগতিতে চলা উটের ক্যারাভ্যানের ওপরে লোলুপউল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সর্বস্ব লুটে নিত। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, একদা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য চীনের সেই প্রাচীর, চীন ও বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।[১৮]

প্রধানতঃ বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য চলতো নিম্নলিখিত স্থলপথগুলো দিয়ে :

(ক) পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে কামরূপ। কামরূপ থেকে আসাম ও মণিপুরের উত্তুঙ্গ পাহাড় ডিঙিয়ে ব্রহ্মদেশের ঘনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন উপত্যকার ভেতর দিয়ে দক্ষিণ চীন পর্যন্ত চলে যেত বাঙালী সার্থবাহের দল। এই দীর্ঘ পথের ধুলোয় স্বনামধন্য বৌদ্ধভিক্ষু য়ুয়ান-চোয়ান-এর পদরেণু মিশে রয়েছে। স্মরণাতীতকাল থেকেই কামরূপের বস্ত্র, চন্দনকাঠ আর অগরুর খুব খ্যাতি ছিল।

(খ) পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে আরও পশ্চিমে পাটলিপুত্র। বৌদ্ধগ্রন্থে পাটলিপুত্রের নাম পালিবোথারা (মগধ) সুদূর উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে বাঙালী ব্যবসায়ীদের সহযাত্রী হয়ে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ই-ৎ-সি-ঙ যে তাম্রলিপ্ত থেকেই (সপ্তম শতাব্দীর সত্তর দশক) বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন—সেই বহুল প্রচারিত তথ্যের ভেতরে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে একটা সত্য—বণিকদের যাতায়াতের পথ ধরেই দূর দেশ-দেশান্তরে চলে যেতেন বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা।

(গ) তাম্রলিপ্ত থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে সিকিম আর চুম্বী একটা পথ—সেকথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা ধরেও বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা মগধে আসতেন। সিল্কের সুতো, রেশমের গুটি আর সিল্কের কাপড় এই অপূর্ব পণ্যসম্ভার যে চীন থেকে বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত হয়ে জলপথে সুদূর দক্ষিণ ভারতের বন্দর দামিরিকায় চলে যেত সেকথা তো পেরিপ্লাস[১৯] বলেছেই। এই পথটির প্রসঙ্গে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় 'তাবাকাটি-নাসিরিতে[২০] (Tebaquati-Nasiri)-হিমালয় থেকে তিব্বত হয়ে বাংলার অভিমুখে আসতো হাজার হাজার ঘোড়া। কারপাটানা কিম্বা কারামবাটানের (ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন হিমালয়ের পাদদেশে বাংলার সীমানাভুক্ত কোন বড় বাণিজ্যকেন্দ্র) হাটে প্রতিদিন সকালে প্রায় দেড় হাজার হৃষ্টপুষ্ট পাহাড়ী ঘোড়া বিক্রি হতো। মধ্য এশিয়া থেকে চীন ও তিব্বত পেরিয়ে কামরূপের ভেতর দিয়ে আসতো এই সহস্র বলশালী অশ্বের বিচিত্র পণ্যসম্ভার। কামরূপ থেকে তিব্বতের ভেতরে গিরিপথ ছিল সেই খবরটিও আছে তাবাকাটি-নাসিরিতে।

(ঘ) আর একটি স্থলপথ ছিল গঙ্গে অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত থেকে কলিঙ্গ হয়ে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলার সুপ্রাচীনকালের সমুদ্রবাণিজ্য তথা অন্তর্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল তাম্রলিপ্তে আসার পথ ছিল। তার প্রমাণ কালের ব্যবধান এড়িয়ে জ্বলজ্বল করছে হাজারীবাগ জেলার দুধপান পাহাড়ের গায়ে সেই শিলালিপি যার কথা আগে বলা হয়েছে। কোন এক সময় অযোধ্যা থেকে তিন ভাই তাম্রলিপ্তে এসে কিছুকালের ভেতরে প্রচুর উপার্জন করে আবার নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা এই লিপিটিকেই উদয়মান্সার শিলালিপি বলেন[২১] এবং ঐতিহাসিকরা অনুমানও করেন এটা অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে আছে উত্তরাপথ

গান্ধার[২২] থেকে একটা বাণিজ্যপথ সুদূর তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু ই-ৎ-সি-ঙ নয়, নাগসেন নামে আর এক বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিমালয় ডিঙিয়ে উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য পথ অনুসরণ করে এক বণিকের সঙ্গে পাটলিপুত্রে এসেছিলেন'—মিলিন্দপনহোতে তার উল্লেখ দেখছি। উত্তর বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও দক্ষিণ বঙ্গের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর তাম্রলপ্ত হয়ে আসমুদ্র হিমাচলে দেহের শিরা-উপশিরার মত ছড়ানো আরও অসংখ্য পথে যে বাঙালী সার্থবাহের পণ্যসম্ভারে বোঝাই গোরুর গাড়ির লহর চলতো—একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাঙলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণভারতের বন্দর দামিরিকা হয়ে সুদূর রোমেরও যে পরোক্ষ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল তার আভাস পাওয়া যায় প্লিনি, টলেমি আর পেরিপ্লাসের[২৩] গ্রন্থে। চীন থেকে যে সিল্কের পণ্যসম্ভার বাঙলাদেশে এসে আবার তাম্রলিপ্ত থেকে চলে যেত দক্ষিণভারতের বন্দরে—সেই অপূর্ব চীনা সিল্ক আকৃষ্ট করেছিল রোম সওদাগরদের। রোমের বাজারে চাহিদা ছিল গাঙ্গেয় জটামাংসীর (Gangetic spikenard)* এক বাক্স সুগন্ধী এই দ্রব্যটির জন্য রোমের[২৪] বণিকরা দিত ৩০০টি দীনার অর্থাৎ তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা। তেজপাতা, দারুচিনি, সুদৃশ্য রঙীন পাথর, মণিমুক্তা, হীরা, জহরৎ এবং বিলাসিতার যাবতীয় পণ্য রপ্তানী হতো দাক্ষিণভারত থেকে। তাম্রলিপ্ত থেকে কোলান্দিয়া নামে পণ্যতরী নিয়মিত দাক্ষিণাত্যে যেত বলেই অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় বাঙলাদেশের সঙ্গে রোমের ব্যবসাবাণিজ্য চলতো।

---

*বিশ্বকোষ বলছে, সুগন্ধীদ্রব্য বিশেষ। গাড়োয়াল থেকে সিকিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে এই বৃক্ষ জন্মে। জটামাংসীর মূলের বর্ণ ফিকে কালো, তীব্র সুমিষ্ট গন্ধ এবং আস্বাদ কটু। ২৮ সের জটামাংসী পিষলে দেড়-ছটাক সুগন্ধী তেল তৈরী হয়।

একাদশ প্রবাহ

গীতি কবিতার ভাণ্ডারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কৃষিতে জগতে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই···বিপুল স্বর্ণাগম করিয়াছিল।

—বৃহৎ বঙ্গ

"মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস ভাল করিয়া চর্চা করিতে মহাবিপদে পড়িতে হয়। কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমানসমাজ কাহারও সম্বন্ধেই বিস্তৃত সমসাময়িক লিখিত উপকরণ পাওয়া যায় না··· বাংলার ঘটনা অনেক স্থলে দিল্লীর ফার্সী ইতিহাসের মধ্যে অংশরূপে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং তখনকার দিনে বাংলার দেখা মাঝে মাঝে পাই, ক্রমাগত পাই না এবং এই দেখাও রাজরাজড়া এবং যুদ্ধ ও খুনের সহিত—দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে নহে"—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের এই উক্তি[১] নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে—বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় (১২০২) থেকে শুরু করে আকবরের বাংলাদেশকে তাঁর বিশাল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা (১৫৭৬), এই সুদীর্ঘ প্রায় চার শতাব্দীর বাংলার জনজীবনের ইতিহাস পাঠান-মোগলদের যুদ্ধের গর্জনমুখর ঝড়ে আচ্ছন্ন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের লেখাতেও এই সময়ের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়[২]। রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধবিগ্রহাদি প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই···দেশের কোন দূর সীমান্তে কোন পাহাড়ের আড়ালে কোন আফগান পাঠান যুদ্ধ করছে, মেতে উঠছে রক্তাক্ত সংঘর্ষে তার খবর দেশের সাধারণ মানুষ রাখতো না। কিম্বা বলা যায়, সেই তীব্র উত্তেজনার ঢেউ আছড়ে পড়তো না বিশাল বিস্তীর্ণ দেশের

শান্ত নিভৃত জীবনে। তাই গ্রামের কাটুনী মেয়ের ললিত অঙুলি-বিন্যাসে সুতো কাটতো। মসলিনের রূপদক্ষ শিল্পীরা তৈরি করতো ভোরের শিশিরের মত নরম আর স্নিগ্ধ 'বস্ত্রাভরণ' 'শবনম' তৈরী করতো জলের মত স্বচ্ছ শাড়ি 'আবরোয়ান','নয়নসুখ' 'ঝুনা'—আরও কত রকমের সুদৃশ্য ও বিস্ময়কর বস্ত্রের পণ্য। শাঁখারী তার করাত আর হাঁতুড়ী বাটালী দিয়ে নিপুণ ছন্দে, যতিতে তৈরি করেছে সুদৃশ্য অলঙ্কার, কুমোর গড়ে তুলেছে অনবদ্য মৃৎশিল্প। এইসব পণ্য বাঙালী ব্যবসায়ীরা হাটে হাটে বিক্রি করেছে, আবার কেউ পাইকারী দরে কিনে নিয়ে সমুদ্রপারের দূর দেশে রপ্তানী করেছে। বাংলার সুবেদাররা দিল্লীর বাদশাহকে কখনো কখনো নজরানাও পাঠিয়েছে অপূর্ব সেই মসলিনের বস্ত্রসম্ভার। 'সরকার আলি' আর 'মখমল খাস' নামে সুদৃশ্য দুই রকমের বস্ত্র দিল্লীর বাদশাহের জন্যেই প্রস্তুত করা হতো। শুধু নজরানা নয়, মসলিন বিক্রয়লব্ধ বিপুল অর্থ দিয়ে রাজস্ব পাঠানো হতো দিল্লীতে—সে খবরও আছে ঢাকার ইতিহাসে।[৩] পাঠানদের অধীনস্থ বাংলার সমাজজীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশ সেন বলেছেন[৪] দেশের বাণিজ্যাদির ওপর বাদশাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারা কৃষির ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই বাংলার একরূপ মালিক ছিল। শুধু কৃষি নহে—ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল।

কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত নেই কোন শিলালিপিতে, নেই তাম্রশাসনে কি পাট্টোলীতে। তাই বলে কি, যে বাঙালী তার রক্তধারায় হাজার বছর ধরে ব্যবসার ঐতিহ্যকে পুষ্ট করে তুলোছিল, তারা বাণিজ্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল? তা নয়, ভেনিসের দুঃসাহসী ভ্রমণকারী মার্কো-পোলোর সেই বহুলপ্রচারিত বিবরণী[৫] তার প্রমাণ। ১২৯০ সালে

যখন বাংলার শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন খান তখন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন নদীর ধারে ধারে প্রচুর তুলোর গাছ। এই দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার ভুয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, এইরকম সূক্ষ্ম আর কোমল তুলা জগতের কোথাও হয় না। উৎকৃষ্ট জাতের তুলো, জটামাংসী, আদা, চিনি, চন্দনকাঠ আরও নানাবিধ পণ্যসম্ভার কিনতে আসতো দূর দূর দেশের সওদাগররা। বাঙালী বণিকরা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করতো ইক্ষু। আর এখানকার অধিবাসীরা মাংস, দুধ ও চাল খায় এবং এই খাদ্যসামগ্রীগুলো তাদের আছেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে।

বাঙালীর এই সুখী-সম্পন্ন জীবনের আভাস পাওয়া যায় তদানীন্তনকালের লোককাব্য মৈমনসিংহগীতিকার 'মলুয়াপালায়'[৬]—

ঘরের ভাত খায় সে যে গোয়াইল ভরা গরু।
কাঠাতে মাপিয়া তুলে ধান চাউল সরু॥

আবার 'মলুয়ায়' যেমন আছে সাধারণ মানুষের শান্ত নিরুদ্বেগ-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি তেমনি গ্রামবাংলার অবস্থাপন্ন উঁচু মধ্য-বিত্তের প্রাচুর্যের চিত্র আছে এই ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ানভাবনায়[৭]—

বাহুতে পরাইয়া দিলাম বাজুবন্ধ তার।
হীরামতি দিয়া দিলাম তোমার গলার হার॥
বাপের বাড়িতে আছ গো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর॥

তখনকার দিনে ধনীবিলাসীরা পুষ্করণীর মাঝখানে যে বিশ্রাম ও প্রমোদগৃহ তৈরী করতো তাকে বলে জলটুঙ্গীর ঘর আর বাজুবন্ধ একটি বহুমূল্য অলঙ্কার। সোনা দিয়ে মোড়া সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুল, মণিখচিত জলটুঙ্গী, কামটুঙ্গীর (ড্রইংরুম) ঘর, চৌচালা, আটচালা ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট বণিকবধূদের সোনার কলসী নিয়ে জল আনতে যাওয়া, অবস্থাপন্ন লোকদের সোনার খাটে বসে

রূপোর তক্তাপোষে পাদুটো ছড়িয়ে দেওয়া, সোনার থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ আহার ইত্যাদি অজস্র রঙীন সমারোহের ছবি আছে যেমন পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় তেমনি আছে মানিকচাঁদের গানে, ডাক ও খনার[৮] বচনে। কোন যুগের ছড়াকার ডাক যখন বলে, 'গাছ রুইলে বড় কর্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম,' কিম্বা যখন বলে, 'স্বর্ণভূমি কন্যাদান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান' কিম্বা খনার সেই সুপরিচিত বচনে যখন শোনা যায় 'দিনে রোদ রাতে জল তাতে বাড়ে ধানের বল,' তখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায়—বখ্তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের বহু আগে থেকেই কৃষি এবং বাণিজ্যের বিপুল সমৃদ্ধিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল বাঙালীর সমাজজীবন। এমন প্রাচুর্যের ভেতরে বাস করতো যে পরবর্তীকালে পাঠানযুগে তা প্রায় বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের এবং তার সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয় চতুর্দশ শতাব্দীর আর এক ভ্রমণকারী ইবনবতুতার[৯] সেই সুপরিচিত বিবরণী। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে সমুদ্রগামী অসংখ্য পণ্যতরী দেখেছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এবং আবশ্যক পণ্যের দামও উল্লেখ করেছেন তিনি।

চাল	আনুমানিক	৮৩/৪ মন	(২৫ রিথল)—	৭ টাকা।
ধান	”	২৮ ”	(৮০ রিথল)—	৭ ”
ঘি	”	১৪ সের	(১ রিথল)—	৩৷০
তৈলবীজ	”	১৪ সের	”	১৷৵০
চিনি	”	১৪ সের	”	৩৷০
মধু	”	১৪ সের	”	৭ টাকা
মুরগী (৮টি বেশ হৃষ্টপুষ্ট)				৷৶০

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য এত সস্তা আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি, বতুতা একথাও বলেছেন। বতুতার ঠিক ষাট বছর পর

চীনা রাজদূত চেঙ-হোর দোভাষী মাহুয়ানও[10] (১৪১০) চট্টগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন।তিনি দেখেছেন, এই বন্দরের দিকে দিকে শত শত চীনা পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে চীনদেশের মত গরম এবং ধান, গম, সরিষা, তাল নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় আর এদেশের বস্ত্রশিল্পীরা তুলো থেকে দৈর্ঘ্যে উনিশ এবং প্রস্থে দুই হাত সুদৃশ্য সূক্ষ্ম মিহি বস্ত্র তৈরী করে। রেশমের কীট সযত্নে পালিত হয় এবং সেই পলু বা কীট থেকে এদেশের রেশমের কারিগররা তৈরি করে রেশমের অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার—দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্য চলতো যে মুদ্রা দিয়ে তার নাম 'টঙ্গ-কা,' রূপার তৈরী। ওজনে ১৬৩.২৪ গ্রেন। মাহুয়ানের এই বিবরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার সঙ্গে চীনের অবাধ সমুদ্রবাণিজ্য চলতো এবং অন্তর্বাণিজ্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত এই সুজলা সুফলা ভূখণ্ড।

মাহুয়ানের এই বিবরণ ছাপা হয়েছে ইং-ইয়াইসেঙ-লান্ (Ying-yaisheng-Lan) নামক চৈনিক গ্রন্থে। চীনা ভাষায় ইং-ইয়াইসেঙ্-লানের অর্থ বোধহয়, সমুদ্রোপকুলের দেশের বিবরণ (General account of the shores of Ocean) এই গ্রন্থে আছে বাংলাদেশের আশেপাশে প্রায় বিশটি প্রদেশে চীনা রাজ-দূতেব দোভাষী হয়ে তিনি গিয়েছিলেন। চট্টগ্রামকে বলেছেন চেহ্-টি-গাম (cheh-ti-gam).

কিন্তু তদানীন্তনকালের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র চট্টগ্রাম কোন রাজ্যের অধীন ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের ভেতর যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলে, আরাকান রাজ্যে ; কেউ বলে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল চট্টগ্রাম। কিন্তু এই শহরের উপকণ্ঠে হাটহাজারী অঞ্চলে জীর্ণ এক মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ করা লিপি বলছে[11] গৌড়ের সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে জনৈক রস্তিখান 'ওলা'

নামে কোন পীরের সম্মানার্থে তৈরী করেছিল এই দরগা (১৪১৬)।
কাজেই মাহুয়ানের চেহ-টি-গাম, বতুতার সুদকাওয়ান (Sud-kawan) অর্থাৎ চট্টগ্রাম যে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা দেশেরই আন্তর্জাতিক বন্দর সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। শুধু চীনা ব্যবসায়ী নয়, সুদূর ইরাকের বাগদাদ এবং বসোরা থেকেও বণিকরা আসতো বাংলার এই বন্দরে। বাগদাদের এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী আলফা-হুসায়িনী (Alfa-Husaini) চোদ্দটি বাণিজ্য-তরীর বহর আর অনেক ক্রীতদাস নিয়ে জাঁকিয়ে আসতো চট্টগ্রামে। ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক স্ফীত হয়ে উঠলেই তার নামতে ইচ্ছা করে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে, তাই পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে শ্রেষ্ঠীর হাতে দেখা যায় রাজদণ্ড। সেই অভ্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী হুসায়িনীর মনেও সমুদ্র ধারের এই বিপুল সম্ভাবনাময় বন্দরটির মালিক হওয়ার বাসনা হয়েছিল— সে কথা জানা যায় পার্শী ভাষায় লেখা চট্টগ্রামের ইতিহাস 'তারিখি-ই-হামিদি'তে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ যদুনাথ সরকার বাংলাদেশে আগত বিদেশীদের বিবরণকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিল বলে উল্লেখ[১২] করেছেন। আর বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের তেমন কোন উপাদান পাওয়া যায় না বলেই মধুর অভাবে গুড়ের মত সমুদ্র-পারের মানুষদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোচনা এসে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিকলাই কন্টি[১৩] গঙ্গার স্রোতে জাহাজ ভাসিয়ে এসেছিলেন কোন বন্দরে। তিনি বলেছেন গঙ্গা এত বিশাল নদী যে মাঝখান থেকে তার দুই তীর দেখা যায় না। কোন কোন জায়গায় প্রায় ১৫ মাইল চওড়া। নদীর ধারে ধারে দেখেছেন দীর্ঘ, পুষ্ট আর নিবিড় সবুজ বাঁশবন। সেই বাঁশের একটা গিরা থেকে আর একটা গিরা পর্যন্ত প্রায় এক মানুষ লম্বা। এই শক্ত শক্ত বাঁশগুলো সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরীর কাজে লাগে। নদীর

পাড়ে ঘনসন্নিবদ্ধ আম, জাম, কাঁঠাল আর কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে সুদৃশ্য মনোরম এক একটি 'ভিলা'। কলাগুলো নাকি মধুর চেয়েও মিষ্টি! কন্টির বিবরণের ভেতরে মূর্ত হয়ে ওঠে বাংলার জীবন-সরণি বিশাল বিস্তীর্ণ গঙ্গা আর তার দুইপাশে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ শস্যশ্যামলা এক উর্বর জনপদের ছবি।

নিকোলো কন্টির প্রায় সমসাময়িক আরও দুইজন বিদেশী ভ্রমণকারীর বিবরণের ভেতরে বাংলার বাণিজ্যের এবং বাংলার সমৃদ্ধির আভাস আছে। সমুদ্রপারের এই দুই পর্যটক ভার্থেমা (১৫০৩-১৫০৮)[১৪] ডি বেবোজ (১৫৩২-১৫৩৮)[১৫] ইটালী থেকে ভার্থেমা টেনাসেরিয়াম (মসলীপত্তম) হয়ে দেশীয় জাহাজে এসেছিলেন সেকালের বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য সমৃদ্ধ 'বাঙলা'*

---

*বাঙ্গেলা বন্দর নিয়ে দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকদের ভেতরে প্রচুর মত-বিরোধ আছে। ভার্থেমা যেমন স্পষ্ট করে বলেন নি বাঙ্গেলার আর এক নাম গৌড়, তেমনি তাঁর পরবর্তী ভ্রমণকারী ডি বেরোজও বলেন নি। তিনি পরিষ্কার বলেছেন· ·going well into it there is to the north a right great City of the Moors which they call Bengala. উপসাগর পেরিয়ে একটু উত্তরে গেলেই পাওয়া যাবে 'মুর' অধ্যুষিত একটা বড় শহর এবং ব্যবসাকেন্দ্র। Mr. H. Yute তাঁর Hobson. Jobson এবং Cathay গ্রন্থে G. Badger সম্পাদিত ভার্থেমার ভ্রমণবৃত্তান্তে, H. Beveridge লিখিত বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাসে এবং আরও অনেক গ্রন্থে দেখা যায় 'বাঙ্গেলা'কে কেন্দ্র করে চারটি শহরের নাম, (১) চট্টগ্রাম (২) সোনারগাঁও (৩) সপ্তগ্রাম এবং (৪) গৌড়। বেশীরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, চট্টগ্রাম পর্তুগীজদের 'পোর্টোগ্রাণ্ডেই' 'বাঙ্গেলা' কিন্তু কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না, চট্টগ্রাম যেমন কর্ণফুলী নদীর পাড়ে, সোনারগাঁও তেমনি মেঘনার পাড়ে। সপ্তগ্রামের পাশে ছিল সরস্বতী নদী, গৌড়ের পাশে গঙ্গা! প্রতিটি নদীই সমুদ্রবাহী। আর তার পাড়ে প্রতিটি জনাকীর্ণ শহরই বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র! তাছাড়া এই চারটি সমুদ্রবন্দরই তদানীন্তনকালের বাংলার

বন্দরে। বলেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমুদ্রবন্দর এই 'বাঙ্গেলা' (Bangala)। এখান থেকে প্রতি বছর এদেশের বিচিত্র পণ্যসম্ভার তুলো আর রেশমজাত বস্ত্র বোঝাই হয়ে পঞ্চাশটি জাহাজ সমুদ্রপারের দূর দূর দেশে চলে যায়। এদেশের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য চিনি, আদা ও তুলোর ফলন হয়।

পর্তুগীজ পর্যটক ডি বেরোজও ধনেজনে সমৃদ্ধ 'বাঙ্গেলা'র বিপুল সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতমহাসাগর যেখানে উপসাগর হয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করেছে ঠিক সেখানে বাঙ্গেলা বন্দর। তাই এখান থেকে দূর সমুদ্রে যাওয়ার খুব সুবিধা ছিল। এই বন্দর থেকে হাজার হাজার পণ্যতরী চলে যেত মালাবারে, চলে যেত কাম্বে, পেগুতে, টেনাসেরিয়ামে চলে যেত সুমাত্রায় আর সিংহলে। দেশবিদেশের বহু বণিকের পদশব্দে মুখরিত থাকতো বাঙ্গেলা বন্দর। তাদের ভেতরে ছিল আরবী, পারসিক, অবিসিনিয় ব্যবসায়ীরা।

গঙ্গাবক্ষ থেকে বন্দরের দিকে দিকে দেশী-বিদেশী অসংখ্য সমুদ্রগামী পণ্যতরীর ভীড় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল আরবের ব্যবসায়ী চাম্বন আলি। ব্যবসা করতে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। সুদূর প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের কেন্দ্র (clearing centre) এই 'বাঙ্গেলা' বন্দরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে চাম্বন আলির বর্ণাঢ্য বিবরণ জ্বলজ্বল করছে পাণ্ডুলিপিতে।

দেখছি, কোন বিদেশীর একটি বিবরণেও বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা ছাড়া দুঃখদৈন্যের কথা নেই। আমার মনে হয়, প্রকৃতির আশীর্বাদে এদেশের মাটি উর্বরা। অগ্রহায়ণে পাকা ধানের ঐশ্বর্যে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে দিগদিগন্তে। মাঠে মাঠে আম,

---

ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির আভাস দেয়। এখন সেই 'বাঙ্গেলা' কোথায় ছিল সেটা ঠিক করবে ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক।

কাঁঠাল, কলা, ইক্ষু এবং আরও কত রকমের সুস্বাদু ফলের সমারোহ। প্রান্তর জুড়ে তুঁতগাছের পাতায় পাতায় দোলে রেশমের কীট। দেশের এখানে সেখানে কার্পাস গাছে গাছে তুলো হয় অঢেল। দেশের মাটি যেখানে শেষ, সেইখানেই সমুদ্র। আর দেশের মানুষের রক্তে আছে হাজার বছরের সমুদ্রবাণিজ্যের ঐতিহ্য। কৃষিজাত পণ্যের যেমন অভাব নেই, অভাব নেই কার্পাসজাত ও রেশমজাত সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভারের। কাজেই বাঙালী ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভেতরেও তার আমদানী রপ্তানীর বৈদেশিক বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু বণিকদের সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল, কেমন ছিল তাদের অবস্থা—তা জানা যায় না বিদেশীদের বিবরণ থেকে। সম্ভবও নয়। তারা সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে বন্দরে আসতো। দেখতো, জাহাজে জাহাজে মাল ওঠানামা করছে। দেশী-বিদেশী বণিকদের নানা ভাষার বিচিত্র সংলাপে মুখরিত সমুদ্রবন্দর। দেশের ভেতরে কোন দূরপ্রান্তে সুলতানের পেয়াদা ট্যাক্সের দোহাই দিয়ে কোন বণিকের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে, কোথায় কোন ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই গরুর গাড়ির লহরের ওপরে বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে দস্যুর দল এসব মার্কোপোলো থেকে ডি বেরোজ ভুবনবিখ্যাত পর্যটকদের দল জানতে পারতো না। কারণ, তারা দেশের মানুষের ভাষা জানতো না, জানতো না সেকালের রাজভাষা পারসী—আর দেশের অভ্যন্তরে যেতও না। তাই বাংলার তথা ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের সার্থক গবেষক যদুনাথ সরকার বিদেশীদের সাক্ষ্যগুলো যেমন নির্ভরযোগ্য দলিল বলেছেন তেমনি আবার 'ভাষা ভাষা', 'মামুলী'ও বলেছেন।

সে যাক, দেশের ব্যবসাবাণিজ্য চলে রাজনীতির হাত ধরে। তাই রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় আসা যাক। পূর্বেই বলেছি সুলতানদের কারোই বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য ছিল না—ছিল না

কোন গঠনমূলক কাজের দিকে লক্ষ্য। কারণ, তাদের সিংহাসন পদ্ম-পাতার জলের মতো টলমল করতো। কিন্তু ঘন ঘন যুদ্ধ পরিচালনা, বিপুল সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষনের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হতো। তাই তাদের খরলক্ষ্য ছিল রাজস্বের দিকে। অতএব দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর বসে গেল কর। বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে কর, পণ্য নামাতে গেলেও কর। প্রত্যেক পদে পদে করভারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল ব্যবসায়ীরা। শুধু তাই নয়, রাজার আমলারা খুব বেশি পরিমাণে কর আদায় করে মোটা অংশ নিজের পকেটে পুরতো। ট্যাক্স আদায়েব নামে নির্বিচারে অত্যাচারও করতো। আর ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীরের মত স্থলপথে দস্যুতস্কর জলপথে জলদস্যুদের হাতে বণিকদের সর্বস্ব খোয়াতে হতো। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনাকাল (১২০২) থেকে শেরশাহের বঙ্গবিজয় (১৫৩৮) এই সুদীর্ঘ তিন তিনটি শতাব্দীরও অধিকাল জুড়ে ব্যবসাবাণিজ্যের বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের মাঝে মাঝে বিষধর সাপের মত উঁকি দেয় ওই অভিশাপগুলো। সেই অভিশাপ থেকে দুঃখদুর্যোগের অন্ধকার থেকে বাঙালী বণিক তথা বাঙলার ব্যবসাবণিজ্যকে প্রসন্ন আলোয় নিয়ে এসেছিলেন প্রাক্ মোগলযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি, শেরশাহ।

সন ১৫৩৮। শেরশাহ বাংলার অধীশ্বর বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। যেমন দূরদৃষ্টি তেমনি প্রজাবৎসল। কি শাসন ব্যবস্থায়, কি মুদ্রানীতি কি ব্যবসাবাণিজ্যে আমুল পরিবর্তন এনেছিলেন।

শের দেখলেন, কর দিতে দিতে একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়ছে বণিকরা। তাই তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক একেবারে তুলে দিলেন। ডক্টর কানুনগো লিখেছেন[১৬]…"abolishing all levys and internal custom :…ঘোষণা করলেন। শুল্ক দিতে হবে বাংলা থেকে পণ্য বাইরে যাবার সময় সীমান্তের চেকপোস্টে।

দ্বিতীয়ত ইতিহাসে আছে, Sher wanted to give an impetus to the trade of Bengal by providing security to the movement of goods throughout the province. এতদিন রাজপথে বণিকদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। হয়তো বহু কষ্টে পণ্য নিয়ে গভীর রাত্রে চলেছে একদল সওদাগর। অতর্কিতে তাদের ওপরে ঝাপিয়ে পড়েছে দস্যুরা, নিয়েছে সর্বস্ব লুটে। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে দূরদেশের বণিকেরা।

তাই শেরশাহ ঠিক করলেন, একেবারে বঙ্গদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ তৈরী করতে হবে। এই সুদীর্ঘ পথের পরিকল্পনার আড়ালে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

(ক) প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে যুদ্ধ এবং সৈন্য পরিচালনার সুবিধা হবে না।

(খ) ব্যবসাবাণিজ্যের অর্থাৎ বণিকদেব যাতায়াত এবং পণ্য-সম্ভারের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

এই দীর্ঘ পথই উত্তরকালে 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' বলে খ্যাতি পেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকরা বলেন, শের শা আসলে এই পথ তৈরী করেন নি। এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটিই পাণিনি বর্ণিত উত্তরাপথ।

এই উত্তরাপথের ধুলোয় গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসের পদরেণু মিশে রয়েছে। এই পথ ধরেই তিনি পাটলিপুত্রে এসে ছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে।

কিন্তু মহাকাল এই দীর্ঘ রাস্তাকে জীর্ণ করেছিল। বহু বছরের বর্ষার জলে আর গো-যান চক্রের নিষ্পেষণে সহস্রদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শের শা এই পথটিকে মেরামত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরও ভেবেছিলেন, পথ তৈরি করলেই হবে না। সওদাগররা বিশ্রাম করবে কোথায়? কোথায় করবে রাত্রিযাপন? আর নিদাঘতপ্ত দিনের মধ্যাহ্নে কেমন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবে?

তাই ইতিহাস লিখছে·"প্রাচীন মৌর্য নৃপতিগণের আদর্শেই তিনি পথের দুইধারে ফলবান ছায়াতরু রোপন ও পান্থশালা স্থাপন করাইয়াছিলেন।"

শেরশাহ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সওদাগরদের সঙ্গে যেন সর্ব-বিষয়ে সুব্যবহার করা হয়। আর দূরদেশে যেতে যেতে যদি কোন বণিকের মৃত্যু হয় তাহলে যোগ্য ওয়ারিশ খুঁজে তার পণ্যসম্ভার দিয়ে দিতে হবে। বাজারের নির্দ্ধারিত মূল্য ভিন্ন কোন পণ্যদ্রব্য রাজ কর্মচারীরা কিনতে পারবে না।

তিনি এই সমস্ত আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হননি। দৃঢ়হস্তে সেগুলো প্রয়োগও করেছিলেন শেরশাহ। তাই তাঁর আমলে বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য বিপুল উন্নতি লাভ করেছিল।

এই সময়ে বাংলার সমুদ্র উপকুলে বিদেশীদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাতগাঁও[১৭] হয়ে উঠেছিল পর্তুগীজদের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র; শেরশাহের পূর্ববর্তী বাংলার অধীশ্বর পর্তুগীজ ব্যবসায়ী আফেনসো ডি মেলোকে সাতগাঁওতে কুঠি তৈরী করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তার ফলে সাতগাঁও ধীরে ধীরে পর্তুগীজদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল এবং পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের অনুমতি ছাড়া কোন বাণিজ্যতরী সাতগাঁও বন্দরে নোঙর করতে পারতো না।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডি. বারোজের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তখন চট্টগ্রাম ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। এইখানেই পর্তুগীজদের মত আর একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর আনাগোনা শুরু হয়েছিল।

এরা ওলন্দাজ। শুরু হলো ওলন্দাজ আর পর্তুগীজে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এতদিন পর্তুগীজরা একাই বাংলাদেশের বাণিজ্যে লাভের অঙ্ক কুড়োচ্ছিল। জে. কম্পোসের লেখা History of Portuguese in Bengal গ্রন্থে ভ্রমণকারী মানরিখের (Manrique) Account of Portuguese trade—গ্রন্থের এই

উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। The Principal things they brought to Bengal were from Malacca, Sumatra, and Borneo, such as 'Brocades, 'Brocateles' 'Velvets', 'Damasks,' Satins, Tafiosinas, Muslins of all colours but black, which colour was considered illomened in Bengal. From Malacca they also brought cloves, nutmegs and mace and from Borneo the highly prized camphor. They brought cinamon from Ceylon and pepper from Malabar. From China they brought silks, gilt furnitures such as bedsteads, tables, coffers, chests, writing desks, boxes and very valuable pearls and jewels, for labour being cheap in China these were made in European style but with greater skill and cheaper.

পর্তুগীজরা মালাক্কা, সুমাত্রা এবং বোর্ণিও থেকে বাংলায় আমদানী করতো বিচিত্র রকমের বস্ত্রসম্ভার যেমন সাটিন, ভেলভেট, ব্রোকেডস ইত্যাদি। বিচিত্র সব সুগন্ধী দ্রব্য আসতো মালাক্কা থেকে। বোর্নিও থেকে আসতো কর্পূর। দারুচিনি আসতো সিংহল থেকে আর মালাবার থেকে আদা। সিল্ক আমদানী করতো চীন থেকে আরও নানাবিধ বিলাসসামগ্রী আর ঘর সাজানো আসবাবপত্র যেমন টেবিল, লেখার ডেস্ক, সিন্দুক এবং বাক্সও আনতো তারা চীন থেকে। চীনে মজুরী সস্তা বলে খুব সস্তায় তারা উৎকৃষ্ট মুক্তোর তৈরী অলঙ্কার সামগ্রীও আমদানী করতে পারতো।

এই সমস্ত বিদেশী পণ্যবস্তু বাংলার বন্দরে বন্দরে আমদানী করে পর্তুগীজরা বিপুল লাভ করতো। সমসাময়িককালের অনেক বিদেশী পর্যটক অনুমান করেন, যদি ওলন্দাজরা না আসতো তাহলে বাংলার সমুদ্র উপকূলের পর্তুগীজ কুঠিগুলোতে এতটুকু লোহার

চিহ্ন পাওয়া যেত না। হয়তো কুঠির প্রত্যেকটি ঘরবাড়ী পর্যন্ত আগাগোড়া সোনা বা রূপা দিয়ে মোড়া হয়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাঙালীর ব্যবসার ইতিহাসে পর্তুগীজদের একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে।

বাঙালীর ব্যবসার ইতিবৃত্তে সর্বপ্রথম যে বিদেশীরা উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলার বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওতে এসেছিল তারা পর্তুগীজ। বাংলার পণ্যের বাজারকে যখন পৃথিবীর দূর দূরান্তরে প্রসারিত করেছিল তখন সেই স্বনামধন্য ও বিশ্ববিখ্যাত রাণী এলিজাবেথ জন্মান নি; তখন কাবুলের দুর্গম গিরিশৃঙ্গ থেকে বাবর গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে নেমে এসে মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নি।

গঙ্গার বিশাল জলরাশিতে পর্তুগীজ জাহাজের ছায়া পড়েছিল প্রথম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তারও বিশ বছর আগে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে দুস্তর সাগর পেরিয়ে এসেছিলেন এদেশে ভাস্কো-ডি-গামা।

আর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে আলবুকুয়েবকু[১৮] (Albuquerque) নামে এক পর্তুগীজ গভর্ণর বাংলার (১৫১৭) বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেকথা তিনি তদানীন্তন পর্তুগালের নৃপতিকে জানিয়েছিলেন।

তারপরে একে একে এসেছে আরও কত পর্তুগীজ বণিক। সপ্তগ্রাম আর চট্টগ্রাম মুখরিত হয়ে উঠেছে তাদের পদশব্দে।

পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল তার কারণ শের শা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। ফলে দক্ষিণ সমুদ্রের অধীশ্বর হয়ে বসেছিল পর্তুগীজরা। তাদের অনুমতি ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে অন্য কোন পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করতে পারতো না। দেশীয় বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করার জন্য কী ভয়ঙ্কর হিংস্র

হিংসাত্মক নীতি অবলম্বন করেছিল সেই রক্তাক্ত ইতিহাস লেখা আছে নাম্বিয়ারের লেখা 'Portuguese sea pirates in India ocean' গ্রন্থে। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্যই তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। আর তখন থেকেই এদেশে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কিত ইতিহাসেব সূত্রপাত ; শুরু হলো পতাকা বাণিজ্যকে অনুসরণ করার (Flag follows the trade) সেই নীতি। পরবর্তীকালে এই জগজ্জয়ী নীতিকে বহন করেই এসেছে ওলন্দাজ, এসেছে ইংরেজ, এসেছে ফরাসী উপনিবেশ শিকারীর দল। সে ইতিহাস যেমন করুণ তেমন দীর্ঘ।

দ্বাদশ প্রবাহ

দূর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে সেদিন 'বেঙ্গলা' বন্দরে আসতো, আসতো উর্বরা বাংলার অপর্যাপ্ত ও সুলভ পণ্যের আকর্ষণে আরব, পারস্য এবং আবিসিনিয়ার বাণিজ্যতরী।

—রাল্‌ফ ফীচ্

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা।

রেনেসাঁসের বাংলা। বিদ্যা-চর্চায়, জ্ঞানের অনুশীলনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে যেন নবযুগের সূচনা হয়েছিল এই সময়। বিজয় গুপ্ত লিখছে মনসামঙ্গল', 'মহাভারত' সম্পাদনা করছে মালাধর বসু, চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করছে মুকুন্দ দাস, শ্রীরূপ লিখছে 'বিদগ্ধমাধব', 'হরিভক্তিবিলাস' লিখছে সনাতন। সুলতানী শাসনের দীর্ঘ অবক্ষয় ও দুঃখ-দুর্যোগের অন্ধকারের পরে মহামতি আকবরের উদারনীতি এবং সুশাসনের ফলে বাংলার মানুষ যেন প্রসন্ন আলোয় এসে দাঁড়িয়েছিল। দেশজুড়ে পুনর্জাগরণের আরও কারণ আছে—দুঃসাহসী বিদেশী ব্যবসায়ীরা সাগর পাড়ি দিয়ে দলে দলে আসছে। তারা বহন করে আনছে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা। তারা গঞ্জে গঞ্জে গড়ছে কুঠি, গড়ছে দুর্গ, গড়ছে গীর্জা। দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে। তাই এই শতাব্দীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক ইতিহাস গবেষক[১] বলেছেন—Enthusiasts travelled from place to place, mind was brought into mind, there was a brisk circulation of fertilising ideas …the contact with the merchant adventurers, the liberal toleront policy of a wise ruler,—all contributed

to produce 16th Century in Bengal. কিন্তু বাদশাহী বাংলায় যেমন এসেছিল রেনেসাঁস, এসেছিল আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির জোয়ার তেমনি সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নীচে জমে উঠেছিল অন্ধকার। এই হয়—এই নিয়ম। মানসিক উন্নতির বিপুল বন্যা বস্তুব জগতে অর্থাৎ মেটিরিয়েলি মানুষকে দুর্বল ও কর্মবিমুখ করে তোলে। এই সময় থেকেই শুরু হলো স্বদেশী সমুদ্রবাণিজ্যের ক্রমবিলুপ্তি, শুরু হলো বিদেশী বণিকদেব ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি।

ইউরোপীয় বণিকদের ভেতরে সর্বপ্রথম এসেছিল পর্তুগীজরা। তারপরে এসেছে ওলন্দাজ, এসেছে ইংরেজ, এসেছে দিনেমার আর ফরাসী। কিন্তু কেন সেই সুদূর ইউরোপ থেকে তারা উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলায় তথা ভারতে এসেছিল তা জানতে হলে তদানীন্তনকালের ইউরোপীয় পটভূমি পর্যালোচনা দরকার। ষোড়শ শতাব্দী ইউরোপেও একটা নতুন ভাবধারার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক[২] বলেছেন,—Traditional and established ways of men's thought about themselves and their culture giving way to new and different concepts…অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের অধিবাসীদের প্রচলিত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ পাল্টে গিয়েছিল, এক নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তারা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপরে সব কিছু ছেড়ে নিজে নিরুপায় হয়ে বসে থাকা, পুরোহিতদের কঠিন অনুশাসন, তাদের নির্বিচার শোষণ ও উৎপীড়ন ইত্যাদি শ্বাসরোধী সেই অবক্ষয়ী পরিবেশ থেকে তারা মুক্তির পথ খুঁজছিল। ওদিকে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির চাপ, ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্যের উর্দ্ধগতি ইউরোপের মানুষকে বাধ্য করেছিল দূরপ্রাচ্যের সেই সোনার দেশের মাটিতে ভাগ্যান্বেষণে।

কিন্তু পর্তুগীজরা সবচেয়ে প্রথমে এসেছিল কেন? ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন ও পর্তুগাল স্পেনের রাজার অধীনে একটি যুক্ত

সরকার গড়ে তুলেছিল। কিন্তু স্পেনের কাছে পর্তুগীজরা কোন মর্যাদা পেল,না বরং পেতে লাগল পরাধীন জাতির মত ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আমদানী রপ্তানীর প্রধান বন্দর ছিল স্পেনের প্রভাবাধীন আমস্টার্ডাম এবং এনটোয়ার্প। হল্যাণ্ডের সঙ্গে স্পেনের এই দুটো বন্দরের মালিকানা নিয়ে বাধল বিরোধ। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের কাছে যেমন নিষিদ্ধ হয়ে গেল এই দুইটি বন্দর তেমনি নিষিদ্ধ হয়ে গেল পর্তুগীজদের কাছে। তাই ব্যবসাবাণিজ্য এমনি করে প্রতিহত হওয়ায় এই দুটো ইউরোপীয় জাতি নিজেদের চেষ্টায় দূর প্রাচ্যে বাণিজ্য গড়ে তুলতে বাধ্য হলো। ১৫৯৪ থেকে সুদীর্ঘ উনসত্তর বছর ধরে বাংলার বন্দরে বন্দরে, গঞ্জে গঞ্জে চলেছিল তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্তাক্ত সংঘর্ষ,—সে ইতিহাস কারো অজানা নয়।

পর্তুগীজ বণিকরা যখন এল তখন ভারতের তথা বাংলার বন্দরে বন্দরে চুটিয়ে ব্যবসা করছে মুররা এবং আরবরা। বিদেশী বণিকদের বিবরণে আছে—গৌড়ে, সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে তারা রাজার মহিমায় বিরাজ করছে। কঙ্কন থেকে মালাবার উপকূল হয়ে একেবারে করোমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত অর্থাৎ আরব সমুদ্র থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের সর্বত্র ছিল এই মুরদের (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমান ব্যবসায়ী) অবাধ গতিবিধি। কেন, ভারত তথা বাংলার সর্বত্র আরবীয়রা মনোপলি করেছিল ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক চার্লস ডানভার[৩] তারও কারণ দেখিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর আরবের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে শুরু করেছিল। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে শুরু করেছিল রাজ্যবিস্তার। পারস্য, মিশরকে হারিয়ে গ্রীসকে উৎখাত করে দিয়েছিল প্রাচ্য পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর একমাত্র বন্দর আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে। আলেকজেন্দ্রিয়ার ওপর পূর্ণ

আধিপত্য পাওয়ার পরই বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পায় তেমনি আরব বণিকরা উপলব্ধি করল…প্রাচ্যে বাণিজ্যের অনাগত আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সঙ্গে সঙ্গে তারা—'enter upon the mercantile enterprize…as warriors'. অর্থাৎ যোদ্ধার মতই দৃপ্তভঙ্গীতে দূর প্রাচ্যে ব্যবসার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তারা। আরব বণিকদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ দিয়েছিলেন তাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক খলিফা ওমর। তিনি 'টাইগ্রীস' ও 'ইউফ্রেটিশ' নদী এবং পারস্যপোসাগরের সংযোস্থলে 'সাট-এল-আরব' নদীর পাড়ে নির্মাণ করলেন সুদৃশ্য এক বন্দর-বসোরা। বাংলার বন্দর সপ্তগ্রাম থেকে তারা নিয়ে যেত মসলিন, নিয়ে যেত রেশম, জটামাংসী, আদা—সিংহল থেকে নিতো দারুচিনি। আরও কত বিচিত্র পণ্য দাক্ষিণাত্য থেকে মালাবার উপকুলের বিভিন্ন বন্দর থেকে তারা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেত এই বসোরায়, আলেকজেন্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে এই সব পণ্য চড়া দামে ইউরোপে বিক্রি করতো।

প্রাচ্যের বহু জিনিস আরবদের মাধ্যমেই প্রথম চিনেছিল ইউরোপ। যেমন মধ্যযুগের ইউরোপের অধিবাসীরা বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, একদিন একটা আশ্চর্য ফল। যেমন উজ্জ্বল রং তেমনি টকটক মিষ্টি স্বাদ। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিল ফলটির নাম অরেঞ্জ অর্থাৎ কমলালেবু।[৪] আরও জানল, আরব-বণিকরা ভারত থেকে আমদানী করেছে এই বিচিত্র রঙীণ ফল। ইতিহাসে আছে অষ্টম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত রোম ও গ্রীসের মানুষের কাছে কমলালেবু ছিল অজানা। এই কমলালেবুও ছিল খুব টক এবং তিতকুট। আর এই বন্য কমলালেবু থেকে মিষ্টি কমলায় রূপান্তরিত করেছিল চীন। চীন থেকে রপ্তানী হতো দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে। এই কমলালেবুকে বলতো "চায়না অরেঞ্জ"। আর এই মিষ্টি সুস্বাদু চাইনীজ কমলা ইউরোপে নিয়ে এসেছিল পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু ভার্থেমার মতে চীন নয়,

দক্ষিণ ভারতের উপকূলে হতো মিষ্টি কমলার চাষ। পর্তুগীজরা এখান থেকে আমদানী করতো এই সুস্বাদু ফল। শুধু কমলালেবু নয়, পেরিপ্লাসে আছে চীনা সিল্ক বাংলা দেশ থেকে আমদানী করতো আরব বণিকরা। এই সিল্কের সুদৃশ্য কাপড়ের ওপরে সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারীর কাজ করতো আরব ও সিরিয়ার সূচীশিল্পীরা। সেই এমব্রয়ডারী ও নক্‌শা করা সিল্ক চড়া দামে বিক্রি হতো রোমের বাজারে। ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যে আরবই ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে দূর প্রতীচ্যের সংযোগকারী দেশ। তাই শুধু পণ্যসামগ্রী নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধ্যান-ধারনাও আরবরাই অনেকক্ষেত্রে ভগীরথের মত বহন করে নিয়ে গিয়েছে ইউরোপের ভূখণ্ডে। যাক সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

এই প্রবাহের আলোচ্য বিষয় মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি আকবর (১৫৪২—১৬০৫)* থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত (১৬৫৯—১৭০৭) প্রায় একশো সতের বছরের বাংলার বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতির।

মহামতি আকবর। তাঁর উদারনীতি, তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়, তাঁর মানবিকতাবাদের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায় কিন্তু বিদেশী বণিকরা ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজরা তাঁর আমলেই স্থায়ীভাবে হুগলীতে (১৫৮০) কুঠি প্রতিষ্ঠা করেছিল। শুধু তাই নয়, আকবর তাদের বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। হঠাৎ হিন্দুস্তানের দণ্ডমুণ্ডের মালিক সাগরপারের এই কতিপয় ভাগ্যান্বেষী শ্রেষ্ঠীর প্রতি এত উদার হয়েছিলেন কেন? তারও কাহিনী আছে মানরিখের বিবরণে[৫] আছে ক্যাম্পোসের লেখা ইতিহাসে।[৬] সাগরপারের দূর দেশের এই শ্বেতকায় দীর্ঘ সবলদেহী মানুষগুলোর ওপর আকবরের আকর্ষণ ছিল। হয়তো distance enchants the eyes,—দূরের মানুষের প্রতি আমাদের আগ্রহ খুব সহজাত, এই

* আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৫-১৬০০)

স্বাভাবিক কারণ ছাড়াও তিনি দেখেছিলেন, দুঃসাহসী বণিকদের দল মালাক্কা থেকে, বোর্নিও থেকে বহুমূল্য আশ্চর্য সব পণ্য রপ্তানী করে। তাঁর খেয়াল হলো, তিনি বাংলার নবাবকে হুকুম দিলেন,—সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) থেকে যে কোন দু'জন নেতৃস্থানীয় পর্তুগীজ বণিককে আগ্রায় তার দরবারে পাঠানো হোক! নবাবের অবহেলার জন্য সপ্তগ্রামে খবর পাঠাতে দেরী হয়েছিল। বাংলার সুবেদারের অনুচর এসে দেখল সপ্তগ্রামের নদীর পাড়ে পর্তুগীজদের চালাঘর-গুলো খাঁ খাঁ করছে। তারা কেউ চলে গেছে মালাক্কায়, কেউ গিয়েছে চীনে।* পরের বছর সপ্তগ্রামের বন্দরে নামল পেড্রো ট্যাভারস্ (Pedro Tavers) যেমন ঝুনো পলিটিশিয়ান তেমান ডাকসাইটে ব্যবসায়ী। তিনি সম্রাটের বাসনার কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন আগ্রায়। আকবর তার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করলেন। বহুমূল্য অনেক উপঢৌকনের সঙ্গে দিলেন ফরমান। দিলেন ছাড়পত্র। তাতে রইল ঢালা হুকুম—হুগলীর যেখানে খুশি তারা স্থায়ীভাবে কুঠি তৈরি করতে পারবে। তারা পারবে দেশের যেখানে ইচ্ছা গীর্জা গড়ে তুলতে এবং দেশীয় লোকদের (অনুমতি নিয়ে) ধর্মান্তরিতও করতে পারবে! মোগল কর্মচারীদের নির্দেশও দিয়েছিলেন পর্তুগীজদের কুঠি, বাড়ী-ঘর, গীর্জা তৈরির কাজে সাহায্য করতে। এইবার শ্রেষ্ঠীর পরে পর্তুগীজ জাহাজ থেকে নামল পাদ্রী জুলিয়ান পিয়ারী (Juliano Pereira)। শোনা যায়, ফাদার জুলিয়ান নাকি আকবরকে খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিল।

১৫৮০ সনে যাদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠা, ঠিক তার ছিয়াশী বছর পরে (১৬৬৬) তাদের চরম পরাভব—চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বাংলার

---

* আকবরের ছাড়পত্র পাওয়ার আগে সপ্তগ্রামে এবং হুগলীতে তারা শুধু বর্ষার সময়টা অস্থায়ী চালা ঘর বেঁধে থাকতো। বর্ষা শেষ হলে বেচাকেনার পাট চুকিয়ে চলে যেত তাদের হোমে 'গোয়ায়'।

সুবেদার শায়েস্তা খাঁ তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তারা দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে একটু একটু করে জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে। 'আকবর-নামা'তেই আছে, আকবরের সুবেদার মীর্জা নজৎ খান উড়িষ্যার রাজার কাছে পরাজিত হয়ে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল হুগলীর পর্তুগীজ গভর্ণরের কাছে (১৫৮০) তারা ধীরে ধীরে যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল তেমনি তাদের পয়সার লোভও বেড়েই চলেছিল। মানরিখ দেখেছে বাংলার উর্বরা মাটির কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী। চাল খুব সস্তা। মাখন, ঘি, দুধ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, আম, জাম সুস্বাদু ফল অপর্যাপ্ত। এই সব পণ্য নামমাত্র মূল্যে পর্তুগীজ বণিকরা কিনে নিয়ে গিয়ে বোর্নিওতে, মালাক্কায় এবং সুদূর প্রাচ্যের দেশ-দেশান্তরে অসম্ভব চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতো। সমুদ্রযাত্রায় বিমুখ বাঙালী বণিক এই সময় থেকেই হয়ে গিয়েছিল পাইকারী বিক্রেতা। ফিরিঙ্গিরা যা দিত তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেত। আর এই সময় থেকেই তারা অসাধু মোগল কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারে জর্জরিত হতে, শুরু করেছিল। ওদিকে পর্তুগীজ বণিকদের টাকার অঙ্ক ফুলে উঠছিল, ফেঁপে উঠছিল। তদানীন্তনকালের একপ্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে[৭] পাওয়া যায় ধনাঢ্য পর্তুগীজ বণিকরা যে তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাংলার হাটে বাজারে বন্দরে ঘুরতো সেই ঘোড়ার লাগাম ছিল এই দেশেরই সিল্ক দিয়ে তৈরী। সেই সিল্কের বল্গার মাঝে মাঝে আবার খাঁটি সোনার চুমকি বসানো। আর চাবুক ছিল লাল, নীল, সবুজ রঙের মিনে করা রূপোর পাতের। পরনে বহুমূল্য পোশাক। তাই সহজেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দৃশ্য—দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। দীর্ঘ সবল দেহে বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিদেশী বণিকরা ঘুরছে এদেশের কৃশকরুণ আর ঘোরকৃষ্ণবর্ণ ব্যবসায়ীদের ভীড়ের ভেতরে।

ষোড়শ শতাব্দীর ছয় দশকের গোড়ার দিকে এসেছিল ভেনিসের ব্যবসায়ী সিজার ফ্রেডারিক[৮]। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় এই পর্তুগীজ বণিকদের বিপুল ধনসমৃদ্ধির কারণ, পাওয়া যায় বাংলার আন্তর্জাতিক বন্দর সপ্তগ্রামের তথা দেশীয় বাণিজ্যের এক মনোজ্ঞ আর জীবন্ত আলেখ্য। তাঁর জবানীতেই বলি, 'আমি উড়িষ্যা থেকে বাংলার অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। গঙ্গার পাড়েই সমৃদ্ধশালী বন্দর সপ্তগ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্র এই সমুদ্রবন্দর বন্দর। পণ্যবাহী বহু বিদেশী জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে। এই বন্দর উড়িষ্যা থেকে একশো সত্তর মাইল। উপকূল ঘেষে প্রায় চুয়ান্ন মাইল গেলে তবে পাওয়া যায় গঙ্গানদীর মোহনা। এই মোহনা থেকে পুরো একশো মাইল গেলে তবে পাওয়া যায় বাংলার 'পিকানো' (ক্ষুদ্রবন্দর) সপ্তগ্রাম। এই পথটুকু জোয়ারের সময় আঠারো ঘণ্টায় যাওয়া যায়। কিন্তু ভাটার নদীতে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অসাধ্য; তাই জোয়ার আসা পর্যন্ত তীরে নৌকো বেঁধে অপেক্ষা করতে হয়। এই নৌকোর নাম বজরা। সাতগাঁর আগে গঙ্গার পাড়ে আর একটি গ্রাম আছে, তার নাম বাতোর। বাতোরের উজানে বড় নৌকো নিয়ে আর যাওয়া যায় না। কারণ, নদীর জল খুব কম। তাই প্রত্যেক বছর যতদিন দেশী-বিদেশী ব্যাপারীদের জাহাজ থাকে ততদিন এখানে অনেক চালাঘর তৈরী হয়ে যায়। বসে যায় রীতিমত একটা বাজার। আবার যেই জাহাজ চলে যায় অমনি চালাঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়ে ব্যবসায়ীরা যে যার ঘরে ফিরে যায়। এই বিবরণটুকুর ভেতরে ফুটে ওঠে ধ্বংসোন্মুখ সপ্তগ্রাম বন্দরের চিত্র।

এই সময়ই সরস্বতী নদী মজে আসছিল, একটু একটু করে ভরাট হয়ে আসছিল তার গর্ভ। তাই সিজার দেখেছিল, ছোট জাহাজ সাতগাঁয় এসে পণ্য বোঝাই করছে। তবুও অনেক বিদেশী ছোট ছোট জাহাজ আর বণিকদের আনাগোনা ছিল এই মৃতপ্রায়

বন্দরে। প্রায় প্রত্যেক বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি জাহাজে চাল, নানা-ধরনের কাপড়, লাক্ষা, তেল, চিনি আর প্রয়োজনীয় পণ্য রপ্তানী হতো দূর দেশে। এই সপ্তগ্রাম বন্দর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন[৯] মোগল সাম্রাজ্যের প্রারম্ভেই সপ্তগ্রামের অবনতি শুরু হয়। তার কারণও দেখিয়েছেন: (১) সরস্বতী নদী ধীরে ধীরে মজে আসছিল। (২) সপ্তগ্রাম থেকে টাকশাল উঠে গিয়েছিল। এখানকার 'মিণ্ট' থেকে সর্বশেষ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে শেরশা এবং তাঁর পুত্র ইসলামশাহের রাজত্বের সময়ে। (৩) পর্তুগীজ বণিকদের আবির্ভাব। জবরদস্ত পাঠান রাজাদের শাসনকালে এই বিদেশী ব্যবসায়ীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু মোগলদের সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে এরা ব্যবসার নামে বন্দরে বন্দরে নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতে লাগল। সমুদ্র-বাণিজ্য থেকে দেশীয় বণিকরা একেবারে নির্বাসিত হয়ে গেল।

সিজারের পরে রাল্‌ফ্‌ ফিচ[১০] নামে এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর বিবরণেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের শান্ত গঙ্গা বয়ে বণিকদের একশো আশিটি পণ্যতরীর বহর আসছিল বাঙ্গলায়। তার একটির আরোহী হয়ে তিনি আগ্রা থেকে এসেছিলেন সপ্তগ্রামে। প্রতিটি বজরায় ছিল লবণ, আফিং, হিং, সীসা, কার্পেট। বাংলাদেশে তিনি প্রথমে টাণ্ডায় পৌছান। টাণ্ডা ছিল তুলোর ব্যবসার মস্ত এক গঞ্জ। ফিচ হুগলী বন্দরের কথাও বলেছেন। যে সপ্তগ্রাম বন্দর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—Satgaon is a fair city for a city of the Moors and very plentiful of all things এবং সেখানে পারসিক, আরবীয় অবিসিনিয়ার ব্যবসায়ীরা ভীড় করে আসতো শুধু বাংলার কার্পাস-জাত কাপড় কিনতে। এই সপ্তগ্রামের ওপরেই নেমে এসেছিল অন্ধকারের যবনিকা। পরবর্তীকালের বিদেশী ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ীদের বিবরণে আর পাওয়া যায় না সপ্তগ্রামের নাম।

সপ্তগ্রামের বিপুল গৌরবের ইতিবৃত্ত লেখা আছে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে', আছে 'চৈতন্যচরিতামৃতে', আছে মনসার গীতে এবং সমসাময়িককালের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্কণের একটি শ্লোকের ভেতরেই আভাস পাওয়া যায় যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের ভয়েই হোক কিম্বা যে কোন কারণেই হোক আর সমুদ্রযাত্রা করতো না।

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথা নাহি যায়
ঘরে বসে সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।

সুলতানী যুগে বাঙালী বণিকরা সমুদ্রবাণিজ্য করে যে বিপুল অর্থসঞ্চয় করেছিল আর সেইসব লক্ষপতি বণিকদের বাসভূমি ছিল ষোড়শ শতাব্দী এবং তারও পূর্ববর্তীকালের বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রামে। তা চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়—

হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥

আজ থেকে চারশো বছর আগে বারো লক্ষ টাকার মূল্য কত তা কিছু সহজেই অনুমান করা যায়। বলাবাহুল্য সাহিত্যে, কাব্যে কিছু অতিশয়োক্তি থাকে। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার বিপুল ঐশ্বর্যের ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে 'তা-রি-খি ফিরিশ্‌তা' এবং রিয়াজউস-সালাতিনে' জানা যায় গৌড়ে এবং পূর্ববঙ্গে বিত্তশালী গৃহস্থরা সোনার থালায় ভাত খেত। আলাউদ্দীন হোসেনশাহ গৌড় দখল করার পর এক হাজারেরও বেশি শুধু সোনার থালাই পেয়েছিল। বাংলার এই বিস্ময়কর প্রাচুর্যের মূলে ছিল স্মরণাতীতকাল থেকে বাঙালী বণিকের সার্থক বহির্বাণিজ্য—সেকথা আগে বলা হয়েছে। বাঙালীর সমুদ্রবাণিজ্যের অভূতপূর্ব তৎপরতার আভাস আছে মঙ্গল-কাব্যে। প্রায় পঞ্চাশজন কবির রচনায় পুষ্ট বাংলা-সাহিত্যের এই বহুলপ্রচারিত ও জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যের ভেতরে প্রাচীনতম মনসা-মঙ্গলটি লিখেছেন নারায়ণ দেব। সময়টা অনুমান করা হয় ত্রয়োদশ

শতাব্দী। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের সমুদ্রগামী পণ্যতরী এবং সমুদ্রযাত্রার বিশদ বিবরণ কারও অজানা নয়। বলা-বাহুল্য, কাল্পনিক কাহিনীর নায়কের জীবনধারার ভেতরে সমসাময়িক সমাজজীবনের ছাপ পড়ে। তাই সেকালের সুদক্ষ বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রতীক চাঁদ সওদাগরের ইতিবৃত্তের ভেতরে একটা সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—বাঙালীর ছিল 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ দিয়েই পরবর্তীকালে বাঙালী সোনার থালায় ভাত খেতে পেরেছিল। আর চাঁদ সওদাগর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তা নিয়েও গবেষণা হয়েছে[১১] সপ্তগ্রামের কাছে একটি অঞ্চলের নাম চন্দ্রহাটি। চন্দ্রহাটি নামটি সেকালের বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের নামের স্মৃতি বহন করছে।

কিম্বদন্তী বলে, চাঁদ সওদাগর এখানে একটি হাট বসিয়েছিলেন। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' আছে, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী 'ত্রিবিণীগঙ্গা' বেয়ে দূর সমুদ্রে যেত। সপ্তগ্রাম থেকে ত্রিবেণী দূরে নয়; আর গঙ্গার গতিপথও ছিল কাছে। তাই বিপ্রদাস বলেছেন 'ত্রিবিণীগঙ্গা'।

ব্যবসায়ী চাঁদের নামের সঙ্গে সওদাগব শব্দটি যুক্ত হলো কেন? 'সওদাগর' শব্দটি এসেছে ফারসী ভাষা থেকে। ইবনবতুতা, বারবোজা, ভার্থেমা থেকে রাল্‌ফ ফীচ পর্যন্ত বিদেশীদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সপ্তগ্রামে, সোনারগাঁয়ে (ঢাকা), চট্টগ্রামে, হুগলীতে আরব ও পারসিক বণিকদের অস্তিত্ব। হয়তো চাঁদের মত বিপুল বিত্তশালী বাঙালী ব্যবসায়ীকে তারাই 'সওদাগর' উপাধি দিয়ে সম্মান দেখিয়েছিল।

সিজার ফ্রেডারিকের বিবরণে ক্ষয়িষ্ণু সপ্তগ্রামের নাম জানতে পারলেও দেখতে পাচ্ছি 'আইন-ই-অকবরী'র পাতায় ছোট একটা হিসাব আছে। এই সপ্তগ্রামের সুবেদার বণিকদের কাছে বাণিজ্যের

শুল্ক বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করতেন। এই ত্রিশ হাজার টাকার অধিকাংশ সুবেদারকে দিতেন বাঙালী বণিকরা।*
আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবর-নামা' খুব প্রামাণিক গ্রন্থ। কেননা আকবর নাকি প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তাদের হুকুমজারী করেছিলেন—স্ব-স্ব প্রদেশের 'পূর্ব ইতিহাস, স্থানবর্ণনা, আয়-ব্যয়, বাণিজ্যশিল্পের বৃত্তান্ত ইত্যাদি আবুল ফজলকে পাঠাতে হবে'—তাই আইনী-ই-আকবরীকে আকবরের শাসনকালের[১১] প্রামাণিক দলিল হিসেবে ধরা যায়। বিশাল এই গ্রন্থে বাংলার যেটুকু খবর ছিটেফোটা পাওয়া যায় তা এখানে বলছি।

ঢাকার কাছে সোনারগাঁও বন্দরে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মসলিন আমদানী হতো। এই শহরের উপকণ্ঠে ছিল 'এগারা সিন্দুর' অর্থাৎ বস্ত্র ধৌতগার। এখান থেকে কাচা-কাপড়ের রং হতো সাদা ঝকঝকে। সমুদ্রের ধারে চট্টগ্রাম (চাটগাঁও) যে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী পর্তুগীজ বণিক অধ্যুষিত বৃহৎ বন্দর ছিল সেকথাও আছে 'আইন-ই-আকবরী'তে। আছে উত্তরবঙ্গের বৃহৎ 'ঘোড়াঘাটের' উল্লেখ। এখানে রেশম ও রেশমজাত পণ্যের বিরাট হাট ছিল। সপ্তগ্রাম বন্দরের কাছে হুগলীতে যে পর্তুগীজরা ঘাঁটি করেছে সেখবরও আছে গেজেটিয়ারে। গঙ্গার ধারে এই দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ যে পুরোপুরি ইউরোপীয় বণিকদের দখলে ছিল এবং এখানকার উর্বর মাটিতে যে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ডালিমের ফলন হতো এই তথ্যটিও অজানা ছিল না আবুল ফজলের।

১৬২১ সালেও এই সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, লিন সোটেন এই সময় এক ওলন্দাজ বণিক এখানে পর্তুগীজদের দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন—সপ্তগ্রামের বাসন্তী রঙের রেশমের ওয়াড় দেওয়া

* ১৪, ৯৬১, ৪৮২ টাকা মোট রাজস্ব হিসেবে দিল্লীকে দিত বাংলা।
—আইনী আকবরী : P. 141.

লেপের খুব আদর ছিল ইউরোপে। এই রঙীন সিল্কের প্রসঙ্গেই অনুমান হয়, বেঙ্গলিয়ান হার্ব (Bengalian Herb) অর্থাৎ তৃণ থেকে উৎপাদিত রেশমের উল্লেখ করেছেন ডক্টর পন্থ[১৩]। তাঁর Commercial Policy of Mughal গ্রন্থে বলেছেন, 'Herb' তৃণ থেকে উৎপাদিত রেশমের প্রচুর খ্যাতি ছিল বিদেশে। আজকে বস্ত্রের রাজ্যে যেমন লিনেন অস্বাভাবিক জনপ্রিয়, তেমনি একদিন এই Herb-ও ঘরে ঘরে খুব আদর পেতো। এদের বলা হতো 'Bengalian Herb'। রঙ ছিল হালকা হলুদ। মেলে ধরলে মনে হতো শীতের সকালের রোদ বুঝি ঝলমল করছে প্রান্তরে। এদের বয়নে অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের প্রয়োজন হতো। তাঁতীরা নিপুণ অঙ্গুলি-বিন্যাসে আর বিচিত্র ছন্দে ও যতিতে বয়ন করতো এই অপূর্ব বস্ত্র।

সেই সুপ্রাচীনকালের বাংলায় ধনীদের ঘরে ঘরে মর্যাদা বৃদ্ধি করতো এই তৃণ উৎপাদিত সিল্কের বালিসের ওয়াড়, কার্পেট আরও রকমারি বিলাসিতার জিনিস।

এই বিশেষ ধরনের সিল্ক তৈরি করতো থানে থানে; সাধারণ সিল্কের মত শুধু কাপড় বা শাড়ি করলে মজুরী পোষাত না। বাংলায় এই কাপড়ের একটা অদ্ভুত জনপ্রিয় নাম ছিল, বলতো সারিজিন। ডক্টর পন্থ লিখেছেন: This Sarrigin was much used in Bengal, yellow in colour and brighter than Silk exported them to all parts of the World. তৃণ উৎপাদিত রেশম সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন:[১৪] 'এদেশে ঘাস থেকেও রেশম তৈরী হতো, এক প্রকার রেশম আছে, জঙ্গলে কমলালেবুর মত বড় বড় ইহার গুটি। অনুমান করা যায়, এই রঙীন অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে রপ্তানী হতো। টমাস রো'র বিবরণেও আছে গয়না তৈরির জন্যে অ্যাম্বার (Amber) অর্থাৎ হলুদবর্ণের এক ধরনের

সুগন্ধী মোমের মত আঠা, মৃগনাভি ইত্যাদিও সপ্তগ্রাম বন্দর থেকেই বিদেশীরা প্রচুর পরিমাণে কিনতো। তাই নানা কারণেই সপ্তগ্রামের আকর্ষণ ছিল। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষ বলছে—ইউরোপীয় আগমনের বহুপূর্বে বিদেশী ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রামের বিপুল সম্পদ ও বাণিজ বৈভবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

সরস্বতী নদী ভরাট হয়ে এল। সপ্তগ্রামের গৌরবসূর্য অস্তমিত হল। জেগে উঠল হুগলী বন্দর। আর বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রমবিকাশ শুরু হলো।

এই আন্তর্জাতিক শক্তি কেমন করে বিশাল অজগরের মত বাংলা-দেশ থেকে শুরু করে সারা ভারতকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল—ভারত-ইতিহাসের সেই সুপরিচিত ঘটনাটি কি করে ঘটল তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে গ্রেট মোগলদের আমলের বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের ইতিহাসের ভেতরে। আদর্শবাদী আকবর তার সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে যে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাংলার বন্দরে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের অসম্ভব খ্রীস্টানপ্রীতি* তাদের ধীরে ধীরে পুষ্ট করে তুলেছিল, করে তুলেছিল উদ্ধত। তারই সহানুভূতিতে ওলন্দাজরাও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। তারা হয়তো ভেবেছিলেন, সাগরপারের বণিকদের সুযোগসুবিধা দিলে বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য দূরদূরান্তরে প্রসারিত হবে, বিদেশী মুদ্রা আসবে, আর বিদেশী বণিকদের পরস্পরের ভেতরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে তারা বেশ নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। কিন্তু তারা ভাবতে পারেনি, বিদেশীরা ব্যবসায় উন্নতি করলেই দেশের আভ্যন্তরীণ কোলাহলমুখর রাজনীতিতে মোড়লের ভূমিকা নেবে,—ভাবতে পারেনি ধ্বংস হয়ে যাবে স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা—আর সারা দেশকে ধাপে ধাপে অবশ্যম্ভাবী দাসত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

---

* Oxpord History of India : Vincent Smith. 1964. P 365

কিন্তু দিল্লীশ্বররা যা ভাবতে পারেন নি, তাই হয়েছিল। বাদশাহী স্বপ্নকে নির্মূল করে দিয়ে সেই শোকাবহ ব্যাপার কি করে ঘটেছিল তা পর্যালোচনা করা যাক।

১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই গঙ্গার ঢেউ পাড়ি দিয়ে এল, আর এক বিদেশী বণিকের দল—ওলনন্দাজ। ঠিক তার দশ বছর পর হুগলীতে তারা গড়ল কুঠি (১৬২৫) ও ক্রমে চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনা হয়ে উঠল ওলন্দাজদের লাভজনক বাণিজ্যকেন্দ্র। জাহাঙ্গীরের নির্দেশেই তৎকালীন বাংলার নবাব তাদের অনেক সুযোগসুবিধা দিয়েছিল। তাদের প্রধান রপ্তানীর সামগ্রী ছিল রেশম, সোরা, চাল আর আফিং। সমসাময়িককালের পিয়ার্দ দ্য লাভালের ভ্রমণবৃত্তান্তে[১৫] বাংলার কৃষিজাত এবং কার্পাসজাত পণ্যের বিপুল প্রাচুর্যের ভেতরে আভাস পাওয়া যায় কেন চাল ও রেশম ডাচদের প্রধান রপ্তানী সমাগ্রী হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছেন, এখানে চাল এত সুলভ এবং এত প্রচুর যে বিনাব্যয়ে একজন জীবন-ধারণ করতে পারে। রেশম কার্পাসের প্রাচুর্যের কথাও বলেছেন। তাই ওলন্দাজদের সুমাত্রায়, জাভায় দূর প্রাচ্যে রপ্তানীর প্রধান সামগ্রী ছিল চাল ও রেশম। ফ্রাঙ্কয়েজ বার্নিযার[১৬] (১৬৬৬) মতে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক কাশিমবাজারকারখানাতেই ওলন্দাজরা ৭০০ থেকে ৮০০ রেশমের তাঁতী (silk weavers) নিযুক্ত করেছিল। কাশিমবাজারের ওলান্দাজদের রেশমকুঠিতে মোট উৎপন্ন রেশমের (finished product) পরিমাণ ছিল সাড়ে বিশলক্ষ পাউণ্ড। তার ভেতরে দশলক্ষ পাউণ্ড রেশম থেকে বাংলার রেশমশিল্পীরা ওলন্দাজদের বেতনভূক কর্মচারী হয়ে কিম্বা অগ্রিম দেয় (দাদনের) ঋণে আবদ্ধ হয়ে তৈরী করতো নানা জাতের বস্ত্রসম্ভার। বাদবাকী সাড়ে দশলক্ষ পাউণ্ড কাঁচা (Raw) রেশমের তিন চতুর্থাংশ তারা ইউরোপে রপ্তানী করতো। অবশিষ্ট অংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে

পাঠাতো। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ওলন্দাজদের রেশমের এই জমজমাট কারবারে বাঙালী ব্যবসায়ীর ভূমিকা বড় করুণ! বলাবাহুল্য বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ওলন্দাজেরা দালালদের মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে রেশমের সুতো কিনতো, আর নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে কিম্বা না দিয়ে পেত নিপুণ কারিগরদের হাতের তৈরী উৎকৃষ্ট বস্ত্র। এইভাবেই বাঙলার স্মরণাতীকালের রেশমের ব্যবসার সমাধি রচনার পর্ব শুরু হয়েছিল সেই সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই।

জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই ইংরেজদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল ভারতে। ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে হয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা।[১৭] ঠিক তার আট বছর পরে এই কোম্পানীর প্রতিনিধি উইলিয়ম হকিন্স আগ্রায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এদেশের মাটিতে ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের প্রবল প্রতিদ্বান্দ্বতা এবং সদ্যজাত কোম্পানীর দুর্বলতার জন্যেই হকিন্সের প্রচেষ্টা হলো ব্যর্থ। কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পিছনে তখন পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছিল না। হাণ্টারের মতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এই কোম্পানীটি ছিল বৃদ্ধ বয়সের সন্তানের মত দুর্বল। অপরপক্ষে, হল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতির পূর্ণ সমর্থন ছিল তাদের বহির্বাণিজ্যে। তবুও ইংরেজরা হাল ছাড়েনি। প্রাকৃতিক সম্পদে (রেশম, কার্পাস) সমৃদ্ধ এই বাংলার মাটিতে ব্যবসার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যত তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস প্রেরিত রাজদূত স্যার টমাস রো[১৮] ইংরেজদের বাংলায় বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে লিখেছিলেন—বাংলাদেশে তাদের পণ্যের বাজার খুব ভাল হতে পারে। কিন্তু বাংলায় ব্যবসা করার অনুমতি মিলল না। ভিনিসেন্টের মতে, যদিও ছাড়পত্র পান নি তবুও স্বদেশবাসীদের

জন্য অনেক সুযোগসুবিধা আদায় করেছিলেন। যার ফলে বাংলা থেকে শুধু রেশম আমদানী করা যায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যই হিউজেস আর পার্কার নামে কোম্পানীর দুই কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছিল। তারা কোম্পানীকে জানিয়েছিল, বাংলা থেকে সরাসরি কাঁচা রেশম (Raw silk) ক্রয় করাই শ্রেয়। বাঙলাদেশে কুঠি স্থাপন না করে ১৬২১-১৬৩৮ দীর্ঘ সতের বছর ধরে ইংরেজদের বাংলায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার বহু ব্যর্থ প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেছিল ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বাউটনের মাধ্যমে। শাহজাহানকে সুস্থ করে তোলার পুরস্কার হিসেবে বাংলায় বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি মিলেছিল। এইবার ইংরেজ কোম্পানী কুঠি স্থাপন করল চুঁচুড়ায় (১৬৫০)। তার চল্লিশ বছর পরে কলকাতায় (১৬৯০) আর চন্দননগরে (১৬৯০)। তারা বেশ জমজমাট ব্যবসা শুরু করতে আরম্ভ করল এই বাংলায়। কিন্তু কেন, এবং কি কি কারণে ইংরেজদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তার কারণগুলো আলোচনা করা যাক :

(ক) ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ক্রমওয়েলের[১৯] ঐতিহাসিক চার্টারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমর্থনের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই চার্টারের ফলে দূরপ্রাচ্যে ইংরেজদের ব্যবসার নবযুগের সূচনা হলো। ১৬৮০ সালে শুধু বাংলাতেই কোম্পানীর বাৎসরিক দাদনের পরিমাণ (Annual investment) দাঁড়িয়েছিল ১,৫০,০০০ পাউণ্ড।

(খ) ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক পর্তুগীজ বিতাড়ণ ও চট্টগ্রাম বিজয় ইংরেজকে বাংলার উপকূলে নিরুপদ্রবে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছিল।

(গ) বাংলার উর্বরা মাটিতে ছিল কৃষিজাত পণ্য এবং রেশম ও কার্পাসজাত পণ্যের সর্বনাশা প্রাচুর্য। শাহজাহানের (১৬০৮) সমসাময়িক ভূপর্যটক বার্নিয়ার যেমন দেখেছিলেন তদানীন্তনকালের বাংলা

মিশরের চেয়ে অনেক বেশি উর্বরা (ফলন্ত) দেশ। খুব সস্তা চাল, মাছ, ঘি, দুধ আর কাপড়ের দেশ তেমনি তার ষোল বছর আগে মানরিখও মুর্শিদাবাদে টাকায় চার পাঁচ মন চাল বিক্রি হতে দেখেছিল ; তারও অনেক আগে আকবরের সমসাময়িককালের রেকর্ডেও[২০] দেখা যাচ্ছে, একথান সুতী কাপড়ের দাম আট আনা থেকে দুই টাকা, একটা কম্বল আট আনা, উৎকৃষ্ট মলমল চার টাকা, ঢাকাই মসলিন তিন টাকা থেকে ১৫ মোহর। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ প্রায় দেড়শো বছর জুড়ে বাংলার বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এত কম হওয়ার কারণ হলো, স্থানীয় সুবেদাররা বিপুল অঙ্কের টাকা দিল্লীতে রাজস্ব হিসাবে পাঠাতো—যেমন শাহজানের সময় প্রতি বছর বাংলার সুবেদার শাহসুজা শুধু রাজস্ব হিসেবেই এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা পাঠাতো। তার সঙ্গে টাঁকশালের আয়ের (৩,২১,২২২) টাকাও যোগ হয়েছিল। তাছাড়া ছিল, সুবেদারদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা, তাদের দুর্বার লোভের পরিচয় পাওয়া যায়—বাইশ বছরে শায়েস্তা খাঁর আটত্রিশ কোটি এবং নয় বছরে আজিমুদ্দীনের নয় কোটি টাকা সঞ্চয়ের চমকপ্রদ ইতিহাসে[২১]। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়মিত দিল্লী চলে যেত, কিংবা সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে (out of circulation) চলে যেত। ফলে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা টাকা জমাতে পারতো না আর তাদের ক্রয় ক্ষমতাও যেত কমে। কিন্তু সেই যুগে বিদেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ রজত আমদানী হতো তার প্রভাবে যোগান ও চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা অথচ তা হল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্মম শোষণে চলতি মুদ্রার (Volume of currency in circulation) পরিমাণ হ্রাসের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ এই সঙ্কটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল ইংরেজ। অর্থসঙ্কটে জর্জরিত বাঙালী ব্যবসায়ীর নেই ক্রয়ক্ষমতা, কিন্তু ইংরেজ যে কোন মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে

রপ্তানীর জন্যে বিপুল অর্থ নিয়ে* সর্বদা প্রস্তুত। বলাবাহুল্য, চড়া দাম দিতে হতো না। অত্যন্ত সুলভেই পেত রেশম, তুলো ইত্যাদি বস্ত্রশিল্পের উপাদান। পরবর্তীকালে দেখা যাবে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রীতিই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এদেশ থেকে যথাসাধ্য কাঁচামাল রপ্তানীর। বাংলা থেকে মলমল, রেশম ও তুলো অত্যন্ত সস্তায় কিনে বিলেতী রঙে রঙিয়ে নিজেদের বেতনভুক রেশমের শিল্পীকে (কাশিমবাজারের কুঠিতে ট্যাভার্নিয়ার দেখেছেন চারশো শ্রমিককে) দিয়ে তৈরী করিয়ে চড়া দরে বিদেশে রপ্তানী করে মোটা লাভের অঙ্ক ঘরে তুলতো।

ইংরেজদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির এই শেষোক্ত কারণের ভেতরেই নিহিত আছে বাঙালীর বাণিজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয়ের ইতিহাস ; আছে বাঙালীর বহুযুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত বয়নশিল্পের সমাধি রচনার ইতিবৃত্ত। যাক—সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাবে বিশদভাবে। এখন দেখা যাক, বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতি আর কি কি কারণে হয়েছিল—(১) বাংলার ব্যবসার ইতিহাস রচনা করতে বসে মনে হচ্ছে, বাংলা যেমন প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী যেমন বিধাতার আশীর্বাদপুষ্ট তেমনি অভিশপ্ত। যেমন আদরের তেমনি অবহেলার ; যেমন প্রাচুর্যের দেশ তেমনি দারিদ্র্যের দেশ এই বাংলা। মুসলমান যুগের প্রায় সূচনা থেকেই বাংলা কেন্দ্র-শাসিত এবং তার শাসক অবাঙালী। যাদের সুবেদারী দিয়ে পাঠানো হতো তারাও সেই শ্রেণীর।

বাংলা দেশের কল্যাণের প্রতি তারা স্বভাবতই উদাসীন। কি জানি, কখন দিল্লী থেকে ফরমান আসবে বাংলার মসনদ ছেড়ে যেতে হবে। অতএব যত দ্রুত পারা যায় দু'পয়সা করে নেওয়ার ধান্দাটা তাদের অঙ্কুশের মত খোঁচাতো। উপরন্তু বাদশাহী বিলাসের

* ১৬৮০-১৬৮৪ এই চার বৎসরে শুধু ইংরেজরাই ষোল লক্ষ টাকার জিনিস কিনেছিল (বাংলার ইতিহাস : মধ্যযুগ—রমেশ মজুমদার)

ক্রমবর্ধমান চাহিদা তাদের উত্যক্ত করে রাখতো। সেই রাক্ষুসে চাহিদা পূরণ করতে হতো দেশের ব্যবসায়ী তথা জনসাধারণকে শোষণ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজস্ব বা নজরানা পাঠিয়ে। আওরঙ্গজেবের সময়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শোষণের নমুনাটা দেখা যাক—

১৬৫৯-৬৩ চার বৎসরে মীরজুমলার নবাবী আমলে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক রাজকীয় নৌবহর নির্মাণ করিয়েছিলেন চোদ্দ লক্ষ টাকা দিয়ে।[২২] আরাকান রাজার তথা মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সম্ভবত এই নৌবহরের প্রয়োজন হয়েছিল। অনুমান করা যায়, এই টাকাটা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই আদায় করেছিলেন। কেননা নজীর আছে, আসাম ও কুচবিহার অভিযানের সময়ে ঢাকার শস্যব্যবসায়ীদের কাছে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করেছিলেন। ঢাকায় তৈরী এক বিশেষ ধরনের মসলিন বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই রাজস্বস্বরূপ পাঠানো হতো বলেই তার নামকরণ হয়েছিল সরকার-আলা, সে কথা আগে বলেছি। দেশের প্রতিরোধের নামে জুলুমবাজী, রাজস্বের নামে শোষণ ছাড়া নবাবদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ইতিহাস তো বহুল প্রচারিত। শাসনযন্ত্রের যন্ত্রী যদি ব্যবসায়ীর ভূমিকা নেয় তাহলে তার যা অনিবার্য পরিণতি তাই হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। মীরজুমলার শাসনকালের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার মনোপলি অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীবৃত্তি। বেশীর ভাগ আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখতেন অর্থাৎ সরকারী গোলায় মজুত রেখে পরে সুবিধামত অধিক মূল্যে বিক্রি করতেন। তার প্রমাণ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজদের গোলাবারুদের উপকরণ সোরা বা সল্ট পিটারের সমস্ত চাহিদার জোগান দিতে পারবেন বলে জানিয়েছিলেন। তার পরবর্তী বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ[২৩] (১৬৬৪—৬৫ খ্রীঃ) এবং (১৬৭৯—১৬৮৮) মীরজুমলাকেই অনুসরণ করেছিলেন। আসামের ইতিহাসে আছে,

শায়েস্তা খাঁ লবণ, পান আরও অন্যান্য দৈনন্দিন পণ্যসামগ্রী নিয়মিত আমদানী করতেন আসাম থেকে। বাংলা দেশে এই পণ্য চড়া দরে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতেন। তার আমলে ব্যক্তিগত ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী পর্যটক ট্যাভার্নিয়ার তাই হয়তো তার ভ্রমণবৃত্তান্তে শায়েস্তা খাঁ সম্বন্ধে বলেছে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা এবং Most cleverest man in all his kingdom. দিল্লীতে নিয়মিত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এবং সোনাদানা মণিমুক্তোর নজরানা পাঠাতে হতো বলেই তাকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জুলুম করে অর্থ আদায় করতে হতো কি কি উপায়ে টাকা আদায় হতো তারও নজীর আছে (ক) রাহাদারি অর্থাৎ পণ্যসামগ্রী চলাচলের জন্য অভ্যন্তরীণ শুল্ক—যে কোন চেকপোস্টে, ফেরীঘাটে ট্যাক্সের নামে জুলুম করে টাকা নিত তার নির্দেশে তার কর্মচারীরা (খ) অ্যাডভেলরাম ডিউটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট ট্যাক্সের উপরে যে কোন পরিমাণ শুল্ক দাবী করা হতো (গ) পেশখাস—নবাবকে নজরানা দিতে হবে বলে যে টাকা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করতো (ঘ) ফরমায়েজ-এটাও পেশখাসেরই নামান্তর। হয়তো পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে গরুর গাড়ির লহর চলেছে দূর দেশে। রাস্তার মাঝখানে নবাবের কর্মচারীরা তাদের আটক করে নামমাত্র মূল্যে সেই পণ্য কিনে নিয়ে খুব বেশি দরে বিক্রি করতো। এইসব কারণেই শায়েস্তা খাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আওরঙ্গজেবকে ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদ এবং চার লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কারের ভেট পাঠানো। এই জন্যেই হয়তো, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ষ্ট্রীন্সহ্যাম বিলেতে লিখেছিল, নবাবের অর্থলোভের মাত্রা দিনের পর দিন ছাড়িয়ে চলেছে। টাকায় আট মণ চালের জন্য যেমন ইতিহাসে শায়েস্তার খ্যাতি আছে, তেমনি নজরানা, পেশখাস, ফরমায়েজী ইত্যাদি আমলাতান্ত্রিক শোষণে বাংলার বাণিজ্যের চরম ক্ষতিরও নজীর আছে। পরবর্তী নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (১৬৯৭—

১৭২৭) শুল্ক আদায়ের নামে অরাজকতা আর মাৎসন্যায়ের কিছু উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু তিনি আর রাশ টেনে ধরতে পারেন নি।

এইভাবেই আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে পতোন্মুখ বাদশাহী শাসনের সাথে সাথে বাংলার বাণিজ্যের যত অবনতি হতে লাগল তত বেশী উন্নতি শুরু করল ইংরেজদের। দেশীয় রাজন্যবর্গের জোরজবরদস্তি, জুলুম সহ্য করেও ইংরেজরা বাংলাদেশের ব্যবসায় কি পরিমাণে লাভ করছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই হিসাবটুকুর ভেতরে[২৪]—১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে ৩৪০০০ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যসামগ্রী রপ্তানী করেছিল তারা। সাত বছর পরে ১৬৭৫ সেটা গিয়ে দাঁড়ালো ৮৫,০০০ পাউণ্ডে। শুধু তাই নয় ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রেশম বাংলাদেশেই বিক্রী করতে হবে, উৎপাদনের উন্নতি করতে হবে বলে বিলেত থেকে নিয়ে এল বিশেষজ্ঞ; আমদানী করল বিশেষ ধরনের উন্নত রঙ। হুগলীর গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার জন্য চালু করল পাইলট সার্ভিস। ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ গঙ্গার বুকে দুলে দুলে চলতে লাগল দূর সাগরের অভিমুখে আর গঙ্গার সেই অবিরাম স্রোতের সাথে সাথে প্রসারিত হয়ে গেল ইতিহাস।

হুগলী ও চন্দননগরের পরেই তাদের কল্যাণে জন্ম হলো কলকাতার। সেই যে মোগল যুগের প্রারম্ভে ক্ষয়িষ্ণু সপ্তগ্রামের বন্দরে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না বলে শোনা গিয়েছিল বেতোড়ের (হাওড়া) নাম। তারই অপর পারে জলজঙ্গলে আচ্ছন্ন গোবিন্দপুর গ্রামে সেই সময় থেকেই "সপ্তগ্রামবাসী শেঠ ও বসাকগণ আসিয়া জঙ্গল কাটাইয়া মনুষ্য বসতি স্থাপন করেন,—সেই গোবিন্দপুরেই ইংরেজ গড়ল তাদের দুর্গ (১৬৯০)—ফোর্ট উইলিয়ম আর বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যে তথা ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ের যবনিকা উঠল।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

> বাংলাদেশের ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে কুঠিস্থাপনে ইংরেজের ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু দূরদৃষ্টি নয়, কুঠিয়ালদের নিবিড় স্বদেশপ্রেম ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় ঘেরা জীবন এদেশের মাটিতে তাদের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করেছিল। —উইলসন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে মাঝামাঝি অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এই পঞ্চাশ বছরের বাংলার বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিই এই প্রবাহের আলোচ্য বিষয়। দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় বণিকদের লীলাভূমি। তার কারণ—(ক) বাংলায় বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা (২) সমুদ্র সন্নিহিত দেশ এবং দিল্লী থেকে অনেক দূর (৩) রেশম, কার্পাস, চিনি, নীল, সোরা, সর্বোপরি চাল এখানে অফুরন্ত। প্রকৃতিজাত পণ্যের বিপুল প্রাচুর্য। বানিয়ারের সর্বাপেক্ষা 'ফলবন্ত দেশ', ইবনবতুতার 'রুচিপূর্ণ নরকের দেশ', রাল্‌ফ্ ফীচ, বারবোসা, ভার্থেমা, নিকালো কন্টির এবং আরও অনেক বিদেশী ভ্রমণকারীর সমৃদ্ধিশালী দেশ সাগরপারের বণিকদের প্রলুব্ধ করেছিল সেই সুদূর আকবরের কাল থেকে। এখানকার শান্ত, নির্বিরোধ, স্বল্পে সন্তুষ্ট বাঙালীর মধুর ব্যবহার, উর্বরা মাটির অঢেল ফলন, নীল আকাশের নীচে ঘন সবুজের ছবির মত বিপুলব্যপ্ত প্রান্তর বিদেশী বণিকদের ভেতরে একটা আশ্চর্য প্রবাদের জন্ম দিয়েছিল। তারা বলতো বাংলাদেশে প্রবেশের পথ একশোটি কিন্তু বাইরে যাওয়ার পথ নেই একটিও। সেকালে চুঁচুড়ার ডাচ, হুগলীর ইংরেজ এবং পর্তুগীজ বণিকদের মুখে মুখে ফিরতো বাংলার আশ্চর্য সমৃদ্ধির এই প্রবাদবাক্য।

এই বাংলার মাটিতে সর্বপ্রথম ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল পর্তুগীজ। তারপর এসেছিল ওলন্দাজ, এসেছিল ইংরেজ, এসেছিল ফরাসী। কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকে গিয়েছিল—শুধু যে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল তা নয়, সারা দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিল ইংরেজ বণিকরা। ভারত-ইতিহাসের সেই বহুল প্রচারিত এবং বহু আলোচিত তথ্যটি ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু কেমন করে সেই অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপারটি ঘটেছিল—কেমন করে তারা বাংলা দেশের যুগসঞ্চিত ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পের সমাধি দিয়েছিল, কেমন করে এদেশের বাণিজ্যকে একটু একটু করে গ্রাস করেছিল আর বাঙালী ব্যবসায়ীকে খুচরো পণ্য বিক্রীর দোকানীতে পরিণত করেছিল সেই কুট-কুটিল চক্রান্তের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত আলোচনায় আসা যাক—

জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বা যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আগে অর্জন করতে হয় বিশ্বাস। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়—এগুলো নিউটনের 'লজ অফ মোশানসের' মত কালজয়ী সত্য। ইংরেজদের চরিত্রের সততা আর অপরিসীম ধৈর্য তাদের জয়ী করেছিল। বহু বাধাবিপত্তি, স্থানীয় শাসকদের অর্থগৃধ্নুতা, ফৌজদার, ট্যাক্সকালেক্টারদের বহুবিধ অন্যায় জুলুম সহ্য করেও তারা নিজেদের লক্ষ্যের দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। কলকাতা, কাশিমবাজার, বালাসোর, মালদহ এবং ঢাকায় তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র অর্থাৎ কুঠি স্থাপিত করেছে ইংরেজ। বাঙালী ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের কাছে এই সব কুঠিতে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পেলে খুব খুশী হতো। কারণটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক ঐতিহাসিকের উক্তিতে[১]···The confidence which they inspired among native merchants by their integrity and straight dealing···তাদের সহজ সরল পরিষ্কার ব্যবসায়িক

আদান-প্রদান দেশীয় ব্যবসায়ীদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক করেছিল। বিশ্বাসটা অর্জন করেছিল কেমন করে? ইংরেজ কুঠির কর্মচারী স্ট্রীনসহ্যামের (streynsham)[২] ডায়েরীতে দেখা যায়, ইংরেজরা যখন কাজের অবসরে দূরে শিকারে যেতেন তখন তারা বাংলাদেশের গ্রামে, পথে-প্রান্তরে প্রাচীন দিনের সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপ, জীর্ণ দেবায়তন রাজপ্রাসাদের অস্থিচূর্ণ অর্থাৎ এখানকার 'অ্যান্টিকুইটিজগুলো' দেখতে ভুলতেন না। তাই ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার থেকে শুরু করে বাংলা-দেশের প্রত্যেক জেলার গেজেটিয়ারগুলোর রচয়িতা ইংরেজ। এদেশের (প্রত্যেক জেলার) সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প ইত্যাদি তথ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিল যে এই গেজেটিয়ার একথা কে না জানে! ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনেই তারা গড়েছিল রাস্তা, গড়েছিল নগর এবং বন্দর। ভানুমতীর কুহকের মত পাল্টে গিয়েছিল তাদের ব্যবসাকেন্দ্র হুগলী, কলকাতা, কাশিমবাজার ঢাকা—এসব কথা কারও অজানা নয়। ইংরেজদের উন্নতি এবং এদেশে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আরও একটা কারণ তাদের কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা। এক একটা কুঠিরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত কঠিন নিয়মে বাধা।[৩] ঘড়ির কাঁটা ধরে সকাল নয়টা থেকে বারোটা আবার দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর দুপুর দুটো থেকে চারটা পর্যন্ত কুঠির কর্মচারীরা কাজ করতো। বিনা অনুমতিতে তারা কেউ কুঠির বাইরে থাকতে পারতো না। ঠিক রাত নয়টায় বন্ধ হয়ে যেত কুঠির গেট। শুধু তাই নয়, ফ্যাক্টরীর গভর্ণর যেদিন কুঠি পরিদর্শন করতেন সেদিন সকাল থেকে ড্রাম বাজতো, বাজতো বিউগিল আর দু'জন শক্তসামর্থ লোকের হাতে থাকতো রৌপ্যখচিত দু'টি মজবুত লাঠি। আর তার মাথায় থাকতো তাদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়নজ্যাক। তারপরে বর্ণাঢ্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে 'পারসিয়ান' ঘোড়ায় চড়ে রাজার মহিমায় আসতো গর্ভনর। তাকে অনুসরণ করতো কুঠির

অধস্তন কর্মচারীদের বিশাল রঙীন শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগের পতাকা ছাড়াও সেই সপ্তদশ শতাব্দীর স্বাধীন বাংলার মাটিতে স্থাপিত ইংরেজ কুঠির ছাতে খোলা হাওয়ায় পত পত করে উড়তো তাদের দেশের পতাকা। স্বদেশ, স্বজাতি এবং তাদের দেশের রাজার প্রতি গভীর আনুগত্য আর শ্রদ্ধাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে স্ট্রীনসহ্যামের এই বিশদ বিবরণের ভেতরে। এই নিবিড় স্বদেশপ্রেম, এই সংযত জীবনধারা তাদের ধাপে ধাপে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের সহজাত ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার আভাস পাওয়া যায় বেছে বেছে নৌবাহনযোগ্য নদীর ধারে ধারে সমৃদ্ধ জনপদে তাদের ব্যবসাকেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে। কলকাতা, হুগলী, কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহ—ইংরেজদের এই সব কেন্দ্র লক্ষ্য করে দেশের দূরদূরান্তর থেকে আসতো রেশম, চিনি, আফিং, চাল, গম, তেল, কাঁচা তুলো এবং পাট। আর এই গঞ্জগুলোর উপকণ্ঠেই বাস করতো কার্পাস ও রেশমের হাজার হাজার কারিগর।

কাশিমবাজারের কথা আগে বলা হয়েছে। হুগলী সম্বন্ধে অ্যালেকজান্দার হ্যামিল্টন বলেছিলেন, হুগলী বিদেশী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বাণিজ্যের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এই হুগলী। হ্যামিল্টন বাংলায় এসেছিলেন ১৭০৫—খৃষ্টাব্দে। হুগলীকে কেন্দ্র করে তার উক্তিটাও[৪] এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য···all foreign goods were brought thither for import and all goods of the product of Bengal were brought hither for exportation. অর্থাৎ সমস্ত বিদেশী পণ্য এখানে যেমন আমদানী হতো, তেমনি দেশীয় পণ্য এই হুগলী থেকেই রপ্তানী হতো। চুঁচুড়ায় হ্যামিল্টন দেখেছিলেন, ডাচদের উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিশাল কুঠি। চুঁচুড়াকে বলেছেন 'ডাচ এম্পোরিয়াম'। আর

দেখেছিলেন, গঙ্গার ধারে সারি সারি সুদৃশ্য বাড়ি। কিন্তু উত্তরকালে ওলন্দাজদের চলে যেতে হয়েছিল। কেন ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পারে নি—তার একটা কারণ হচ্ছে, পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য শতকরা ২১/২ টাকা হারে রাজস্ব দিতে হতো নবাবকে। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার পেয়েছিল ২,২১,৯৭৫ টাকা। আর ইংরেজ শুধু বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। চুঁচুড়া, বরানগর ডাচরা নিয়েছিল লীজ আর কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর গঙ্গার ধারের এই তিনটি গ্রামের জমিদারী সত্ত্ব কিনেছিল ইংরেজ। আরও আছে কারণ, ওলন্দাজদের কাশিমবাজার, বরানগর ফ্যাক্টরীতে যে কারিগররা অগ্রিম টাকা অর্থাৎ দাদন নিয়ে কাজ করতো, তারা কাজে ফাঁকি দিলে, বিনা নোটিশে কামাই করলে ডাচসাহেবরা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতো না, স্থানীয় শাসকদের শরণাপন্ন হতে হতো। কিন্তু সম্রাট ফারুকশায়ারের ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজদের হাতে ছিল আইন। এই ফরমানের ছয় নম্বর ধারায় ছিল« That all persons whether European or native, who might be indebted or accountable to the Company should be delivered up to the chief of the factory. অতএব কোন দরিদ্র কারিগর অভাবের দায়ে তার অগ্রিম টাকা খরচ করে ফেললে কুঠির গভর্ণরই তা আদায় করতে পারতো। নবাবের দরবারে ছুটতে হতো না।

ফারুকশায়ার ১৭১৩ সালে যিনি বাংলা দেশের ব্যবসায়ী ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, তিনিই মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসে দেশের দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি ফরমান দিয়েছিলেন বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের। শুধু তাই নয় —লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ডে তার সেই পারসী ভাষায়

লিখিত সনদের ভেতরে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সমাধি আর পক্ষান্তরে ইংরেজদের বিস্ময়কর সমৃদ্ধির কারণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফারুকশায়ার ইংরেজদের প্রতি খুশিতে গদ গদ হয়ে ঢালা হুকুম দিয়েছিলেন—কোম্পানীর দস্তক কিম্বা অনুমতির ছাপ দেওয়া যে কোন পণ্য পরীক্ষা করা, বাজেয়াপ্ত করা এবং চলাচলে বাধা প্রদান করার কোন অধিকার নেই নবাবের কর্মচারীদের। মুর্শিদাবাদের টাকশালও ব্যবহার করতে পারবে ইংরেজরা। টাকা তৈরী করার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে তাদের। ইংরেজ বণিকরা আজ হুগলী, কাল কলকাতায়, পরশু ডায়মণ্ডহারবারে ব্যবসা করতে লাগল। কাশিমবাজারে, বালেশ্বরে, পাটনায় তারা কুঠি গড়ে তুলল, কুঠি অর্থে জিনিস কিনে মজুত করে রাখার জায়গা। আবার এইখান থেকেই তারা তাদের পণ্য বিক্রি করে দিত মহাজনের কাছে। এই কুঠির ভেতরেই থাকতো তাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র।

এই ফরমান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে—Farman regarded as the Magnacarta of English trade in India. ১৭১৭ থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এই চল্লিশ বছরের ভেতরে ইংরেজের বিপুল প্রতিষ্ঠার মূলে আছে এই অপরিণামদর্শী সনদ। এই অনুমতিপত্রের একটি ধারায় ছিল, যে কোন পণ্য এবং ইংরেজদের প্রয়োজনীয় যে কোন সামগ্রী তারা বিনাশুল্কে জলে-স্থলে সরবরাহ করতে পারবে। নবাবের কর্মচারীরা এই জন্য তাদের কোন কৈফিয়ৎ তলব করতে পারবে না। এই আইনের বলেই তারা নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছিল। আর বাংলাদেশের ব্যবসা এবং রাজনীতিতে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিল।

এক একটা করে দিন পার হয়ে যেতে লাগল। বড় চতুর জাত এই ইংরেজ। তারা কেমন করে বাংলার সুবেদার থেকে শুরু করে একেবারে অধস্তন কর্মচারীকে পর্যন্ত উপঢৌকন (ঘুষ) দিয়ে খুশি

করতো তার চমকপ্রদ তালিকা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে ইংরেজদের সমসাময়িক আরও অন্যান্য যে সব ইউরোপীয় বণিক বাংলাদেশের বিপুল ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে এসেছিল। তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক :

বঙ্গদেশ।

সোনার দেশ। এখানকার সুজলা, সুফলা মাটির আকর্ষণে, রেশম, তুলোর বিপুল প্রাচুর্যের টানে স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে এসেছে ব্যবসায়ীরা আরব থেকে, পারস্য থেকে, আবিসিনিয়া থেকে, চীন থেকে, তুরস্ক থেকে, এসেছে প্যালেষ্টাইন থেকে। এদেশের একশোটা প্রবেশদ্বারে দিয়ে এসেছে পর্তুগীজ, এসেছে ওলন্দাজ এসেছে ইংরেজ। ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে[৬] ১৭৫২ সালে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলছেন Most fertile of any in the Universe. এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজরা যখন বাংলাদেশের দিকে দিকে নিজেদের দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে তখন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের অবস্থাটা কি ?

এই বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রথমে যারা এসেছিল, যারা ছিল ভারত মহাসাগরের অধীশ্বর সেই পর্তুগীজরা বড় করুণ আর ছন্নছাড়া জীবনযাপন করছে। এখানে-ওখানে দু'একটা কুঠি আছে বটে। কিন্তু না আছে জনবল, না আছে অর্থবল। আর কুঠিয়াল পর্তুগীজ সাহেবরাও কেমন দুর্বল আর অবসন্ন। তাদের রক্তধারায় নেই সেই পূর্বসূরীদের হিংস্র বলিষ্ঠতা, নেই সেই দুর্জয় সাহস। ব্যবসা বাণিজ্য তো দূরের কথা, পেট চালানোর জন্য তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন কুঠিতে সৈন্যের চাকরীতে নাম লেখায়, মুখ বুজে সয়ে যায় তাদের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার। ইংরেজ বা ফরাসী হলে মাইনে ১০ টাকা আর পর্তুগীজ হলেই ৫ টাকা।

ওলন্দাজদের ব্যবসাকেন্দ্র ছিল চুঁচুড়া, কাশিমবাজার আর

পাটনায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকেই তাদের অবস্থা পড়তির দিকে, তার মূল কারণ দুর্নীতি। আলেকজান্দার হ্যামিল্টন[৭] দেখেছেন বরানগরে ওলন্দাজদের এক বাগানবাড়িতে···Number of girls are trained up for the destruction of unwary youths, who study more how to gratify their brutal passions···

পর্তুগীজরা ব্যবসা করতে এসে শুরু করেছিল নির্বিচারে লুট-তরাজ আর নারীধর্ষণ—নির্মম আর হিংস্র জলদস্যুর ভূমিকা নিয়ে ছিল। ওলন্দাজরা লিপ্ত হয়েছিল পৃথিবীর আদিমতম পাপে। তাই সাগরপারের এই দুই বিদেশীকেই বাংলা দেশের মাটি থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওলন্দাজরা তাদের ভেতরের দারিদ্র্যজীর্ণ অবস্থাটা গোপন করবার জন্যেই প্রচুর টাকা ধার করেও কুঠির কারিগরদের দাদন দিত। আর ইংরেজদের মত সুবিধা তারা পায় নি—তাই দিনে দিনে তাদের অবনতি হয়েছিল।

ডাচদের তুলনায় ফরাসীরা বাংলাদেশের ব্যবসায় বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ তাদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিল। ঠিক তার ষোল বছর পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ চন্দননগরে কুঠি গড়ে তোলার সম্মতি দিয়েছিল। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তারা স্বয়ং বাদশাহের ফরমানও পেয়েছিল বাংলা, বিহার উড়িষ্যায় ব্যবসা করার জন্য। চুক্তি আর সর্ত ছিল ডাচদের মত। দিনে দিনে সাগরপারের বিদেশী এই বণিকরা বিপুল উন্নতি করতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর চার দশকের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য:—ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভেতরে ফরাসীরা বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে, চন্দন-নগর ছাড়া কাশিমবাজারে, পাটনায়, ঢাকায় তাদের ব্যবসাকেন্দ্রের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, তবুও তাদের চন্দননগর আর পণ্ডিচেরীতে নামমাত্র অস্তিত্ব রেখে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। তার

একমাত্র কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আড়ালে যেমন তাদের দেশের সমর্থন ছিল খুব জোরদার—ফরাসীদের তেমন ছিল না।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বন্দরে ইউরোপীয় বণিকদের কার ক'টা জাহাজ এসেছিল এবং ছেড়েছিল তার হিসাব দেওয়া হলো :—তার ভেতরে তাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যাবে।[৮]

	পৌঁছেছিল			ছেড়েছিল		
	ইংরেজ	ফরাসী	অন্যান্য	ইংরেজ	ফরাসী	অন্যান্য
জানুয়ারী	১	১	×	১১	৩	৯ মুর
ফেব্রুয়ারী	৪	×	×	৯	১	×
মার্চ	৬	×	১ ডাচ	৩	×	×
এপ্রিল	২	×	১ ডাচ	×	×	×
মে	৬	২	২ মুর	×	×	×
জুন	৭	×	৪ মুর	×	×	×
জুলাই	২	৫	×	২	২	২ ডাচ
আগস্ট	৩	৪	৫ মুর	৩	×	×
সেপ্টেম্বর	৫	২	×	৩	১	×
অক্টোবর	৪	৩	১ মুর	২	১	×
নভেম্বর	২	৩	×	৫	৮	৩ মুর
ডিসেম্বর	×	×	×			

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত ওতোপ্রতোভাবে জড়ানো, তাই একেবারে গোড়া থেকেই ইংরেজ কি করে ধাপে-ধাপে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, সেই আলোচনায় আসা যাক।

বাংলায় ইংরেজদের সর্বপ্রথম কুঠি স্থাপিত হয়েছিল ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে অর্থাৎ তিনশত একচল্লিশ বৎসর পূর্বে। স্থাপিত হয়েছিল মহানদীর তীরে হরিহরপুরে।

এই হরিহরপুর থেকেই র‍্যাল্‌ফ কার্টরাইটের (Ralph Cartwright) নেতৃত্বে এডওয়ার্ড পিটারফোর্ড (Edward Peterford) এবং উইলিয়াম উইথহল (William Withhall) উড়িষ্যা থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে বালেশ্বরে পৌঁছেছিলেন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হলো হুগলীর কুঠি আর রেশম ব্যবসার সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্র কাশিমবাজারে গড়ে উঠল কুঠি ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলো ঢাকায়। ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে ঢাকার খ্যাতি ছিল সুদূরকালের। রাজধানী চলে আসার ফলে ব্যবসা এখানে জাঁকিয়ে উঠল। তুলো এবং তুলোজাত বস্ত্রের বিপুল আমদানী-রপ্তানী হতে লাগল।

এক একটা করে দিন কেটে যেতে লাগল আর গঙ্গার ধারে ধারে রাজমহল মালদহে একটার পর একটা কুঠি গড়ে তুলতে লাগল ইংরেজরা।

এই বাংলার দিকে দিকে কুঠি নির্মাণ অর্থাৎ উপনিবেশ স্থাপনের পর্ব শেষ হলো ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। এই বছরই ভাগীরথীর তীরে কলকাতা মহানগরীর পত্তন করেছিল জব চার্নক।

কিন্তু ১৬৩৩ থেকে ১৭০৭ সনে ইংরেজদের এই প্রতিষ্ঠা, বাংলায় তাদের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির ইতিহাস কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কখনো রাজানুগ্রহ পেয়েছে, কখনো সেই ফরমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্থানীয় শাসনকর্তা তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে ; কখনো যুদ্ধ হয়েছে, আবার উপঢৌকন পেয়ে বাংলার নবাব এবং দিল্লীশ্বর খুশি হয়েছে। সেই ইতিহাস দীর্ঘ সংঘর্ষের ইতিহাস, ইংরেজদের উত্থান-পতনের ইতিহাস।

সেই মোগল বাদশাহ ফারুকশায়ারের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার, আরও অনেক—অনেক আগে টমাস রোর মাধ্যমে জাহাঙ্গীরের অনুমতি, বালেশ্বরের কাছে পিপলি বন্দর পর্যন্ত

ইংরেজদের জাহাজ নিয়ে আসার জন্য শাহজাহানের সানন্দ সম্মতি (১৬৩৪), বাংলার শাসনকর্তা সুজার শুধু ৩,০০০ টাকা বার্ষিক শুল্কের বিনিময়ে এই বাংলায় ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত : এসবই আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলো ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল। এই সংবাদ ইংরেজদের ভেতরে যে তীব্র ভয় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার মাটিতে ইংরেজরা ততটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাদশার মৃত্যুসংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে ফোর্ট-উইলিয়ামে কাউন্সিলের[৯] জরুরী মিটিং বসল। দেশ জুড়ে একটা দারুণ অরাজকতা বিদ্রোহ বিপর্যয় শুরু হবে এই আশঙ্কায় কোম্পানী তার 'দাদনী' এবং পাইকারদের কাছে 'ইনভেস্টমেন্ট' বন্ধ করে দিল। ড্যারেল আর স্পেন্সার নামে কাশিমবাজার কুঠির দুই কুঠিয়াল কোথায় অনেক টাকা নিয়ে মাল কিনতে গিয়েছিল তাদের ফিরে আসতে বলা হলো। মাদ্রাজের কুঠিতে ৫০০০ মণ চাল, ১০০০ মণ গম পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যদি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হয়, আর যদি রসদ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এখানে ওখানে স্থানীয় জমিদারদের দু'একটা টুকরো টুকরো বিদ্রোহ ছাড়া যুদ্ধ হয়নি। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বৈরাচারী শাসন শুরু করল। আমলা-গোমস্তারা যে যেদিকে থেকে পারল লুটে নিতে লাগল। শুধু তাই নয়—

তারা শায়েস্তা খাঁর ট্রাডিশান অনুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যবসাও করতো। যেমন মীরজুমলা[১০] যিনি ১৬৬০ থেকে ১৬৬৩ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন তিনি ইংরেজদের সাহায্য এবং জাহাজ নিয়ে প্রায়ই নিজের ব্যবসা করতেন। Mir Jumla—carried on extensive trade on his own account and frequentty availed himself of the services of the English and their ships to despatch his articles to Persia···He also invested

large sums with English on business transactions. এই ব্যবসার লেনদেন থেকেই বিরোধের উৎপত্তি হয়েছিল।

১৭০৮-৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবেদার এবং দেওয়ান হয়েই রাজধানী নিয়ে এলেন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়িক গুরুত্ব আগেই ছিল। এখন আরও জাঁকিয়ে উঠল, হয়ে উঠল শ্রেষ্ঠ ব্যবসাকেন্দ্র।

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসনকর্তা। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন ইংরেজদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠা। তিনি দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন, ইংরেজরা একদিন সারা দেশ গ্রাস করবে।

তাই কুলী খাঁ সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিলেন। তিনি সারা বাংলায় ঘোষণা করেছিলেন, পূর্ববর্তী 'ফরমান' অনুযায়ী শুধু যে সব পণ্য দূর সমুদ্র পারে রপ্তানী হবে, সে সব পণ্যের ওপরে 'শুল্ক' দিতে হবে না। ইংরেজদের অন্য যে কোন পণ্যের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। অনাদায়ে জিনিষ বাজেয়াপ্ত হবে।

আরও বাধা দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী এক 'ফরমানে' কলকাতার পার্শ্ববর্তী আটত্রিশটি গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি ছিল। এই গ্রামগুলো ছিল হুগলী নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত। উত্তরে বরানগর থেকে দক্ষিণে খিদিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি তখন ইংরেজ কোম্পানীর ওপর নির্ভরশীল দেশীয় সওদাগর, বেনিয়া (এজেন্ট) দালাল, ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের বাসভূমি হয়ে উঠেছিল। তাই মুর্শিদকুলী খাঁ এই গ্রামগুলো ক্রয় করতে বাধা দিলেন। হুকুম[১১] দিলেন জমিদারদের, কেউ যেন ইংরেজদেব কাছে একটি গ্রামও বিক্রয় না করে। কিন্তু কোন লাভ হয় নি, একথা কারও অজানা নয়।

ইংরেজদের মুর্শিদাবাদের টাকশাল ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে গেল, ফতেচাঁদ গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কার এবং সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁ

একযোগে ইংরেজদের বাধা দিলেন। তার উত্তরাধিকারী সুজাউদ্দীনও খুব কম বাধা দেননি।

তবুও ২,৭৮,৫৯৩ পাউণ্ড (১৭১৭) থেকে ৩,৬৩,৯৭৯ পাউণ্ড (১৭২৯) হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজদের দাদন।[১২]

ইংরেজ ব্যবসায়ীর জাত। তারা জানতো, কেমন করে বাংলার সুবেদারকে তার অধস্তন কর্মচারীকে খুশি করতে হবে। তারা বহু মূল্য উপঢৌকন পাঠাতো তাদের। কাশিমবাজারের স্থানীয় শাসন-কর্তা বিরূপ হয়েছে। দাও তাকে কিছু ঘুষ। হুগলীর ফৌজদার 'ফরমান' বহির্ভূত পণ্য রপ্তানীর জন্য ট্যাক্সের ঝামেলা করছে, দাও তার হাতে কিছু। প্রাচীন দিনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডে[১৩] লিখছে—The Faujadar of Hugli was, in fact a frequent recipient of such presents for his good offices.

এখানে ইংরেজরা কি রকম ঘুষ বা 'নজরানা' দিত, নবাব থেকে শুরু করে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত তার নমুনা দেওয়া হলো :[১৪]

ক্রমিক সংখ্যা	যাকে দেওয়া হতো	টাকা
	নবাব	
১ খণ্ড	বিলেতী সুদৃশ্য কাপড় বেগুনী ১৬ গজ	১১৪
১ ”	” ” ” সবুজ ২৪ ”	৮০
১ ”	” ” ” লাল ২৩½ ”	১২০
১ ”	” ” ” সাধারণ	৮০
২টা	তলোয়ার	৫
১ জোড়া	পিস্তল	২২
১টা	গাদা বন্দুক	২২
১টা	বড় আয়না	৩৮
১টা	সিলিকান পাথরের আয়না	৬০
		৫৪১ টাকা

মহম্মহ রারা, আকবরনবীশ

৩ খণ্ড	বিলেতী সুদৃশ্য কাপড় সোনালী	১১৭
২ „	„ „ „ সাধারণ	৮০
১ „	„ „ „ লাল	১২০
১ জোড়া	পিস্তল	২২
২টা	তলোয়ার	৫
১টা	বন্দুক	২২
১টা	আয়না	৩৮
১টা	সিলিকান পাথরের টেবিল	৬০

৪৬৪ টাকা

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের হুগলী কুঠির ভকিল বা এ্যাটর্নী এসেছিল ফৌজদারের কাছে তাদের বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্য তদ্বির করতে। ফৌজদার এ্যাটর্নী রাজারামকে বলেছিল, ওলন্দাজরা নবাবকে প্রচুর নজরানা দিয়েছে—আপনারা অন্তত নবাবকে ৩৫০০ টাকার নজরানা দিন—তাহলে আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

এই ঘটনা থেকে বুঝতে পরা যায়, দেশীয় রাজন্যবর্গের অর্থলোভ আর দুর্নীতি একটু একটু করে এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিল। তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে এখানে দেওয়া গেল না। কিন্তু Diary and consultation Book of Fort William (1704)-এ আছে—৩৫০০০ টাকার জিনিস মুন্সী, বক্সীর নায়েব, আকবরনবীশের মুৎসুদ্দি, কাজি, দারোগা থেকে সেপাই পর্যন্ত কি করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তার এক চমকপ্রদ তালিকা।

১৭১৭ সালের ৩০শে জুন মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কাশিমবাজার কুঠির অধিনায়ক

জানালো, এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। মুশিদের মৃত্যুর একমাস পরেই ১৭১৭ সনে প্রবর্তিত সরফরাজ খানের ফরমান অনুযায়ী তাদের কর্মপন্থা চালিয়ে যেতে লাগল। মাত্র ৫০০০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা শহর ক্রয় করল। মালদহে আবার স্থাপন করল[১৫] কুঠি। ইংরেজদের পরিষদ আরও ১০,০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করল কাশিমবাজারের কুঠিয়ালকে শুধু হুগলী এবং ঢাকায় তাদের ব্যবসা চালু করবার জন্য।

এই সময় ইংরেজরা বাংলাদেশ থেকে কি কি পণ্য কত পরিমাণে রপ্তানী করতো নীচের তালিকা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১৬]

স্কিপিও জাহাজের পণ্যের তালিকা, ১৭০৪, ফোর্ট উইলিয়াম।

১।	সোরা (Saltpeter)	২০০ টন
৩।	বাফতা	৬ „
৩।	কড়ি	১০ „
৪।	কুমীশ (বস্ত্র)	৫½ „
৫।	তাঞ্জেব	৫ „
৬।	মলমল	৬ „
৭।	ডুরিয়া (মসলিন)	৫ „
৮।	সুসী („)	২½ „
৯।	গলাবন্ধ (বাফতা)	১ „
১০।	আলবাল্লে (মসলিন)	২ „
১১।	পান্নাহাজার (জামদানী)	৩ „
১২।	নক্সা কাটা তাঞ্জেব	২ „
১৩।	কাঁচা সিল্ক মটকা	৩৭ „
১৪।	আদা ও মসলা	৪৯½ „
১৫।	তুলোর সুতোর পেটী	১০ „

১৬।	ডিমোথী (বাফতা)	১	,,
১৭।	তরন্দাম (মসলিন)	২½	,,

মুর্শিদকুলী খাঁর পর শাহ সুজা খান (১৭২৭) থেকে (১৭৩৯) তার বারো বছরের সুবেদারীতে মুর্শিদ খানের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারল না। ইংরেজরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। কুঠিতে কুঠিতে পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্ত্রশস্ত্রও আমদানী করতে সুরু করল। এল অস্ত্র, এল পাদরী। সারা দেশের স্বাধীনতা, দেশের ধর্ম (ধর্মের ওপরে ধীরে ধীরে ইংরেজ সংস্কৃতির প্রভাবে) বিপন্ন হয়ে উঠল।

এই সময় দেশীয় অধিবাসীরা তাদের জাতীয় চরিত্র হারিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য বিদেশী বণিকদের সমর্থন করেছে। তারাই ইংরেজদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে টেনে এনেছে।

১৭৫১—৫২ সনে দেখা যাচ্ছে সুতানুটি, গোবিন্দপুরের দেশীয় শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক ও উমিচাঁদ বিপুল প্রাধান্য লাভ করেছিল।

জগৎশেঠ তাঁর ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করতেন। বিভিন্ন জায়গায় তাদের শাখাপ্রশাখা ছিল। আলিবর্দ্দীর আমলে (মুর্শিদকুলী খাঁ-র আমল ও বলা যায়) দেশীয় অর্থাৎ গুজরাটী, ভাটিয়া, মুসলমান ও বাঙালী ব্যবসাদারদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাদের শুধু সমর্থন নয়—যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হতো।

এসে পড়ল ১৭৪০ সাল। বাংলার মসনদে বসল আলীবর্দ্দী। মুর্শিদকুলীর পরে বাংলা আবার পেয়েছিল সুযোগ্য, বিচক্ষণ,নির্ভীক আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আর এক শাসনকর্তা। বাঙলা দেশের ব্যবসার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই চারের দশক নিঃসন্দেহে যুগসন্ধির কাল। এই সময় ইংরেজরা বাংলাদেশের দিকে দিকে কুঠি

গড়ছে, ধ্বংস করছে দেশীয় শিল্প, অত্যাচার আর অবিচারে নিষ্পেষিত করছে রেশম আর বস্ত্রের সুনিপুণ শিল্পীদের। একটু একটু করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে। উৎকোচে বশীভূত করে, ছলে বলে কৌশলে বিনাশুল্কে ব্যবসা করে দুহাতে পয়সা লুটছে। এই আলোচ্য সময়ের বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ওরমের[১৭] (Orme) উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: সারা ভারতবর্ষ তুলো ও রেশম থেকে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করে একা বাংলা দেশ তার তিনগুণ বেশী বস্ত্রসম্ভার জোগান দেয়। তার কারণ বাংলা দেশ কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার মানুষ কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে বস্ত্র বয়ন করে। বস্ত্রবয়ন হয় এদেশে ঘরে ঘরে।—ওরমের এই বক্তব্য উল্লেখ করে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পরিষদ বিলেতে চিঠি লিখছে—বাংলাদেশেরই বিভিন্ন কুঠিতে আরও বেশী পরিমানে টাকা খাটাতে হবে। আর একজন বিদেশী ইতিহাসবিদ পুট্টুল্লো[১৮] (Puttuulloo) বলেছেন, বাংলাদেশের মসলিনের আদর কখনো কমবে না, তার কারণ···No nation on the globe can either equal or rival them···পৃথিবীর আর কোন জাত এত সুদৃশ্য বস্ত্র তৈরি করতে পারে না। এই সময় বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল বস্ত্রশিল্পে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সেই আলোচনায় আসা যাক।[১৯]

রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত মালদহ, হরিয়াল, শেরপুর, বালিখুসী এবং কাকমারীতে পাওয়া যেত কশিদা, এলাচীদানা, হাম্মাম এবং চৌথান ইত্যাদি মসলিন। রাজা সন্তোষের জমিদারীর অন্তর্গত রংপুর ও ঘোড়াঘাটে তৈরি হতো বাফতা, মসলিন তাঞ্জেব ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার। এখান থেকেই এই সুদৃশ্য বস্ত্রের পণ্য চলে যেত মক্কায়, জিদ্দায়, পেগু আর মালাক্কায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অঞ্চলের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে প্রচুর মলমল রপ্তানী করতো। বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরপাই, রাধানগর, দেওয়ানগঞ্জ

এবং বর্দ্ধমান বস্ত্রশিল্পে খুব উন্নত ছিল। রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্রের জন্য খ্যাতি ছিল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের, বীরভূমের অন্তর্গত ইলাম-বাজারের। কাশিমবাজারের রেশম ছিল জগদ্বিখ্যাত। গ্রসের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যাচ্ছে, কাশিমবাজার বছরে ২২০০০ বেল রেশম উৎপন্ন করতো। প্রত্যেক বেলে ১০০ পাউণ্ড করে রেশম থাকতো। রেনেল (১৭৬৩) বলছে, কাশিমবাজার ছিল বেঙ্গল সিল্কের ভাণ্ডার। এখান থেকেই সারা এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী হতো রেশম। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বস্ত্রবয়নকারীদের তিন কোটি থেকে চার কোটি পাউণ্ডের বেঙ্গল সিল্ক প্রয়োজন হতো। আর রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র উৎপাদনে ঢাকার কোন জুড়ি ছিল না। ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী বাংশীর পাড়ে ঢাকা শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ডুমরো গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উন্নত ধরনের তুলো জন্মাতো। সেই তুলো থেকেই মুড়াপাড়া, বাবপাড়ার বস্ত্রশিল্পীরা তৈরি করতো ভুবন বিখ্যাত জামদানী শাড়ী।

১৭৫৫ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টারস্ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কলকাতা পরিষদের (Council in Calcutta) কাছে যে চিঠি দেন, তাতে উল্লেখ আছে ঢাকার বিখ্যাত সরবেতী, মলমল আর আলবেল্লী মসলিনের। আলীবর্দ্দীর সময়ে ইংরেজরাও বেছে বেছে বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলিতে তাদের কুঠি গড়েছিল। পাটনা, কাশিমবাজার, রংপুর, রামপুরবোয়ালিয়া, কুমারখালি, শান্তিপুর, বুরান (নদীয়া), শোনামুখী (বাঁকুড়া), রাধানগর, ক্ষীরপাল, হরিপাল (হুগলী), গোলাঘর, জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ), লারদা (রাজসাহী) জগদিয়া, ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, কলিন্দা (ঢাকা থেকে রেনেলের ম্যাপ অনুযায়ী ত্রিশ মাইল দূরে), বালেশ্বর, বলরামপুর, মালদহ, বরানগর, ধনিয়াখালি, বুদ্দাল (দিনাজপুর জেলা), হরিয়াল (রাজশাহী)—এই জায়গাগুলোতে ইংরেজরা তাদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। ১৭৪১ সালের ফোর্ট উইলিয়মের[২০] রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজরা কাশিমবাজার কুঠিতে

১,৬০,০০ টাকা, জগদিয়া কুঠির জন্য ৬০,০০০ টাকা, বালেশ্বর কুঠির জন্য ২৪,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছে। ফরাসীরাও জাঁকিয়ে বসেছিল চন্দননগরে, কাশিমবাজারে, সৈদাবাদে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রংপুরে, ঢাকায় আর জগদিয়ায়।

ইউরোপীয় বণিকদের এই ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধি নবাব আলীবর্দ্দী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। কিছুতেই তারা যেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৭৪৫ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, খবরদার আমার সীমানার ভেতরে কোন গোলমাল করো না। একবার ইংরেজদের গোমস্তাকে বলেছিলেন,[২১] তোমরা বণিক—এদেশে ব্যবসা করতে এসেছো—কিন্তু তোমরা কুঠি গড়ার নাম করে দুর্গ তৈরি করছো কেন?

প্রায়ই তিনি এই ইউরোপীয় বণিকদের চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতেন। হঠাৎ একবার (১৭৪৪) ইংরেজদের কাছে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবী করে বসলেন। পরোয়ানা জারী করে দিলেন, টাকা না দিলে তারা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারবে না। পরিষ্কার ইংরেজ কুঠিয়ালদের জানিয়ে দিলেন, তোমরা চার পাঁচটা জাহাজের জায়গায় চল্লিশ পঞ্চাশটা পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ করছো। বঙ্গদেশ এখন বর্গীদের হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত। আমার সৈন্যদের মাইনে বাকী পড়েছে। টাকার প্রয়োজন। ইংরেজরা একটু গড়িমসি করছিল দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন বাংলার নবাব আলীবর্দ্দী। ঘেরাও করে ফেললেন কাশিমবাজার কুঠি। গ্রেপ্তার করলেন কোম্পানীর গোমস্তা প্রীত কাটমাকে। তার কাছ থেকে ১,৩৫০০০ টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলল তার ওপর নির্যাতন। আর এক গোমস্তা বালি কাটমা তো পালিয়েই গেল। নবাবের সেপাই ফাটকে পুরল কোম্পানীর দাদনী মহাজনের

সরকার নরসিংহ দাসকে, আর কাশিমবাজারের বড় ব্যবসায়ী কেবলরামকে। অবস্থা খুব জটিল মনে করে কলকাতা থেকে কাশিমবাজারের কুঠিয়ালদের কাছে নির্দেশ গেল,[২২] জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মারফৎ ৪০,০০০ কিম্বা ৫০,০০০ টাকা নবাবকে দিয়ে একটা রফা করে ফেল। কিন্তু ফতেচাঁদ হাঁকিয়ে দিল—এত কম টাকায় নবাবকে সন্তুষ্ট করা যাবে না, অন্তত চার পাঁচ লক্ষ টাকা চাই—ইংরেজরা তখন তাদের নিজেদের অ্যাটর্নীকে নবাবের কাছে পাঠালো এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্যের অনুমতির প্রস্তাব নিয়ে।

তখন নির্ভীক আলীবর্দ্দী বলেছিল, সারা বাংলাদেশের ব্যবসাকে তোমরা গ্রাস করছো—মাত্র একলক্ষ টাকা দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছো আমার কাছে। শোন, আমি যা চেয়েছি তা না দিলে তোমাদের আড়ৎ-এর সমস্ত পণ্য বাজেয়াপ্ত করবো। কুঠিতে তালা ঝুলিয়ে দেব—শেষপর্যন্ত জগৎশেঠ-ফতেচাঁদের মধ্যস্থতাতেই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে আলীবর্দ্দী ইংরেজদের বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিল। এসব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘটনা। বহুল প্রচারিত ও বহুপঠিত ঘটনা।

তবুও আলোচনা করছি, এই জন্যে যে ইংরেজীশাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার ঠিক আগে, বাংলার শাসনকর্তাদের ভেতরে একমাত্র নবাব আলীবর্দ্দীই দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন, সারা দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করবে ইংরেজ বনিকরা। তিনিই একমাত্র সুবেদার যাঁর নির্ভীক কণ্ঠস্বর বারে বারে শোনা গিয়েছে—শোনা গিয়েছে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার হুমকি। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর পূর্বসূরী নবাব-বাদশাহদের অনুগ্রহে দেশের সর্বত্র তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশজুড়ে বস্ত্রশিল্পীদের কাঁচা রেশম ও তুলোর পাইকারদের, শস্যবিক্রেতাদের প্রচুর পরিমাণে দাদন দিয়ে

ঋণের দায়ে জড়িয়ে ফেলেছে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের করে তুলেছে তাদের ওপর নির্ভরশীল। তাই তারা আলীবর্দীকে কোনরকমে খুশি করে তার চোখের আড়ালে রাজধানী থেকে অনেক দূরে কি রকম নির্মম অত্যাচার করতো, তার দুএকটা নমুনা এবার আলোচনা করব।

বাখরগঞ্জ থেকে (Sergeant Brego) সার্জেন্ট ব্রেজোর লেখা কলকাতার ইংরেজ গর্ভনরের[২৩] চিঠিটায় তদানীন্তন ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারীতার একটা অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। মিঃ ব্রেজো গভর্ণর তথা এদেশের ব্যবসায়ী ইংরেজদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিল, আপনাদের অত্যাচারে এবং নিপীড়নে এখানকার জনকোলাহলমুখর হাট-বাজার, গঞ্জগুলো খাঁ খাঁ করছে। গরীব কৃষকরা হাটে আর পণ্য আনে না। শহরের বাজারে আসে না তুলো ও রেশমের পাইকার। তারা আপনাদের গোমস্তাদের ভয়ে বহু-বহু দূরের গ্রাম গ্রামান্তরে আত্মগোপন করে রয়েছে! কোম্পানীর গোমস্তাদের এখানকার মানুষ যমের মত ভয় করে। কারণ, তাদের ইংরেজপ্রভুরা এমন প্রশ্রয় দেয় যে তারা বিনা দ্বিধায় এদেশী সরল সহজ ব্যবসায়ী-দের ওপর জুলুম করে জলের দরে তাদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করায়। অন্যদিকে কুঠির পণ্য খুব বেশী দরে কিনতে বাধ্য করে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা তাদের অক্ষমতা জানালে গোমস্তার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। সেপাইদের হুকুম দেয়—লাগাও বেত—যতক্ষণ না কবুল করে। কখনো কখনো গারদখানায় পুরে রাখে, কিংবা সেই অসহায় মানুষগুলোর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। যদিও বা কোন ব্যবসায়ী কোম্পানীকে পণ্য বিক্রি করতে রাজী হয়, তাহলে তার দামটাও বেচারীকে না দিয়ে চলে যায় আপনাদের গোমস্তারা। সময় সময় আবার নিজেদের লোক দিয়ে জিনিস সরিয়ে রেখে, জমিদারের লোক চুরি করেছে বলে রটিয়ে দেয়। আর জমিদারের কাছে থেকে টাকা দাবী করে! আবার কত টাকা দিতে হবে, কেন

দিতে হবে, সেই বিচারও তারা নিজেরাই করে। মোটের ওপর, আপনাদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে তারাই হয়ে উঠেছে গ্রামের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

ঢাকার ট্যাক্স কালেক্টার মহম্মদ আলী কলকাতার গভর্ণরকে চিঠিতে লিখছে: [২৪] আপনাদের কোম্পানীর ছাপ দেওয়া (দস্তক) পণ্য দিয়ে একদল অসাধু ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করছে। তাদের বজরায় ইংরেজদের পতাকা থাকে। আপনাদের ওই দস্তক পারমিটের জন্য কোম্পানীর সাহেবরা প্রচুর টাকা নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত লক্ষ্মীপুর ও ঢাকার কুঠির গোমস্তারা তামাক তুলো, লোহা আরও কিছু খুচরো পণ্য নিয়ে হঠাৎ যে কোন হাটে চড়াও হচ্ছে আর দেশী ব্যবসায়ীদের জুলুম করে বেশি দরে বিক্রি করছে। তাছাড়া তাদের সেপাইদের জন্য জোর করে মোটা বখশিষ আদায় করছে। আপনাদের গোমস্তা আর পাইক বরকন্দাজদের ভয়ে দেশী ব্যবসায়ীরা আর হাটে আসছে না। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মীপুর ফ্যাক্টরীর গভর্ণর আমাদের তহশীলদারের কাছ থেকে জোর করে কয়েকটা খামার নিয়ে নিয়েছে। তার ভাড়া দেয়নি। তারা আমাদের চৌকি, বিভিন্ন গদী লুঠ করছে। গরীব মানুষেব বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সারা অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্র কিষান, মজুর, ব্যবসায়ী যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীপুর, জগদিয়া অঞ্চলের লোকগমগম হাট, ঘাট, গঞ্জ, বাজার জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর শ্মশানে পরিনত হয়েছে।

অসাধু উপায়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের অর্থ রোজগার করতে হতো কেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে নীচে তাদের মাসিক বেতনের এক তালিকা থেকে। ১৭৫৬ সালে ঢাকা কুঠির কর্মচারীদের হিসাব—

নাম	নিয়োগের তারিখ	বেতন*	পদ	বয়স
রিচার্ড বিচার	২. ৮. ১৭৪৩	৪০ টাকা	অধ্যক্ষ	৩৫
উইলিয়াম সামার	২৫.১১.১৭৪৫	৪০ „	সহ-অধ্যক্ষ	২৬
লুক স্ক্রেফটন	২৫.৯.১৭৪৬	৩০ টাকা	সহকারী (১)	২৬
টমাস হাইওম্যান	১৬.৯.১৭৪৯	১৫ „	„ (২)	২৪
সামুয়েল ওয়ালার	„	১৫ „	„ (৩)	২৬
জন কার্টিয়ার	২৫.৯.১৭৫০	১২ „	„ (৪)	২৪
জন জনস্টন	৯.৭.১৭৫১	৫ „	„ (৫)	২৫

ভ্যান্সিটার্টের বিবরণে (Original papers etc. Vol 1. p. 5 Vansittart's Narative) দেখা যাচ্ছে, এক ইংরেজ গোমস্তা কেভালিয়ার (Chevalier) চিলমারীতে (রংপুরে) নৌকা বোঝাই করে লবন নিয়ে হাজির হয়েই সমস্ত দেশীয় লবন ব্যবসায়ীদের ওপরে পরোয়ানা জারী করছে—তার লবন পুরোপুরি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত কোন 'নেটিভ' লবন বেচতে পারবে না—জমিদারের ট্যাক্সকালেক্টার হা হা করে ছুটে এল, চোখ উল্টে তাকে কেভালিয়ার বলল, তোমাদের কোন কর্তৃত্ব আমি মানি না।

ইংরেজদের নৃশংশ অত্যাচারের উদাহরণ এত অজস্র আছে যে সেই বিষয়ের ওপরেই একটি গ্রন্থ হতে পারে। আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের দুর্নীতি, অর্থলোভ, বিদেশী বণিকদের নজরানা অর্থাৎ ঘুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সাগরপারের ব্যবসায়ীদের যে এদেশে

---

* মাসিক মাইনে অত্যন্ত কম বলেই কোম্পানী তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে অনুমতি দিত। আর সেই সূত্রেই তারা কেউ কেউ অসৎ পথ অবলম্বন করতো।

প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের একদা সমৃদ্ধ ব্যবসাবাণিজ্যের কবর খুঁড়েছিল সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বাঙলার বাণিজ্যের ইতিহাসে এদেশের সর্বপ্রথম 'ব্যাঙ্কার' জগৎশেঠের নাম উল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জগৎশেঠ একটা উপাধি[২৫]। দিল্লির বাদশা ফারুকশায়ার (১৭২২) ফতেচাঁদকে সম্মানিত করে এই উপাধি প্রদান করেছিল। কে এই ফতেচাঁদ? তার উত্তর খুঁজতে হলে যেতে হবে সেই সুদূর অতীতে যখন এই শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত শেঠ বংশের হীরানন্দ সাহু রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুর থেকে অন্যান্য মাড়োয়ারী বণিকের মত এসেছিল গৌড়ে ভাগ্যান্বেষণে। হীরানন্দের সাতটি পুত্র সারা উত্তর ভারতবর্ষে হুণ্ডী আর মহাজনী কারবার করে প্রভূত বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। ফতেচাঁদ হলো হীরানন্দেরই এক পুত্র মাণিকচাঁদের দত্তকপুত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে ফতেচাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেকালে নিয়ম ছিল, দেশের সমস্ত জমিদারদের রাজস্ব জমা দিতে হতো ফতেচাঁদের কাছে। তারপর ফতেচাঁদের মারফৎ বছরে দেড় কোটি টাকার ট্যাক্স যেত দিল্লীতে। তার কাছে হাত পাততো নবাব, হাত পাততো বিদেশী বণিকরা।

পলাশীর যুদ্ধের বছর (১৭৫৭) খৃষ্টাব্দে শতকরা নয় টাকা সুদে ওলন্দাজরা নিয়েছিল[২৬] চার লক্ষ টাকা, এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল ফরাসীরা। শেঠ পরিবার ছিল সেকালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত। তারা দেশের সমস্ত মুদ্রার কোষাধ্যক্ষ এবং আদায়কারী। তারাই ছিল মুর্শিদাবাদের টাকশালের কর্তা। তাদের অর্থের প্রাচুর্য এত ছিল যে ইংরেজরা যত চাঁদি (bullion) আমদানী করতো, সে সব ক্রয় করতে পারতো। সেই রূপো টাক-শালে দিয়ে টাকা তৈরি করতো এবং সেই বেঙ্গল সিক্কাটাকা, মাদ্রাজী

টাকার ওপরে বাট্টা এবং সুদের হার স্থির করতো তারাই। লিউক[২৭] স্ক্র্যাফ্‌টনের মতে বাট্টা থেকেই তার আয় হতো—বছরে সাত আট লক্ষ টাকা। মুতাক্ষরীনে আছে, ভারতবর্ষে তাদের মত বিত্তশালী আর কোন ব্যাঙ্কার ছিল না। No such bankers were ever seen in Hindusthan and Deccan, nor was there any banker or merchant that could stand a comparison with them all over India.

গঙ্গার মোহনাও নাকি তারা শুধু কাঁচা টাকা দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতে পারতো, মুর্শিদাবাদের স্থানীয় ইতিহাস একথাও বলে; বলা বাহুল্য, নবাবকে সর্বদা তার ওপর নির্ভর করতে হতো।

শ্রেষ্ঠীর নির্দেশে রাজকীয় অনুশাসন চলতো। তাদেরই কৃপায় যেমন—১৭২৫—১৭৩৮ সুজাউদ্দীন দীর্ঘ চোদ্দ বছর নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেছিল তেমন তাদেরই চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত হয়েছিল নবাব সরফরাজ খাঁ, (১৭৩৯)। আবার আলীবর্দ্দীর (১৭৪০—৫৬) সুশাসনের খ্যাতির আড়ালেও ছিল এই ধনকুবের ফতেচাঁদ।

ফতেচাঁদের মৃত্যু হলো ১৭৪৪ অর্থাৎ আলীবর্দীর রাজত্বকালে। এই ফতেচাঁদের দুই দৌহিত্র স্বরূপচাঁদ এবং মহাতাবচাঁদ, জগৎশেঠই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার সেই ঘৃণ্য কুচক্রান্তের আর বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম নায়ক। সিরাজদৌল্লা ছিলেন স্বাধীনচেতা আর মাতামহের মতই নির্ভীক এবং বলা বাহুল্য ইংরেজ-বিদ্বেষী।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আলীবর্দী উপদেশ দিয়েছিলেন[২৮]—শোন ইংরেজদের সঙ্গে কোন বিরোধ করো না—দেখ, সবুজঘাসে ছেয়ে থাকা মাঠে যদি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দাও তাহলে আবার প্রাণের চিহ্ন দেখা দেবে—দেখা দেবে সবুজ ঘাসের শীর্ষ···কে জানে হয়তো মৃত্যু পথযাত্রীর স্তিমিত দুটো চোখের সামনে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল সেই অনাগত দূর-বিসর্পিল

ভবিষ্যতের ছবি। হয়তো দৌহিত্রের চারদিকের পঙ্কিল পরিবেশ, তার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের বিরূপতা আর ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন, হয়তো তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতেও পেরেছিলেন, সবুজ তৃণের মতই অফুরন্ত আর অজেয় প্রাণশক্তি নিয়ে এসেছে সাগরপারের এই ধূর্ত ইংরেজ বণিকরা। কিন্তু সিরাজের পক্ষে মাতামহের এই উপদেশ পালন করা সম্ভব হয় নি। ইংরেজদের সেই দস্তক বা অনুমতিপত্রকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। পরিষ্কার বললেন, তোমরা ফরমানের অবমাননা করছো,—আক্রমণ এবং অবরোধ করে ফেললেন ইংরেজদের কলকাতার ঘাঁটি। এই কলকাতা আক্রমণের ঠিক এক বছর দুই মাস পরে ২৩শে জুন, ১৭৫৭ সালে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল পলাশীর আমবাগানে। সেই নিবিড় আম্রকুঞ্জে স্বাধীনতার সূর্য একবার শেষবারের মত ঝলসে উঠেই গভীর কলঙ্কের বেদনার ভেতরে ডুবে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে নেমে এসেছিল বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যপুষ্ট ব্যবসাবাণিজ্যের ওপরে অন্ধকারের যবনিকা।

চতুর্দশ প্রবাহ

ইংরেজদের নৃশংস এবং বীভৎস অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বাংলার ভুবন বিখ্যাত রেশম শিল্প।

—উইলিয়ম বোল্টস

এই অধ্যায়ে বাঙালীর বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য অর্থাৎ শিল্পসামগ্রীর আলোচনা করবো। বাণিজ্যের ইতিবৃত্তের সঙ্গে শিল্পের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি আর একটির পরিপূরকও বলা যায়। বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বস্ত্রশিল্প। সেই আদিপর্ব থেকে যার জয়গান গাওয়া হয়েছে, প্লেরিপ্লাস-প্লিনি-হেরোডোটাস যার সুখ্যাতি করেছে, সেই বস্ত্রশিল্পের ভেতরে কয়েকটি পৃথিবীবিখ্যাত বিশেষ ধরনের বস্ত্রের বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

মসলিন[১] :

জগৎপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য কার্পাসজাত বস্ত্র। 'মসলিন' নামকরণ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে, ইংরেজরা বহুযুগ পূর্বে মাদ্রাজের 'মসলীপত্তম' বন্দর থেকে মসলিন নিয়ে যেত বলেই একে ওই নামেই অভিহিত করা হয়। আবার কারো বিশ্বাস, মুসলমান সওদাগররা বাংলা থেকেই এই বস্ত্র সেই সুদূর তুরস্কের রাজধানী মোগলনগরে নিয়ে যেত। তাই এর নাম হয়েছে মসলিন।

জাহাঙ্গীর-মহিষীর প্রিয় এই মসলিনকে কেন্দ্র করে সেই বিশ-হাত দীর্ঘ মলমলকে পাখির পালকের মত উড়িয়ে দেওয়া, ট্যাভার-নিয়ারের স্বচোক্ষে দেখা ষাটহাত দীর্ঘ মসলিনকে অতি ক্ষুদ্র নারকেলের মালাইয়ের ভেতরে পুরে রাখা; একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাট হাত লম্বা মলমলের ওজন চার তোলা, বিশ হাত দীর্ঘ

আর আধ গজ চওড়া একখণ্ড মসলিন একটা আংটীর ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পার করিয়ে দেওয়া, আর আবরোয়ান (স্বচ্ছ) মসলিন পরার জন্য ওরঙ্গজেবের কন্যাকে ভৎসর্না—এসব বহুল প্রচারিত কাহিনী। যুগযুগান্তর ধরে এই সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভারকে ভিত্তি করে আরও কত কাহিনী, কত কিংবদন্তী যে ছড়ানো রয়েছে।

নীচে বিভিন্ন প্রকারের মসলিনের ভেতর মাত্র কয়েকটির বিবরণ এখানে বলা হলো :—

(১) ঝুনা :—হিন্দি ঝুনা (সূক্ষ্ম) থেকে ঝুনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এটা দেখতে মাকড়সার জালের মত। টেলর সাহেব[২] তো মুগ্ধ হয়ে বলেইছেন মানুষের নয়, এটা নিশ্চয়ই "Work of Fairies". পরীর কাজ। দীর্ঘ ২০ গজ × প্রস্থ ১ গজ—ওজন ৮॥ আউন্স।

ঝুনা (মসলিন) কেমন করে যেন একখণ্ড জোগাড় করেছিল এক ধর্মযাজিকা! ইতিহাসে তার নামও আছে গৎ-সিঙ্-ডাগা-মো—

গৎ-সিঙ্-ডাগা-মো এক শুদ্ধাচারী ভিক্ষুনী। পরনে সন্ন্যাসিনীর পোষাক। মুখে আরাত্রিক পবিত্রতা। হঠাৎ একদিন রাজপথে দেখতে পেয়েছিল এক সুবর্ণশ্রেষ্ঠীর নন্দিনী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিক্ষুনী। ছিঃ ছিঃ একী বস্ত্র পরেছে এতবড় শ্রেষ্ঠীর দুলালী। কাকচক্ষু জলের মত স্বচ্ছ সুদৃশ্য শাড়ির আড়ালে যৌবনভারে পুষ্ট বরতনুর আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন কালো ছায়া ছায়া রঙ জলের নীচে দেহলতা তরল অগ্নিধারার মত জ্বলছে! ভিক্ষুনীর মনে হলো সেও তো তরুণী। এরকম শাড়ী পরলে তাকে কেমন মানাবে। অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে সেই সুবর্ণশ্রেষ্ঠীর কাছে প্রার্থনা করলো একটা ঝুনা মসলিন! শ্রেষ্ঠীর বদান্যতার খ্যাতি ছিল। দান করলেন সুদৃশ্য সেই বস্ত্রসম্ভার।

তরুণী ভিক্ষুনীর চোখদুটো লোভের আভায় উজ্জ্বল হয়ে

উঠলো। বেশ পরিপাটি করে তার তন্বীদেহ পেঁচিয়ে পরল সেই শাড়ী। আয়নায় নিজের বিচিত্র রূপের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা নেশার মত আবেশে তার চেতনা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল।.

কিন্তু মঠের প্রধান শ্রমনের চোখ পড়ল, ভিক্ষুনীর পরিধানে সেই লজ্জাজনক শাড়ি।

—থামো—কোথায় যাচ্ছ?

—কেন মঠে?

—না।

—কেন?

—শীঘ্র পরিত্যাগ করো—পরিত্যাগ করো এই শাড়ি। ভিক্ষুনীর মুখখানা করুণ হয়ে এল। চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়ল। নিঃশব্দে মঠের ভেতরে নিজের কক্ষে গিয়ে পরিধেয় পরিবর্তন করল।

আর প্রধান শ্রমন ঘোষণা করে দিলেন গ্রামে গ্রামান্তরে কোন ভিক্ষুনীর পরিধানে যেন কখনো এই স্বচ্ছ সুদৃশ্য মসলিন বস্ত্র না দেখা যায়।

এই কঠোর ঘোষণার আড়ালে মসলিনের খ্যাতির সৌরভ আরও দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

এই আস্বচ্ছ, সূক্ষ্ম মসলিন টেলার সাহেবের মতে পরীদের সৃষ্টি ঝুনাকে ভিত্তি করে এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী লেখা আছে—তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ দুলভায়[৩]।

(২) সরকারআলি—শুধু নবাবদের জন্যেই প্রস্তুত হতো। আর দিল্লীর বাদশাদের যখন নজরানা দেওয়া হতো তখন তার ভেতরে খুব কোমল এবং নিবিড় সন্নিবিষ্ট সূত্র সমন্বিত মলমল এই "সরকারআলিই" ছিল প্রধান। দৈর্ঘ ১০ গজ × প্রস্থ ১ গজ ওজনে ৪ আউন্স কি ৪॥ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

(৩) খাসা—পারসী শব্দ "খাসা" থেকে এই মলমলের নামকরণ হয়েছে।

(৪) ঢাকার সোনারগাঁও অঞ্চল উৎকৃষ্ট খাসা মলমলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ওজন ১০॥ থেকে ২১ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০ থেকে ২৮০০।

(৫) শবনম্ এই সুদৃশ্য বস্ত্র ছিল ভোরের শিশিরের মত কোমল আর স্বচ্ছ। ঘাসের উপর বিছিয়ে দিলে শিশিরের মতই ঝলমল করতো। দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ১০ থেকে ১৩ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৩০০।

(৬) আবরোয়ান—কাকচক্ষু জলের মত স্বচ্ছ এই অপূর্ব সুন্দর বস্ত্রের দৈর্ঘ ২০ গজ এবং ১ গজ প্রস্থ। ৯ থেকে ১১॥ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৪০০।

(৭) আলাবাল্লে—পেরিপ্লাস এই বস্ত্রকে বলেছে abollai দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ৯৸০ থেকে ১৭ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১১০০ থেকে ১৯০০।

(৮) তঞ্জেব—পারসী ভাষায় তন অর্থে শরীর আর জেব হলো অলঙ্কার। দেহের অলঙ্কার। দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ১০ থেকে ১৮ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

(৯) তুরন্দাম—আরবীতে তুরে'র মানে রকম। আর পারসী ভাষায় উদামের অর্থ হলো নগ্নতা। এই সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র পরলে মনে হতো পরিধানে কিছু নেই। দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ১৫ থেকে ২৭ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১০০০ থেকে ২৭০০।

(১০) নয়নসুখ—এই অপূর্ব বস্ত্রসম্ভারের দৈর্ঘ ২০ গজ × ১॥ গজ প্রস্থ। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০ থেকে ২৭০০।

(১১) বদনখাস—নয়নসুখের মত এর সুতোগুলোও ঘন সন্নিবিষ্ট। দৈর্ঘ ২৪ গজ × ১॥ গজ প্রস্থ। ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০।

(১২) সরবন্দ—শির (মস্তক) আর বন্দ অর্থে বাঁধা। এই কাপড়ে থেকে পাগড়ী তৈরী বা শিরস্ত্রাণ হতো। দৈর্ঘ ২৪ গজ × ১॥ গজ প্রস্থ। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২১০০ থেকে ২১৯৫।

(১৩) সরবতি—'সরবতি' শব্দের অর্থ মোচড়ানো। এই কাপড় থেকে পাগড়ী হতো। দৈর্ঘ-প্রস্থ-ওজন-সূত্র সংখ্যা সরবন্দের মতো।

(১৪) কুমীস—কুমীস (আরবী) থেকে কামিজ বা সার্ট। এই কাপড় থেকে মুসলমানরা কোর্ত্তা প্রস্তুত করতো। দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ। ১০ আউন্স ওজন। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০।

(১৫) ডুরিয়া—ডুরিয়া নামকরণের কারণ হলো, দুটো সুতো একত্রে পাকিয়ে তানা প্রস্তুত করা হতো। সেই তানা থেকে তৈরি হতো এই কাপড়। বহু রকমের 'ডুরিয়া' বস্ত্র প্রস্তুত হতো যেমন ডোরাকাটা, রাজকোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, কলাপাতা ইত্যাদি দৈর্ঘ ২০ গজ × ১ গজ প্রস্থ।

(১৬) চারখানা—এই বস্ত্র বিভিন্ন রঙের তৈরি হতো—তৈরি হতো বহু রকমের। যেমন নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতরখোপা, সাকুতা, বছাদার, কুণ্ডিকা।

(১৭) জামদানী—মসলিনের রাজ্যে রাণীর মহিমা বিরাজ করতো এই সুদৃশ্য বস্ত্র জামদানী। বাংলার বস্ত্রের শিল্পীদের এক যুগান্তকারী সৃষ্টি জামদানী। পুরোপুরি মোগল সরকার তথা নবাবের কর্তৃত্বাধীনে তৈরি হতো এই ভুবনবিখ্যাত বস্ত্রসম্ভার। এরই আর এক নাম মলমলখাস। দেশজুড়ে যত সুনিপুণ কারিগর ছিল তাদের নাম ঠিকানা লেখা থাকতো মলমলখাস কুঠির দারোগার রেজিস্ট্রি বইতে। যেই জামদানী তৈরির মরসুম আসতো অমনি নবাবের সেপাইরা ছুটতো জামদানী শিল্পীদের বাড়িতে বাড়িতে। ডেকে নিয়ে আসতো তাদের। সারি বেঁধে সুতো কাটতে বসিয়ে দেওয়া হতো তাদের। আর মলমলখাস কুঠির দারোগা মাঝে মাঝে টহল দিয়ে দেখত, ঠিক ঠিক কাজ হচ্ছে কি না। এই প্রসঙ্গে বিদেশী

ঐতিহাসিক বলেছেন[৪] "সহজাত নিপুণতায় যে শিল্পী খুব দ্রুত সময়ে বেশি পরিমাণে সুতো কাটতে পারতো তাকে দিয়ে আরও বেশি করে সুতো তৈরি করিয়ে নিত আর মজুরীর বেলায় কার্পণ্য করতো। সুতো কাটা থেকে তাঁতে বোনা পর্যন্ত এই সময়টা তারা অসহায় বন্দীর মত জীবনযাপন করতো।"

কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও দূর দূর গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে যে শিল্পীরা জামদানী তৈরি করতো তাদের ছপ্পা জামদানী নামে একটা ট্যাক্স দিতে হতো। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দিকে দিকে ছড়ানো কারিগরদের হদিস করতে পারতো না বলেই বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যবসাদারেরা দালালের শরণাপন্ন হতো। আবার সময় সময় জামদানীর শিল্পীদের অগ্রিম টাকা অর্থাৎ দাদন দেওয়া হতো। দাদন দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার যে প্রথা নবাবী আমলে প্রচলিত ছিল কোম্পানীর আমলে ইংরেজেরা তাকে পুষ্ট করে তুলেছিল। এই দালালী আর দাদনী ব্যবস্থার সূত্র ধরে কেমন করে বাংলাদেশের এই প্রাচীনতম ও গৌরবোজ্জ্বল শিল্প একটু একটু করে ধ্বংস হয়েছিল তার মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন আর এক ইংরেজ। কিন্তু তার আগে একটু বলা দরকার, কোম্পানীর পূর্বে এই বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল।

স্মরণাতীতকাল থেকেই এদেশের বস্ত্রশিল্পীরা ঘর গেরস্থালীর ফাঁকে ফাঁকে মনের আনন্দে নিপুণ অঙুলিবিন্যাসে নির্ভুল ছন্দে যতিতে ঠিক ঠিক জায়গায় কাঠির সাহায্যে ফুল তুলে তুলে তৈরি করতো বহু রকমের জামদানী। তারা তৈরি করতো জোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তৈরি করতো তেরছা, পান্নাহাজার, দুবলিছাল, ডুরিয়া, গেদা আর সাবুরগা। এই অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার তারা যার কাছে খুশি বিক্রি করতো। আলীবর্দীর আমলে (১৭৪০-১৭৫৬) একজন বিদেশী ভদ্রলোক তার বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ৮০০টি জামদানী বস্ত্র কিনেছিলেন—ইতিহাসে তার অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে।

তখন না ছিল নবাবের পাইকের হুমকী, না ছিল কোম্পানীর গোমস্তাদের রক্তচক্ষুর কুটিল ভ্রুকুটি। কেম্পানীর আমলে শুরু হলো তাদের দালালের অত্যাচার। কুঠিয়াল সাহেবরা কাপড়ের জন্য দালালদের সঙ্গে চুক্তি করতো। কোম্পানীর দালালরা বস্ত্রশিল্পীদের দাদন দিত। গরীব শিল্পীরা প্রায়ই অভাবের দায়ে আগাম টাকা খরচ করে ফেলতো আর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করতে পারতো না। আর পরিণাম হতো ভয়াবহ। দাদনের টাকা খরচ হয়ে যাবে ভয়ে জামদানীর শিল্পীরা আর আগাম নিতে রাজী না হলে শুরু হতো তাদের ওপরেঅকথ্য অত্যাচার। জেল জরিমানা, বেত্রাঘাত, ভিটেমাটি ক্রোক করা, ঘরে আগুন দেওয়া, কিছুই বাদ দিত না যে ইংরেজরা তাদেরই সগোত্রীয় আর একজন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কি কি লিখে রেখে গিয়েছেন—সেটা তাঁর জবানীতেই পড়ুন[৫]। Every kind of oppressions to manufacturers of all denominations through out the whole Country ...frequently seized, imprisoned in irons, flogged and deprived in the most ignominious manner. আর এইখানেই আছে, তন্তুবায়দের আঙুল কাটার সেই বহুপ্রচলিত ও জনপ্রিয় কাহিনীর নেপথ্য ইতিহাস। (They) have been treated also with such injustice that instances have been known of their cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk...এত তীব্র অত্যাচার করতো যে শিল্পীরা নিজেরাই আঙুল কেটে ফেলে কাপড় বুনতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করতো। আর এইভাবেই সেই হতভাগ্য শিল্পীরা কোম্পানীর সাহেবদের সেই ভয়াবহ নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতো। এই অত্যাচারের পরিণাম কি হয়েছিল? যে ইউ-রোপীয় ভদ্রলোক তার দরজায় দাড়িয়ে আটশোটি মসলিন বস্ত্রখণ্ড কিনেছিলেন তিনিই স্বচোক্ষে দেখেছিলেন, কুঠিয়াল সাহেবদের

নৃশংস অত্যাচারে ঢাকার জঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের সেই স্বনামধন্য পান্না-হাজার, শবনম, নয়নসুখ ইত্যাদি মসলিনের শিল্পীরা তাদের সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে ছেলেমেয়ে বৌয়ের হাত ধরে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে—পালিয়ে যাচ্ছে কোম্পানীর কুঠির এলাকা থেকে দূরে—বহু দূরে ; পালিয়ে যাচ্ছে লালমুখো যমদূতগুলোর নাগালের বাইরে। বিদেশী ভদ্রলোক প্রায় সাতশো পরিবারকে চলে যেতে দেখেছিলেন।...Seven hundred families of weaver in the Village round Junglebary have left their houses ...তখন নবাবী শাসন শিথিল হয়ে এসেছে। সিরাজদৌল্লার চারিদিকে ঘনীভূত চক্রান্তের আভাস। ঠিক এই সময়েই কোম্পানীর সাহেব-গোমস্তা দালাল সেপাইদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো নির্জন শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করতে লাগল। আর হারিয়ে গেল মসলিনের শিল্পীরা, হারিয়ে গেল চিরকালের মতো বিস্মৃতির অতলান্তে।

বাংলার উর্বরা মাটিতে কার্পাসের সর্বনাশা প্রাচুর্য, বাংলার শিল্পীদের সহজাত অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের সূত্র ধরেই নেমে এসেছিল বাংলার বস্ত্রশিল্পের অভিশাপ।

মসলিন ছাড়াও নিম্নলিখিত বস্ত্রের খ্যাতি ছিল। এই পণ্যের রপ্তানী থেকেও বাংলায় যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা আসতো। বাফতা, বুন্নি, একপাট্টা ও জোড়, হাম্মাম, লুঙ্গী, কসিদা ইত্যাদি বস্ত্র প্রচুর রপ্তানী হতো দেশদেশান্তরে। বাফতা থেকে হতো জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ, শাল, হামাম থেকে গামছা আর কশিদা থেকে বস্ত্রের সুনিপুণ শিল্পীরা তৈরি করতো বুটিতোলা মসলিন, কটউরঙ্গী, নৌবেত্তি, আজিজুলা, দোছক। বলাবাহুল্য, এইসব বস্ত্রের শিল্পীরাও গোমস্তা দালাল দাদন এবং তীব্র অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

বস্ত্রশিল্পের প্রসঙ্গেই বাংলার সুনিপুণ কাটুনীদের কথা এসে পড়ে। তুলো থেকে যারা সুতো প্রস্তুত করে চলতি ভাষায় তাদের

বলা হতো কাটুনী। বাঙালী মেয়েদের সূক্ষ্ম সুতো কাটার পটুত্ব ছিল বহুযুগের। সবচেয়ে মিহি সুতো প্রস্তুত করতে পারতো হিন্দু ঘরের আঠারো থেকে ত্রিশ বছরের তরুণীরা। The best spinners were the Hindu Women from eigteen to thirty of age.[৬] ত্রিশের পর তাদের ললিত অঙুলিবিন্যাসের নিপুণতার পড়তো ভাটার টান, দৃষ্টি হয়ে আসতো ক্ষীণ তখন আর তারা মিহি সুতো কাটতে পারতো না। আর এই সুতো থেকে কাপড় বোনা শুরু হতো কখন, এক ইংরেজ ঐতিহাসিক[৭] সেকথাও বলেছেন—যখন ভোরের অন্ধকার আবছায়া কালো একটা চাদরের মতো চারিদিকে ছড়ানো থাকতো, যখন হু হু করে ভিজে ভিজে বাতাস বয়ে যেত তখন মেয়েরা বসে যেত তকলী আর চরকি নিয়ে সুতো কাটতে। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের তরল অন্ধকারকে অপসারিত করে দিনের প্রখর আলো যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি, বাতাসে যখন উত্তাপের রেশ ফোটে নি তখন সুতো কাটার কাজে বসার কারণ ভোরের শীতল পরিবেশে সুতো ছিঁড়ে যেত না। বলাবাহুল্য খুব মিহি সুতো বেশি পরিমাণে তৈরি করতে পারতো সেই ভোর থেকে সারা সকাল বেলা বাড়ার আগে পর্যন্ত। প্রতিদিন গড়ে তিন গ্রেন মিহি সুতো তৈরি করতো। আবার দেখছি, সেকালের কাটুনীরা চার সের তুলো থেকে কি পরিমাণ সুতো প্রস্তুত করতে পারতো তার একটা হিসাব। সুপারফাইন ৬ ছটাক; ফাইন ৬ ছটাক, মাঝারি ৮ ছটাক আর সাধারণ ১২ ছটাক। এই তুলো থেকে সুতো কাটার কাজটা সাধারণত উচ্চবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ঘরের মেয়ে-দের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের নরম চম্পকাঙুলীর ললিত ছন্দে যে মিহি সুতো তৈরি করা সম্ভব হতো—তা চাষী মেয়েরা পারতো না। অত্যধিক পরিশ্রমে তাদের আঙুলে কড়া পড়ে যেত আর আঙুলগুলো হয়ে যেত মোটা। আর এক ইংরেজ ঐতিহাসিকের সুযোগ হয়েছিল বাংলার এই স্মরণাতীতকালের কুটিরশিল্পকে

সামনে থেকে দেখার। তাঁর জবানীতেই শুনুন[৮] : The women spin the thread designed for the cloths then deliver it to the men, who have fingers to model it as exquisitely as those have prepared it...The rigid clumsy fingers of an European would scarcely be able to make a piece of canvas with instruments which are all an Indian employs in making a piece of cambric or musline. তার স্বজাতি গোত্রীয়দের মোটা মোটা আর কর্কশ হাতে যে সেই সুতো তৈরি করা একেবারেই সম্ভব নয়, সেকথাও স্পষ্ট স্বীকার করেছেন তিনি। আবার একজন ইংরেজ উচ্ছসিত হয়ে বলেছেন, বাঙালী মেয়েরা যুগযুগান্তর ধরে বংশানুক্রমিক ধারায় যে সহজাত পটুত্বে মিহি সুতো তৈরি করতো বহুযুগের এপারে এসে বস্ত্রশিল্পের ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরাও তা কল্পনাও করতে পারতো না।

হিন্দু মহিলাদের এই বিস্ময়কর নিপুণতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত অজস্র কাহিনী আর কিংবদন্তী। কিন্তু কিংবদন্তীর জন্ম হয় কোন একটা ঐতিহাসিক সত্যকে অবলম্বন করে। তাই ইতিহাসে লিখছে[৯] "মাত্র আধসের তুলো থেকে ১২৫ ক্রোশ দীর্ঘ সুতো প্রস্তুত করতে পারতো হিন্দু মেয়েরা"—সে সুতো যেমন সূক্ষ্ম তেমনি মিহি। ইতিহাসের এই সত্যটিকে ভিত্তি করে এক কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে, কোন সুবেদার নাকি বাঙালী অষ্টাদশী তরুণীর এই সহজাত কুশলতাকে বিশ্বাস করে নি। সে একদিন দরিদ্র এক গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে এল গ্রামে। ঘরে ঘরে মেয়েরা সুতো কাটছে। ভোরের অন্ধকার ঝিকমিক করছে। বিশাল মাঠে কাঠি পুঁতে পুঁতে তার মাথায় মাথায় যে সুতো বেঁধে রোদে মেলে দেওয়া হয়েছে সেই সুতোকে অনুসরণ করে সুবেদার চলতে লাগল। পথ আর ফুরায় না। ফুরায় না সেই মিহি সুতো। বেলা

বাড়ে। রোদে তার মাথার চাঁদি জ্বলে যায়। তবুও থামে না সুবেদার। শেষ পর্যন্ত তার জেদ চেপে যায়, দেখতে হবে কতদূর-কতদূর গিয়েছে—কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সুতো? তার কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। চোখে পড়েছে ক্লান্তির ছাপ। এমন সময় এক গ্রামবৃদ্ধ তাকে বলেন, কেন বৃথা চেষ্টা করছেন, শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন না—

কেন?

এই যে সুতো দেখছেন এটা কদ্দূর গেছে জানেন, একশো পঁচিশ ক্রোশ!

রেশম

বাঙালীর আর একটি প্রাচীনতম ব্যবসা—সিল্ক বা রেশমের কাপড়ের ব্যবসা। বাংলাদেশে রেশমের ব্যবসার আলোচনায় পৃথিবীর দেশান্তরে তার বিবর্ত্তনের ইতিহাস আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সিল্কের আদি ইতিহাস আলোচনা করতে হলে চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে।

যখন (৯০৭ খৃষ্টপূর্ব) মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্য 'ইলিয়ড' রচনা করেছেন, তখন কিন্তু তিনিও জানতেন না পৃথিবীতে সিল্কের অস্তিত্ব। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হেরোডোটাস (৪১৩ খৃষ্টপূর্ব) যাঁর সঙ্গে অনেক অভিজাত মিশরীয় এবং পারসিকের যথেষ্ট আলাপ ছিল, তাঁরও অজ্ঞাত ছিল এই বিলাসের পণ্য—সিল্ক।

তারপর এল খৃষ্টপূর্ব সন ৩৫০। এইসময় জগতের আদিমতম বিজ্ঞানগুরু এ্যারিস্টটলের অভ্যুত্থান হলো। সিল্কের ইতিহাসে লেখা আছে…[১০]

The most ancient naturalist, Aristotle gives the account of silkworm. He describes it as a worm, that it passes through several trasformations in the course of six months ...

রেশমগুটির পোকা থেকে যে সিল্ক উৎপন্ন হয়, সেই রহস্যের কথা এ্যারিস্টটলই প্রথম পৃথিবীবাসীকে শুনিয়েছিলেন।

ডায়োনিসিয়াস্ গ্রীসের বিখ্যাত ভূগোলবিদ। ভূগোলশাস্ত্রে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত এবং অভূতপূর্ব। ডায়োনিসিয়াসকে অগস্টাস পাঠিয়েছিলেন পৃথিবী পর্যটনে। সময়টা ছিল সন ১৪ খ্রীষ্টাব্দ। তার ওপরে সম্রাট অগস্টাসের আদেশ ছিল, সমগ্র প্রাচ্য দেশের একটা ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা করে দিতে হবে। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্যের ভূগোল লিখেছিলেন! ইউরোপের মানুষকে তিনিই জানিয়েছিলেন, প্রাচ্যের মাঠে মাঠে আশ্চর্য একরকমের গাছ জন্মায়। সেই গাছে রেশমগুটি হয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে থাকে সেই কীট। এই গুটি থেকে এক আশ্চর্য সুন্দর সিল্ক তৈরি করে ওদেশের লোক। সেই বস্ত্র একমাত্র অসাধারণ বিত্তশালী ও সৌভাগ্যবতী মুষ্টিমেয় মহিলারাই পরতে পারেন…

That the use of it was restricted to a few women of the greatest fortune, what it's price was…we are not informed, but it must have been extremely high··

৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের রেশম করোমণ্ডল উপকূল বেয়ে দাক্ষিণাত্য হয়ে রোমে যেত। রোম এবং পারস্যের কাছে থেকে আবার এই বিচিত্র পণ্য কিনতো প্রাচীন দিনের ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের ছোট একটা দেশ ফিনিসিয়া। ফিনিসিয়রা না কি প্রাচ্যের দেশ থেকে আমদানী করা কাঁচা সিল্ক থেকে বস্ত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া জানতো। কিন্তু এই কাঁচা রেশমের জন্য পারসিক সওদাগরদের অনেক বেশী মূল্য দিতে হতো তাদের।

সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এক পাউণ্ড ওজনের রেশমের সুতো আটটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনেছিলেন শোনা যায়। জাষ্টিনিয়ানের ছিল রেশমের

ওপরে প্রবল আকর্ষণ। তার নিজের দেশে রেশমের উৎপাদনের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। বহু চেষ্টার পর দুইজন পারসিক পুরোহিতের মাধ্যমে রেশমের জন্মরহস্য এবং রেশমের সুতো থেকে সুদৃশ্য বস্ত্র তৈরির প্রণালী জানতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ভেতরে একমাত্র অ্যারিষ্টোটলের দেশ গ্রীসই জানতো রেশমের ব্যবহার স্মরণাতীতকাল থেকে। সিসিলির রাজা রজার একবার এথেন্স শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে আসার সময়ে কিন্তু বিপুল অর্থ সম্পত্তির সঙ্গে রেশমের শিল্পীদের আনতে ভোলে নি। যুদ্ধবন্দী এই রেশমের কারিগররা কারাগারে বসে সিসিলির মানুষদের শিখিয়েছিল রেশমের গুটি থেকে সিল্কের সুতো আর সেই সুতো থেকে সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার তৈরির বিচিত্র রহস্য। সারা পৃথিবীর দেশ থেকে দেশান্তরে রেশমের জয়যাত্রার ইতিহাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক।

বাংলাদেশের রেশমের বিপুল প্রাচুর্যের খবর জানতে পেরেছিল ইংল্যাণ্ড সেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দেই। তার আগে রেশমের জন্য তারা নির্ভর করতো তুরস্কের ওপরে। কিন্তু তুরস্কের রেশমের খরচ অত্যন্ত বেশি পড়তো। ইংরেজ বণিকরা যেই বেঙ্গল সিল্ক রপ্তানী করতে শুরু করল অমনি হু হু করে বাড়তে লাগল তার চাহিদা। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাঁচা সিল্ক রপ্তানী হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। ১৬০০ থেকে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই নব্বই বছরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রেশম কিনেছিল বাংলাদেশ থেকে।[১১] বলাবাহুল্য, রেশম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশেরও জেলায় জেলায় মালবেরী গাছের (যার পাতায় রেশম কীট থাকে) চাষও বেড়ে গিয়েছিল। ঘরে ঘরে মেয়েপুরুষ শিশু-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে রেশম-কীট বা পলু—নানারকমের পলু, বড় পলু, বিলেতী পলু, নিস্তারী পলু, মাদ্রাজী বা কেনারী পলু পরমযত্নে লালন করতো। সেই পলুর

কোষ বা কোয়া থেকে কাটতো সুতো। একজন এক গামলা গরম জলের ভেতরে কতগুলো কোয়া ছিটিয়ে দিয়ে কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকে, একটু পরেই কোয়ার গায়ে রেশমের সুতোর মুখ উঁকি দেয়। সেই সুতোর মুখ ধরে আর একজন টেনে টেনে পাকিয়ে যায় রেশমের সুতো। যে 'কুচি'* দিয়ে (কয়েকটা কাঠি একত্র করে তৈরি করে) কোয়াগুলো ঘুরায় তাকে বলে 'কাটনি' আর যে পাকায় তাকে বলে পাকদার বা পাকানদার। সেদিন বাংলার মাঠে মাঠে ছিল অপর্যাপ্ত মালবেরী গাছ; ঘরে ঘরে ছিল কাটনি আর পাকদার, ছিল রেশমের নিপুণ শিল্পীরা। তুঁতগাছের (মালবেরী) চাষ, পলু পালন থেকে শুরু করে সুতো কাটা, সুতো থেকে রেশমের বস্ত্রসম্ভার কিম্বা কাঁচা সিল্কের (Raw silk) সুতোর ফেটী মহাজন ও দালালদের কাছে বিক্রি করা ইত্যাদি এক রেশমকে কেন্দ্র করেই সহস্র কাজের ছন্দে বাঁধা ছিল সেদিনের বাংলার গ্রামজীবন। গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের জমিতেই তুঁত গাছের চাষ করতো, নিজেদের যৎসামান্য পুঁজি নিয়োজিত করতো এই রেশমশিল্পে। তারপর তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রি করতো সেই পণ্য।

তারপরে এল মুসলমান যুগ, সুলতান পাঠান আর মোগলরা। মোগলদের পরে এল কোম্পানীর আমল। কার্পাসজাত বস্ত্রের সঙ্গে রেশম বস্ত্রের ওপরে পড়ল বিদেশী রাজন্যবর্গের লোভের শকুনি দৃষ্টি। সহস্র বিধিনিষেধ আর নিয়ম অনুশাসনে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো রেশমশিল্পকে। আর কেমন করে বাংলার এই প্রাচীনতম শিল্পের সমাধি রচনা করা হলো,—সেই আলোচনার আগে বলা দরকার কত যুগ আগে এবং কোন দেশ থেকে রেশমের ব্যবহার এদেশে

---

* প্রবাসী, চৈত্রসংখ্যা, ১৩১৭– গণপতি রায়ের চীনের রেশম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৯

প্রচলন হয়েছিল। অবশ্য রেশমের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পৃথিবীর ভেতরে চীন দেশই নাকি রেশমের আদিজনক।[১২] যেহেতু চীন দেশ থেকেই আরব পারস্যের মারফৎ রেশম ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপে। কাজেই অনেকের বিশ্বাস চীনই জানতো রেশমের অস্তিত্ব। চীনের হোনান কিউচৌউ অঞ্চলে উঁচু পাহাড়ের গায়ে গায়ে খর্বাকৃতি দেবদারুর মত এক ধরনের গাছের পাতায় রেশমের কীট জন্মাতো। এই রেশমের কীটের ইংরেজী নাম oak silk warm, আর ল্যাটিন নাম হলো Anthera pernyi. এই কীট থেকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে যে রেশম উৎপন্ন হতো, তাকে বলা হতো বুনো রেশম।ক চীন থেকে রেশম রপ্তানী হতো ইতালীতে আমেরিকায়। তাই অনেকের বিশ্বাস প্রতিবেশী দেশ ভারত তথা বাংলাদেশেও তারাই রেশম পাঠাতো। চীনা বণিকরা নাকি তাদের সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর থেকে বেরিয়ে এসে মসলিন ও সুগন্ধী মশলার পরিবর্তে দিত রেশম। কিন্তু ফরাসী ইতিহাসবিদ্ বৈতাড় (Boitard) বলেন, ভারতবর্ষই রেশমের আদি পীঠস্থান। রোমের সম্রাট জাষ্টিনিয়ান (Justinian) প্রেরিত সেই দুই পুরোহিত রেশম কীট নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সুতো কাটার রহস্য জেনে নিয়েছিল পারস্য থেকে নয়—জেনেছিল পাঞ্জাবের প্রান্তদেশে অবস্থিত শিরহিন্দ থেকে। আর রেশম যে পুরোপুরি দেশজ শিল্প, তার একটা প্রমাণ হলো, সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীটের আর এক নাম 'পুণ্ডরীক্ষ'। এখনো উত্তরবাংলার মালদহ অঞ্চলে যারা পলু পালন করে তাদের বলে পুণ্ডরীকাক্ষ বা পুণ্ড্রো বা পুঁড়ো। মালদহ থেকে শুরু করে দক্ষিণে বগুড়া পর্যন্ত উত্তরবাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগে যথেষ্ট তুঁত গাছের চাষ হতো, কে জানে হয়তো সেই কারণেই এই

ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ২৩শ ভাগ, ১ম সংখ্যা "রেশম শিল্পের পরিভাষিক শব্দ"। পৃঃ ৭৫-৭৭

অঞ্চলের নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভেতরে পুণ্ডরীক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নাম দেখা যায় জৈনদের 'কল্পসূত্রে'! আর এদেশের সুপ্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থ পুরাণে, রামায়ণে মহাভারতে ব্যবহৃত রেশমের প্রাচীন নাম 'দুকুল' 'পত্রোন', ইত্যাদি শব্দগুলোর ভেতরেও বিদেশী প্রভাবের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

এবারে দেখা যাক্, বাংলাদেশের কোথায় কোথায় কি ধরনের রেশম উৎপন্ন হতো—এন. জি. মুখার্জী তাঁর অন দি সিল্ক ফেব্রিক্স অফ বেঙ্গল গ্রন্থে বলেছেন,[১৩] একমাত্র চট্টগ্রাম ডিভিশন ছাড়া বাংলাদেশের আর চারটি ডিভিশনের—প্রত্যেকটি জেলায় কম বেশী রেশমশিল্পের অস্তিত্ব ছিল। প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার বাকুয়া, বারওয়ান, গোয়াজ, মুন্নলাবাজার, মীর্জাপুরে অপর্যাপ্ত পরিমাণে মালবেরী গাছের (তুঁত) চাষ হতো—আর ঘরে ঘরে ছিল পলু পালন শিল্প (cocoon rearing Industry)। কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন হতো মীর্জাপুরে, আসনপুরে আর মুল্লাবাজারে আর কাশিমবাজারের ইংরেজ ও ওলন্দাজদের রেশমকুঠি তো ভুবন-বিখ্যাত। রাজসাহী বিভাগের চারঘাট, পুঁটিয়া, বাগমারা, পাঁচপুর, বোয়ালিয়া, মঙ্গলপুর, নাটোর ও গোদাগাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হতো। তাছাড়া, জলপাইগুড়ি ডিভিশনের মালদহ, ঢাকা ডিভিশনের ঢাকায় যেমন অপর্যাপ্ত মালবেরী গাছের চাষ হতো তেমনি পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট রেশম। এই রেশম থেকে রেশমের শিল্পীরা কি কি ধরণের বস্ত্র তৈরি করতো তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হলো :—[১৪]

(১) কোরা—খুব সস্তা ধরনের সিল্ক। প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হতো এই রেশম। সাধারণত ৭ গজ দৈর্ঘ এবং ১ গজ প্রস্থ হতো এক একটি খণ্ড। দাম ৫।৷০ টাকা।

(২) সিল্ক মসলিন এবং হাওয়াই—এই মিহি সিল্কের সুতো

থেকে তৈরি হতো ধনী বিলাসীদের সার্ট, কোট, চাপকান। দৈর্ঘ ১০ গজ × ১০ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রতি খণ্ড ১০ টাকা।

(৩) আলোয়ান ও মোটা চাদর—অবস্থাসম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকদের বিলাসের সামগ্রী। প্রতি খণ্ড দৈর্ঘ ৩ গজ × ১½ গজ প্রস্থ দাম, ২৫ থেকে ৩৫ টাকা। এই আলোয়ান সর্বপ্রথম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জন্য তৈরি করেছিল মৃত্যুঞ্জয় সরকার। দাম পড়েছিল ৫০ টাকা।

(৪) প্লেন সাদা ধুতি এবং জোড়—সারা বাংলাদেশে বিক্রি হতো প্রচুর। বাঙালীর বিয়ে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি যে কোন সামাজিক উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

(৫) রুমাল—কাঁচা সিল্ক (Raw silk) থেকে তৈরি হতো সুদৃশ্য মির্জাপুরী রুমাল। দাম প্রতি খণ্ড ২ টাকা।

(৬) মেখলা—এক বিশেষ ধরনের কোরা সিল্ক থেকে তৈরি হতো মেখলা। আসামের মেয়েদের স্কার্ট হতো এই সিল্কের থেকে।

(৭) মটকা এবং খামরু সিল্ক—এক ধরনের মোটা রেশমের কাপড় বিশেষ। এই কাপড় থেকে বাঙালীদের চাদর এবং পাঞ্জাবী তৈরি হতো।

(৮) আসাম সিল্কের অনুকরণে তৈরি হতো এক ধরনের রেশমের কাপড়। বাজারে সেই বস্ত্র ইমিটেশান অফ আসাম সিল্ক নামে পরিচিত ছিল।

রেশমের শিল্পীরা যে সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার তৈরি করতো সেই পণ্য সাধারণত তিনটি উপায়ে বিক্রি বা হস্তান্তরিত হতো (ক) বয়নকারী নিজে ইচ্ছামত যে কোন খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করতো (খ) যে ব্যক্তি রেশমের সুতোর জন্য তাকে দাদন দিত তাকে তৈরি বস্ত্র দিতে বাধ্য থাকতো (গ) কোম্পানীর কিম্বা নবাবের দালালের কাছে বিক্রি করতো।

বাঙালীর এই সুপ্রাচীনকালের রেশমের ব্যাবসায় হলো

ইংরেজদের আবির্ভাব। ১৬১৭ থেকে ১৬২১ সালের ক্যালেণ্ডার অফ স্টেটপেপারসে দেখা যাচ্ছে[১৫] ইংল্যাণ্ডের বাজারে পারস্যের রেশমের খুব চাহিদা ছিল। কিন্তু পারসিয়ান সিল্কের খরচ বেশি পড়তো বলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তা ব্যক্তিরা ভাবতে লাগল বেঙ্গল সিল্কের কথা। তারপরে দীর্ঘদিন ধরে তারা চিন্তাভাবনা করে দেখল, বাংলাদেশের রেশম ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপের বাজারে দু'পয়সা প্রফিট রেখে বিক্রি করা যায় কিনা। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জ ফোর্টের কাউন্সিলের দুইজন বিশেষজ্ঞ বাংলায় এল। সরেজমিনে দেখল, রেশম ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তারা সেরপুর (বগুড়া) আর টানির সাদা সিল্ক এবং মোটা ধরনের রেশমের (coarse silk rope) সুতো পরীক্ষা করে রায় দিল, এই দুই ধরনের রেশমের চাহিদা হবে ইংল্যাণ্ডের বাজারে। লাভের অঙ্কটাও খারাপ হবে না—কিন্তু যতই করুক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদশক পর্যন্ত বাংলার রেশম সামান্য পরিমাণেই রপ্তানী হতো ইংল্যাণ্ডে। তার কারণ হিসেবে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলে—defective reeling···primitive native method. রেশমের গুটি বা কোরা থেকে সুতো সেই মান্ধাতার আমলের নিয়ম, দ্বিতীয়ত অনুন্নত ধরনের পলু। আমার মনে হয়, তা নয়, ১৭৩৯-৪০ সালে জবরদস্ত নবাব আলীবর্দ্দির শাসন চলছে, ইংরেজেরা তখন পুরোপুরি শিল্পটাকে গ্রাস করতে পারেনি। তখনো নবাবের ফৌজদার, দারোগা, আরো অসংখ্য রাজকর্মচারী হাটে হাটে গঞ্জে গঞ্জে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাতো। ইংরেজরা তখন এদেশে বিদেশী মাত্র। কৃপার প্রার্থী। দেশীয় কর্মচারীদের ঘুস, নজরানা দিয়ে বশীভূত করে নিজেদের ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছে। ষ্ট্রিনস্‌হ্যাম তার ডায়রীতে বলেছে, কুঠিয়ালরা সাধারণত ডিসেম্বর মাসে রেশমের সুতো কিনতো, তার কারণ শীতের প্রারম্ভে তুঁতগাছে যে কীট দেখা যেত, তার রেশমের জাত সবচেয়ে

উৎকৃষ্ট। তারা দেশীয় রেশমের ব্যবসায়ীদের অগ্রিম টাকা দিয়ে রাখতো—কোন জোরজবরদস্তি নেই। ১৬৭৯ নভেম্বরে দেখা যাচ্ছে[১৬] কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজরা চল্লিশ সের কাঁচা রেশম কিনেছিল ৭১ সিক্কা টাকায় আর বছরে তিনবার মার্চ, জুলাই এবং নভেম্বরে তারা কাঁচা রেশম কিনতো। আর সেইখানেই বলেছে স্পষ্ট, Note, the June or July Bund for raw silk is always course. বর্ষার রেশমের গুটির সুতো মোটা আর কর্কশ। বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপিতে[১৭] আছে, বাংলা থেকে করোমণ্ডল উপকূলে এক রপ্তানীর হিসেব। তাতে দেখা যাচ্ছে (১৬৮৪) কাঁচা সিল্ক ৩০০ বেল। প্রত্যেক বেলের ওজন দুইমন করে। সিল্কের লুঙ্গি, মুগা সিল্কও রপ্তানী হতো। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪০ ফোর্ট উইলিয়ামের খাতায় দেখা যাচ্ছে ৭৯১, ৭৫০ মোট অগ্রিম দেওয়া হয়েছে[১৮] কাশিমবাজারের পঁচিশজন দেশীয় ব্যবসায়ীকে। তাদের নাম (১) সাচী কতমা (২) শ্রীবিশে স্থর (৩) কোলারাম শর্মা (৪) ভুকর সাহা (৫) তেজরাম বসু (৬) নরেন বিশ্বাস (৭) অযোধ্যারাম (৮) রগোনাউথ (৯) মহাদেব শর্মা (১০) গোবর্দ্ধন (১১) প্রাণনাথ পণ্ডিত (১২) ননীচাঁদ দত্ত ইত্যাদি। প্রতিটি ব্যবসায়ী হিন্দু এবং বাঙালী। বাঙালী হিন্দুরা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত ব্যবসার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এই তালিকার নামগুলো তার প্রমাণ।

পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার রেশমশিল্পে ইংরেজদের ভূমিকা, সৎ এবং শান্ত, নির্বিরোধ ব্যবসায়ীর ভূমিকা। শুধু তাই নয়, বাংলার এই সুপ্রাচীন শিল্পটার উন্নতির জন্যও তারা চেষ্টা করছে। ১৭১০ সালে ক্যাপ্টেন স্পিড (speed)-কে নিয়ে এল। স্পিড শেখালো বড় পলু পালন পদ্ধতি। ১৭৫৭ সালে এল আর একজন—রিচার্ড ওয়াইন্ডার, তার পরিচয়পত্রে ছিল[১৯] He has been conversant in raw silk during his whole life...এল জোসেফ পাউকান

(Joseph Pouchan)। সুতোর উৎপাদন হু হু করে বাড়তে লাগল। কিন্তু যেই দেওয়ানী পেয়ে গেল ইংরেজ অমনি তাদের মূর্তি পাল্টে গেল। জমিদারদের ওপর দিল এক পরোয়ানা জারী করে, পতিত জমিতে তুঁত গাছের চাষ করতে হবে। মালবেরীর চাষ না করে জমি ফেলে রাখলে সাজা হবে। জমিতে যে যত তুঁত গাছের ফলন করতে পারবে, দু বছরের জন্য তার খাজনা মাপ হবে। ইটালী থেকে নিয়ে এল তিনজন রেশমবিশেষজ্ঞ—উইস (Wiss) রবিনসন (Robinson), আউবার্ট (Aubert)—দেশী প্রথায় সুতো কাটার নিয়ম দিল বদলে; উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইটালীর কায়দায় (নভি) খুব বেশী পরিমাণে শুরু হলো রিলিং। কাশিমবাজারে, কুমারখালিতে, রংপুরে, বোলানে অপর্যাপ্ত রেশমের সুতো স্তূপাকৃতি হতে লাগল।

বাঙালী কাটুনীরা কিন্তু সহজে বিদেশীপ্রথায় সুতো কাটতে চায় নি। চায় নি চীনা পলু নিয়ে কাজ করতে। শান্ত, নির্বিরোধ সহজ সরল কাটুনীরা যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত নিয়মের বাইরে পা দিতে চায় নি। তখন তাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল, বলপ্রয়োগ হয়েছিল এবং এই স্বেচ্ছাচারিতা যে নবজাতক ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ক্ষীনায়ু করে তুলতে পারে তার আভাস আছে কোর্ট অফ ডিরেক্টারসদের সেই সতর্কবাণীর ভেতরে···Though there was no branch of this trade which they more ardently wished to extend than that of raw silk, yet they could not think of effecting so desirable an object by any measures that might be oppressive to the natives or attended by any infringement of that freedom, security and felicity which it was desired they should enjoy under the Company Goverment···রেশমের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে এমন কিছু করো না যাতে দেশের

অধিবাসীরা যে স্বাধীনতা, সংহতি কোম্পানীর শাসনে উপভোগ করছে সেটা যেন বিপর্যস্ত হয়…কিন্তু হয়েছিল। বহু শিল্পী তার বাপ-পিতামহের ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল কোম্পানীর মহাজন দালালদের অত্যাচারে। রেশমের শিল্পীরা তাদের ব্যবসায় বিমুখ হলে কি হবে, বাংলাদেশের মাঠে মাঠে থৈ থৈ করতে লাগল মালবেরী গাছ। গাছের পাতায় পাতায় রাশি রাশি রেশম কীট। বেড়ে গেল অবিশ্বাস্য পরিমাণে রেশমের প্রোডাকশান। এমন হয়েছিল যে সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ট্রেড রেকর্ডে লিখছে—production was so immense that use of silk in every class of society from the throne to cottage is common in Bengal…

ইংল্যাণ্ডে আমদানীর পরিমাণও গেল বেড়ে। দাম গেল কমে। যেমন ক্ষতি হতে লাগল ইম্পোর্টারদের তেমনি ম্যানুফ্যাকচারারদের। শুধু বাংলার রেশম তো নয়, পারস্য থেকে চীন থেকে প্রাচ্যের আরও অন্যান্য দেশ থেকে যে রেশম আসছে তাদের দেশে। গুদামে স্তূপাকৃতি হচ্ছে সিল্কের সুতোর গাঁট। ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রবয়নকারীরা সেই বিপুল পরিমাণ সিল্ক নিয়ে কি করবে? তাদের মেশিনের ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। অতএব বাংলাদেশের রেশম ইংল্যাণ্ডের ওয়্যারহাউসের অন্ধকারে পচতে লাগল। রেশম কাপড়ের কলের মালিকরা বাংলাদেশের রেশমের দাম দিয়ে মরে কিন্তু সেই পণ্য কাজে লাগাতে পারে না। ম্যানুফ্যাকচারারদের ভেতরে দেখা দিল অসন্তোষ। শুরু হলো আন্দোলন—তাদের চাপে পড়েই ইংল্যাণ্ডের কর্তারা হুকুম পাঠালো—বাংলায় বন্ধ করো রপ্তানী। আর যা কিনে ফেলেছো তা গুদামে ফেলে রাখ—যেই সেই আদেশ এল All…silks from Bengal…should be locked up in warehouse. বাংলার ইংরেজ কুঠিয়ালরা দেখল, মহামুস্কিল, কিনে গুদামে ফেলে রাখার চেয়ে 'প্রোডাকশান' কমিয়ে দেওয়াই

ভালো। তাই যারা আইন করেছিল 'গ্রো মোর মালবেরী' তারাই নতুন নিয়ম করল।

রেষ্ট্রিকশান। রেশম উৎপাদনের ওপরে আইন করা হলো। দেশের দিকে দিকে হুকুম জারী হয়ে গেল—কম করে সিল্ক তৈরি করতে হবে। আর সুরু হলো বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তল্লাসী। যেখানে দেখতে পেল—অনেক রেশম স্তূপাকৃতি হয়ে আছে সেখান থেকে গাঁটকে গাঁট নিয়ে গেল তাদের কুঠির গুদামে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে রেশম ব্যবসায়ীদের বাড়ীতে বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেল।

তুঁত গাছের রেশমগুটির দিকে তাকিয়ে তারা কত স্বপ্ন দেখেছে এই রেশম তাদের ঘরে সম্পদ আনবে—সেই-সেই রেশম, বুকের রক্তে রাঙানো সেই অমূল্যধন বিদেশীদের গুদামঘরের অন্ধকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে?

শুধু বাজেয়াপ্ত করে নি। শুধু অত্যাচার করে নি। অনেক—অনেক পরিমাণ রেশম গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতেও ইতস্তত করে নি। নীচের হিসাবটা* লক্ষণীয়।

সময়	নিক্ষেপিত রেশমের পরিমাণ
১৭৭৬ থেকে ১৭৮৫ বছরে	৩,৯২,৯১৮ পাউণ্ড
১৭৮৬ „ ১৭৯০ „	৩,৯১,৪৭৭ „

আর যা নিক্ষেপ করল না তার কিছু কিছু পরিমাণ জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিল ইটালীতে। ইটালীয়ান অরগ্যান জিন (সিল্ক) বাংলাদেশের রেশমের মতই নরম, মসৃণ, সুদৃশ্য আর লোভনীয়।

ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে, বিশেষ করে ইস্ট ইংল্যাণ্ডে ইটালীয়ান সিল্কের খুব চাহিদা। তাই বাংলাদেশের রেশমের সঙ্গে

*Oriental Commerce. Milburn. Vol.2 P. 254.

ইটালীর রেশম মিশিয়ে তৈরি হতে লাগল এক নতুন ধরনের সিল্ক।

কিন্তু বাংলার রেশমের নাম মুছে গেল। অবলুপ্ত হয়ে গেল সেই সত্য ইতিহাস—একদিন বাংলার পল্লীগ্রামের বহু সাধারণ অবহেলিত আর দরিদ্র মানুষের স্বপ্ন যে রেশমের সুতোর পাকে পাকে পরম মমতার মত জড়ানো ছিল; যার প্রত্যেকটি সুতোর আড়ালে ছিল এই বাংলার নিরন্ন মানুষের পেশীসঞ্চালনের ইতিবৃত্ত—সেই ভুবনবিখ্যাত বেঙ্গল সিল্কের নাম হয়ে গেল 'ইটালীয়ান সিল্ক।'

এইখানেই শেষ নয়। রেশমের পণ্যকে বাজেয়াপ্ত করে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে এবং ইটালীতে পাঠিয়ে দিয়েও ক্ষান্ত হলো না। ইংরেজ ভাবতে লাগল কেমন করে—কেমন করে লজিসলেটিভ প্রোটেকশান দেওয়া যায় এই ব্যবসাকে—অর্থাৎ কেমন করে মূল্যবান রেশমশিল্পের ব্যবসাকে আইনের বন্ধনে বেঁধে পঙ্গু করা যায়।

তৈরি হলো আইন:[২০] 'যদি কোন ব্যক্তি এই দেশের প্রজা হয়ে বিনা অনুমতিতে রেশম উৎপাদন করে, বিদেশের কোন ব্যবসায়ীকে রেশম বয়ন প্রণালী শেখায়, তাহলে তার বাড়িঘর, স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তৎসহ দু হাজার টাকা জরিমানা—অনাদায়ে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

কিন্তু বাংলার যুগসঞ্চিত ঐতিহ্যবাহী এই রেশমশিল্পের ওপরে ইংরেজদের নিপীড়নের এই মর্মান্তিক ইতিহাস, পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কি করে লেখা হবে? রাজদণ্ড, রাজদ্রোহীতার পরিণামে দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাসের ভয়ে প্রকৃত ইতিহাস বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গেল। বাংলার রেশমশিল্পের অবলুপ্তি সম্বন্ধে শুধু লেখা হলো—বিদেশে রপ্তানী কমে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ইটালীয়ান

সিল্কের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। বাংলার রেশমের ওপরে ইংল্যাণ্ড আর নির্ভর করতো না—কিন্তু কেন রপ্তানী কমে গিয়েছিল, কেন ইটালীয়ান সিল্কের আদর বেড়ে গিয়েছিল—কেউ জানতে পারল না সেই করুণ আর মর্মান্তিক ইতিহাস।

চিনি

বাঙালীর বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য চিনি। শর্করা খণ্ড খণ্ডমোদক, মক্ষিকাশর্করা, উপলা, শুক্লোপলা, সিতাখণ্ড দৃঢ়গাত্রিকা, সিতা, ইক্ষুসার, বালুকাত্মিকা, গুড়োদ্ভবা ইত্যাদি চিনির সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায় রামায়ণে, মহাভারতে, শুশ্রুতে মনুসংহিতায়[২১] এবং সুপ্রাচীনকালের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থে ও পুরাণে। তাই অনুমান করা যায়, চিনির ব্যবহার স্মরণাতীতকাল থেকেই এদেশে প্রচলন ছিল। পেরিপ্লাসে বলছে,[২২] 'শর্করা' থেকে এসেছে প্রাকৃত শব্দ স্যাক্কাহারি; আরবীতে হয়েছে শুক্কুর, ল্যাটিনে স্যাক্কাহারাম। পৃথিবীর দেশে দেশে চিনির বিভিন্ন নাম এবং মূল শব্দ শর্করার রূপান্তর লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারা যায়, চিনির আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষ। চিনিকে ফরাসী ভাষায় বলে শুক্রে (sucre) স্পেনে এর নাম আজুকার, জার্মানীতে হলো 'জুকার' আর ইংরাজীতে সুগার! চিনি যে পুরোপুরি একটি নির্ভেজাল স্বদেশী পণ্য তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় দুনিয়ার দেশদেশান্তরে তার ছড়িয়ে পড়ার বিচিত্র ইতিহাসের ভেতরে। ঐতিহাসিক স্পেন্সার তাঁর সুগারহ্যাণ্ডবুকে বলছেন—সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই আরব পারস্যের সঙ্গে ভারতের তথা বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য চলতো। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মিষ্টি পণ্যটির ব্যবহার ভারত থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল আরবে, পারস্যে, সেখান থেকে আফ্রিকায়। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ইউরোপে। বাংলাদেশের চিনি যেত আসামের গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে চীনে। চীনারাই ইক্ষুচাষের প্রচলন করেছিল

ফরমোসায়, ফিলিপাইনে, জাভায়—বর্তমানকালের সর্বাপেক্ষা প্রচুর ইক্ষু উৎপাদনকারী পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দেশে। আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিউবায়, জ্যামাইকায়—সেই সুদূর আর এক গোলার্দ্ধের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কে নিয়ে গিয়েছিল এই সুমিষ্ট পণ্য সামগ্রী?

সে ইতিহাসও বিচিত্র। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বস সান্টো ডোমিনগোর (বর্তমান নাম হিসপানিওলা, ক্যারাবিয়ান সাগরস্থ ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্রের একটি দ্বীপ) মাটিতে পুঁতেছিল আখগাছের চারা।[২৩] এইখান থেকেই ইক্ষুদণ্ডের সুমিষ্ট স্বাদের কথা জানতে পেরেছিল মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ আমেরিকার মানুষ।

বাঙালীর ব্যবসার একটি প্রধান সামগ্রী চিনির আলোচনা প্রসঙ্গে আশাকরি আন্তর্জাতিক পটভূমিতে চিনির আদি ইতিহাস অবান্তর মনে হবে না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলেছে;[২৪] খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইউরোপ জানতে পেরেছিল, শর্করার অস্তিত্ব। খ্রীষ্টের জন্মের চারশো বছর আগেই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছিল সেই যুগান্তকারী ঘটনা—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভি- যান। আর সেই সূত্র ধরেই প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার আদান-প্রদান হয়েছিল এ কথা কে না জানে? কিন্তু কেউ জানে না—ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শর্করাও ইউরোপে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল সুগারে। উইলিয়ম মিলবার্ন তাঁর ওরিয়েন্টাল কর্মাসে বলেছেন, সেই অদ্ভুত কাহিনী। ঐতিহাসিক- দের মতে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসীরা চিনির কথা জানতে পেরেছিল আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানের সূত্রে।

ষ্ট্র্যাবো (Strabo) বলেন খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ শতকে ভারত সীমান্তের কোন এক দেশের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি নিয়ারকাস (Nearchus) দেখেছিলেন, দিগন্তবিসারী মাঠে মানুষ সমান উঁচু উঁচু গাছ। গাছগুলো কোমরের কাছে বেশ

করে বাঁধা। অনেক বড় বড় পাতা দিয়ে জড়ানো সরু সরু বাঁশের মত এ কী গাছ!

—কি নাম এই গাছের?

বিদেশী সেনাপতির প্রশ্ন শুনে হয়তো সেদিন সেখানকার অধিবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল। এত অপর্যাপ্ত যে গাছ তার নাম জানে না। এ কী রকম মানুষ রে বাবা।

ইতিহাসকার স্ট্র্যাবো লিখছেন, সমস্ত পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই সেনাপতিই প্রথম জানতে পেরেছিলেন, আখগাছের কথা। জানতে পেরেছিলেন, এই গাছের সমস্ত রকমের গুণের ইতিবৃত্ত। বিস্ময়বোধ করেছিলেন, এত সহজে এই মূল্যবান গাছ জন্মে এদেশে।

থিয়োফ্রাস্টাস। নিয়ারকাসের সমসাময়িক আর একজন গ্রীসীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন চিনির কথা! স্পষ্ট করে বলেছিলেন, চিনি তৈরি হয় প্রাচ্য দেশের এক ধরনের গাছ থেকে। শুধু চিনি নয়—মধুর কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কেমন করে সুদূর গ্রীসের পণ্ডিত থিয়োফ্রাস্টাস আখ গাছের কথা জানতে পেরেছিলেন সেকথা কোন ইতিহাসকার লেখেন নি।

তবে একথা সত্য—সুপ্রাচীনকালের সেই সুসভ্য দেশ গ্রীসের সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিত আর ইতিহাসকারেরা খ্রীস্টের জন্মের বহু-পূর্বেই চিনির অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছিলেন।

শুধু থিয়োফ্রাস্টাস নয়। নিয়ারকাস নয়। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার পূর্বে ইতিহাস লিখেছেন ইরাটোস্থেনিস (Eratosthenes ২২৩ খৃ. পূ)।

স্ট্র্যাবো বলছেন, ইরাটোস্থেনিসও আখগাছের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর ইতিহাসে। লিখেছেন ‟Sugar Cane like large reeds found in India which were too sweet to the taste both when raw and boiled.

ভারতবর্ষের মাঠে প্রান্তরে যে লম্বা সরু বাঁশের মত যত অপর্যাপ্ত আখগাছ দেখা যায় এবং তার স্বাদ যে অত্যন্ত মিষ্টি সেই রহস্য ইতিহাসকারদের অজ্ঞাত ছিল না।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল। এক ভাগ স্থল। এই জলেরও আবার সবটুকুই লবণাক্ত। লবণ, সৃষ্টির আদিকালের পণ্য। লবণের স্বাদ প্রাগৈতিহাসিককালের মানুষও জানতো।

কিন্তু মিষ্টি, মানুষের বহুযুগের বিবর্তনের অনেক—অনেক পরের ধাপে এসেছে এই মিষ্টির অস্তিত্ব। যাক সেকথা যাঁরা চিনি বা মিষ্টির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন—তাঁরা বলবেন সেসব কথা।

খৃষ্টপূর্ব পঁয়ত্রিশ সালে ডায়োস্কোরিডেস (Dioscorides) গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিকও বিভিন্ন রকম স্যাকারিনের কথা বলেছেন। এই স্যাকারিন আজ বহুল প্রচলিত। সেই স্যাকারিনের মূল উৎস হলো কিন্তু চিনি!

তার অনেক-অনেক পরে ৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক প্লিনিও (Pliny) উল্লেখ করেছেন চিনির কথা। তিনি বলেছেন, সুদূর ভারত ও আরব থেকে এসেছে এই বিচিত্র মিষ্টি পদার্থ। চিনিকে কখনো তিনি বলেছেন মধু, কখনো বলেছেন 'স্যাকহর্ন'—যা থেকে হয়েছে স্যাকারিন!

চিনির ইতিবৃত্ত আছে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লেখা 'পেরিপ্লাস অফ এরিথেরীয়ান সী' (Periplus of Erythrarean sea) গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মায় এমন এক ধরণের লম্বা লম্বা গাছ থেকে চিনি উৎপন্ন হয়, একথা সেই সুদূরকালের বহু বৈজ্ঞানিক, বহু ইতিহাসবিদ বলেছেন। কিন্তু একজনও বলেন নি—বলতেও পারে নি, আখগাছ থেকে চিনি উৎপন্ন করার প্রণালী। পৃথিবীবাসীর সেকথা জানতে বহুদিন—বহুদিন লেগেছিল। কিন্তু—সেই আদি-

কালের বাংলার ঘরে ঘরে সেই স্মরণাতীতকাল থেকেই চিনির বহুল প্রচলন ছিল।

প্রাচীন ঐতিহাসিকরা (এদেশীয়) বহু গবেষণা করেছেন—ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল আখ চাষ, কবে থেকে শুরু হয়েছিল চিনির ব্যবহার। কিন্তু কেউ কোন সময় নিরূপণ করতে পারেন নি। শুধু বলেছেন—Sugar has been an article of trade in India from time immemorial. There is scarcely a district in Bengal where the cane does not flourish.[২৬]

বেনারস, বিহার, রংপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর—চিনির ব্যবসার ইতিহাসে এই কয়টি জায়গার নাম বিখ্যাত। বেনারস ছাড়া বিহার, রংপুর, বর্দ্ধমান ইত্যাদি একদিন বৃহত্তর এই বাংলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। বীরভূম, রংপুর, বর্দ্ধমানের মাঠে মাঠে একদিন বহুল পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হতো।

বীরভূম-বর্দ্ধমানের ধূ ধূ অনুর্বর রাঢ়ের মাটিতে এত বেশি আখ জন্মাতো যে তার কোন মাপ-জোক ছিল না। ইক্ষু উৎপন্নের যেমন কোন হিসাব ছিল না, তেমন ছিল না গুড় ও চিনির ব্যবহারের মাপকাঠি। মোটের ওপরে, প্রকৃতির এই অকৃপণ স্নেহের দান—বাংলার অবারিত প্রান্তরের এই অপর্যাপ্ত ফসল তখনো ব্যবসার উৎপাদন হতে পারে নি। কোন সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পরূপে পরিগণিত হয় নি।

শুধু বাংলায় নয়, ভারতের অনেক প্রদেশেই এই ইক্ষু এত বেশি উৎপন্ন হতো যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময় ইউরোপ থেকে বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন থেকে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ বণিকরা। চিরকালের ব্যবসায়ী বৃটিশ মস্তিষ্কে ধূমায়িত হয়েছিল কূটিল দূরভিসন্ধি! বাংলার এই অপর্যাপ্ত সম্পদকে ব্যবসার প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। তারা দেখল, ইক্ষু এমন জিনিস যে মাঠ থেকে শুরু করে একেবারে চিনি

হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্টেজ-ই বাজারের পণ্য হিসেবে বিক্রি হওয়ার মত। যেমন আখ প্রচুর বিক্রি হতে পারে। তারপর রস—আখের রসও বিক্রি হতে পারে। তার থেকে পাটালী গুড়—গুড়ের পাটালীরও পণ্য হিসেবে চাহিদা প্রচুর। গুড় থেকে চিনি।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার দিকে দিকে চিনির ব্যবসা কি রকম ছিল তার কিছু আভাস পাওয়া যায় সেকালের সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশকে কলকাতার চিনি-ব্যবসায়ীদের গভর্ণমেণ্টের কাছে লিখিত এক পত্রে।[২৭]—বহুদিন থেকেই চিনি এদেশের একটি প্রধান পণ্যসম্ভার। বাংলার চিনি মাদ্রাজে, মালাবার উপকূলে, বোম্বেতে, সুরাটে এবং পারস্য সাগরের উপকূলবর্তী দেশে দেশে রপ্তানী হয়। কলকাতা শহর মহানুভব ইংরেজ সরকারের অধীনে আসার পর থেকেই ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দেও ৫০,০০০ হাজার মণ ইক্ষু এক বছরে রপ্তানী হয়েছে। এই রপ্তানীতে ৬০,০০,০০০ সিক্কা টাকা দেশের লাভ হয়েছে। কিন্তু বিগত দশ বছরে চিনির দাম আরও বেড়েছে। সেই তুলনায় ইক্ষুর উৎপাদন যেমন কমেছে তেমনি কমে যাচ্ছে রপ্তানীর পরিমাণ আর ট্রান্সপোর্ট খরচও অত্যন্ত বেশি। কাজেই বাংলা-দেশ থেকে চিনি রপ্তানীর পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। তাই বাংলাদেশের চিনির ব্যবসা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চাষের অভাবে কোন কোন বছব ইক্ষু উৎপন্নের পরিমাণ খুব বেশি হয়, কোন বছর কম হয়। তাছাড়া আরও নানারকমের জটিলতা দেখা দিচ্ছে। অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাও পণ্য হিসাবে পাওয়া যায় না। চাষী গৃহস্থেরা অপর্যাপ্ত খরচ করে। এই খরচের কোন মাথামুণ্ডু নেই। তাদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন আইন নেই। মাঠে মাঠে ফসলের পরিমাণও নির্ভর করে চাষীদের ইচ্ছার ওপরে।

তাই আমরা চিনি ব্যবসায়ীরা মহানুভব সরকারের কাছে প্রার্থনা

করছি, ইক্ষু চাষ ও চিনি ব্যবসাকে সরকারী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হোক।

আমরা সরকারকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করব।

এই চিঠির ফল হয়েছিল। সরকারের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। কেমন করে জমিকে উর্বর করা যায়—কেমন করে সাদা পিঁপড়া—ইক্ষুর শত্রুকে তাড়ানো যায়,—সেইসব চেষ্টা তারা করেছিল।

তারপরে সরাসরিভাবে বিদেশী সরকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইক্ষু কিনতে শুরু করল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চাষীদের দাদন দিতে আরম্ভ করল। জারী হলো হাজাবো রকম আইন, হাজার রকম বিলি ব্যবস্থা।

নদীয়ার রেণুউইক এ্যাণ্ড কোম্পানী ইক্ষু পেষনের যন্ত্র আবিষ্কার করল। গ্রামে গ্রামে চাষীদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করল সেই যন্ত্র। গৃহস্থরা এবং চাষীরা তাদের পরিশ্রমের ফসলের পুরস্কার রূপালী মুদ্রা পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে চাষ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী আখ চাষের পরিণাম খুব ভালো হলো না। বাংলাদেশের আখের ক্ষেতে সাদা পিঁপড়ের দল ইক্ষুদণ্ডের মিষ্টি শাঁস কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল। So severely infested with white ants that socitey were obliged to drop the scheme.[২৮] পিঁপড়ার অত্যাচার ছাড়াও বাংলাদেশের চিনির যে বহু অপচয় হতো সেটা বুঝতে পারা গিয়েছিল চিঠির একটি কথায়—Flow of the production is not regular—that is why price of the suger is ever increasing in the market…কেমন করে চিনির উৎপাদন এরকম থাকবে? চিনি তো আর আখগাছ থেকে হয় না। আখের রসের ভেতর থেকে বহু রূপান্তরের ভেতর দিয়ে চিনি তৈরী হয়। কিন্তু এই চাষ করতো সাধারণ চাষীরা। তারা মাঠে মাঠে

ফলাতো আমন ধান। বুনতো রবিশস্য। আর সেইসঙ্গে আখগাছও লাগাতো।

বিদেশী ভ্রমণকারীরাও দেখেছেন, মাঠে মাঠে আখের চাষ। স্ট্যাভোরিনাস (Stavorinus) তাঁর Voyages to East Indies গ্রন্থে বলেছেন, উত্তর বাংলার ঘোড়াঘাট অঞ্চলে প্রচুর আখচাষ হয়। রেনেলের জার্নালও বলছে সেকথা—Country (Bengal) is generally well cultivated in sugar cane.

কিন্তু বাংলাদেশের চাষীরা জানতো না, এই আখের রস থেকে কি কি হতে পারে। তাদের দৃষ্টি গ্রামের পরিধির ভেতরে সীমায়িত। এই চিনি তথা আখ মাড়াই প্রসঙ্গে সেকালের বাংলার গৃহস্থবাড়ির ছবি পাওয়া যায় কোন প্রাচীন গ্রন্থে।

"বাড়ির প্রাঙ্গনে আখমাড়াই আরম্ভ হলেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে জাগতো উল্লাসের ঝিকিমিকি। একদিকে দীর্ঘ আখগাছের পাতা ছড়ানো হচ্ছে; আর একদিকে আখ পেষার কাজ চলছে। পেষনযন্ত্রটি ছিল অদ্ভুত। দুটো মোটা মোটা লোহার রড পাশাপাশি ঘুরছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। দুইটি রডের মাঝখানে আখের দণ্ডটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নীচে একটি বড় গামলায় রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। মিষ্টি রসের গন্ধে মাছি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাটী, গ্লাস, যে যা পায় তাই নিয়ে এগিয়ে আসে! যদি টাটকা রস পাওয়া যায়।"

শুধু ছোটরা নয়। বড়রাও এই মিষ্টি রসের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। রস জ্বাল দিয়ে গুড় করার আগেই প্রচুর রস অপচয় হয়।

রাত্রির অন্ধকারে হতো আখচুরি! আর তাছাড়া আখ থেকে চিনি প্রস্তুতের প্রণালী তো জানতো না গৃহস্থরা। তারা জানতো না যে চিনি আন্তর্জাতিক ব্যবসার সামগ্রী হতে পারে, এবং জানতো না চিনিকে কেন্দ্র করে নিখিল বিশ্বমস্তিষ্কে ব্যবসাবুদ্ধি ধূমায়িত হয়ে

উঠেছিল। দূর নিভৃত পল্লীর চাষীর পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। তারা কি করে জানবে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেই ক্রুসেডাররা অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধারা সিরিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আখগাছের অঢেল ফলন দেখেছিল। অবশ্য ইউরোপের দেশে দেশে চিনির প্রচলন হতে লেগেছিল আরও পাঁচশো বছর। চতুর্দশ শতাব্দীতে চিনি যে কতবড় বিলাসের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যায় স্কটল্যাণ্ডে এক পাউণ্ড চিনির মূল্য ছিল এক আউন্স খাঁটী রূপো—এই খবরটুকুর ভেতরে!

যাহোক, গৃহস্থের এবং চাষীদের অজ্ঞতার জন্যই প্রচুর অপচয় হতো। কমে যেত উৎপাদন। বেড়ে যেত চিনির মূল্য। কিন্তু আখগাছের ফসল যারা ফলায় সেই চাষীরা আর চিনির ব্যবসায়ী মহাজনেরা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক। তারা অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিল—কেন উৎপাদন কমে যাচ্ছে! কারণ জেনে নিয়ে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল।

সরকার এই পণ্যসম্ভারের ব্যবসার উন্নতির জন্য মনোযোগ দিয়েছিল—সেকথা আগে বলা হয়েছে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার চিনি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল না। তখন সরকারী প্রতিনিধিরা বাংলা ছেড়ে অন্য প্রদেশের দিকে নজর দিল। দেখা গেল গুড় চিনির আদি উৎস এই আখ বড় অদ্ভুত গাছ। শুধু বাংলার নরম মাটি নয়—সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি মহারাষ্ট্রের অনুর্বর মাটিতেও আখ জন্মায় প্রচুর।—They (Government) started purchasing canes from neighbouring provinces, mainly Beneras.[২৯]

ওদিকে বহির্ভারতে প্রচুর চাহিদা চিনির। বিদেশী সরকার চিনি কিনতে লাগল বেনারস থেকে, কিনতে লাগল বোম্বাই থেকে, ভারতবর্ষের আরও বহু বিখ্যাত নগর ও পল্লী থেকে।

কিন্তু আবার একটি পত্রাঘাত[৩০] হলো। এই চিঠির মূল্য আছে চিনির ব্যবসার ইতিহাসে। মিস্টার বেব (Mr. Bebb) নামে বেঙ্গল বোর্ড অফ ট্রেডের একজন বুদ্ধিদীপ্ত সক্রিয় সভ্য ১৭৯০ সালের ৯ই জুলাই তারিখে লিখেছিলেন সরকারকে। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হলো—

বাংলাদেশ থেকে ধান, চাল, চিনি, সিল্ক এবং সিল্কের সুতো রপ্তানী হয় প্রচুর। উইলসন সাহেবের Early Annals of English in Bengal-এ দেখা যাচ্ছে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে হুগলী বন্দরকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ধান, চাল, রেশম তুলোর সঙ্গে চিনিও আসতো কিছু সামান্য পরিমাণে। কিন্তু কম হলে কি হয়, সে চিনির তুলনা হয় না।

'বেঙ্গল সুগার'। শুধু এই কথাটা শুনতে পেলে পৃথিবীর কোন দেশ আর অন্য কোন চিনি কিনবে না। বোম্বে সুগার, মারহাট্টা সুগার, ইউ. পি. সুগারের স্বাদ বেঙ্গল সুগারের কাছে কিছুই নয়। বাংলাদেশের চিনির স্বাদ অত্যন্ত মিষ্টি। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের চিনি কেমন জলো, কেমন পানসে!

শুধু তাই নয়। মদ তৈরির মূল উপাদানও কিন্তু গুড় ও চিনি। বাংলার চিনি দিয়ে খুব উৎকৃষ্ট রাম (এক ধরণের মদ) হতে পারে। বিদেশে যারা একবার বাংলার চিনি দিয়ে মদ তৈরি করেছে তারা শুধু চায় 'বেঙ্গল সুগার'।

এই পরিস্থিতিতে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি মহানুভব সরকার চিনির রপ্তানীর পরিমাণ বিদেশে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে কিছু বিদেশী মুদ্রা ঘরে আসে। দেশও সমৃদ্ধ হয়!

এই চিঠিতে কিছু কাজ হয়েছিল। ১৭৯৯ সালেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২৯,৮০৭ টন চিনি—খাঁটী বেঙ্গল সুগার রপ্তানী করতে পেরেছিল। আর বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ থেকে রপ্তানী করেছিল ১,৬৭০,৮৩২ পাউণ্ড মূল্যের চিনি।

নীচে চার বছরের রপ্তানীর হিসেব দেওয়া হলো। যেসব দেশে রপ্তানী হয়েছে সেসব দেশের নাম দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু আমেরিকা ও লণ্ডনের নাম উল্লেখ করা হলো[৩১]—

	রপ্তানীর পরিমাণের মূল্য সিক্কা টাকায়	রপ্তানীর পরিমাণের মূল্য সিক্কা টাকায়	
		লণ্ডন	আমেরিকা
১৭৯৫-৯৬···	৮,২০,১৮৬	৩,০৫,০৫১	···১,২৬,১৭১
১৭৯৬-৯৭···	১১,৫৭,৭১৫	৪,৭৭,০০০	···৩,৩৪,২৪৬
১৭৯৭-৯৮···	৮,৪৬,৭৫২	১,৮২,৬৫৯	···৫,১৯,৮৩৫
১৭৯৮-০৯···	১৪,০১,৬৪৫	৩,৭৫,৯৯১	···১,৭০,৮৬০

ওপরের হিসাবে লক্ষণীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা বিদেশী সরকার শত চেষ্টা করেও বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে রপ্তানী বাড়াতে পারে নি, অর্থাৎ বাড়াতে পারে নি বেঙ্গল সুগারের উৎপাদনের পরিমাণ।

তাই পৃথিবীর বহু দেশে 'বেঙ্গল সুগার' আকাশের তারার মতই সুদূর হয়েই রইল।

নীল

বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি নীলের কথা বলা না হয়। বাংলা থেকে ইংরেজদের রপ্তানী পণ্যের ভেতরে নীল একটি প্রধান পণ্য। নীল এক রকমের রঙ। এই রঙ তৈরী হতো ছোট ছোট গাছের পাতা থেকে। নীলের বিজ্ঞানসম্মত নাম 'টিঙ্কটোরিয়া', তুরস্ক ও আফ্রিকার অরণ্যে জন্মাতো হাজারে হাজারে। নীল বহু রকমের হতো। প্রকৃত নীল, বেগুনী মেশানো নীল, তাম্রাভ নীল ইত্যাদি। সত্যিকারের ভাল নীলের কতকগুলো গুণ ছিল, যেমন খুব হাল্কা, জলে ভাসবে। যদি জ্বলন্ত কয়লার

ওপরে ছুঁড়ে ফেলা যায় তাহলে নীলাভ ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে উঠবে।

নীলের গাছ থেকে তার পাতা, তার কাণ্ড তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে মেড়ে কেকের মত প্রস্তুত করা হতো। এই কেকগুলির রঙ হতো ঘন নীল। তাতে এতটুকু সাদার আভাস থাকত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর রেকর্ডে পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে বৃটিশ উপনিবেশের জমিতেই ইংরেজরা প্রথমে নীলের চাষ করেছিল। সেখান থেকেই ইংল্যাণ্ডে আসতো উৎকৃষ্ট নীল। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যামাইকা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের ইংরেজ প্ল্যাণ্টাররা নীলের চাষ বন্ধ করে দিল। ইংল্যাণ্ডকে তখন নীলের জন্য নির্ভর করতে হলো ফ্রান্স ও স্পেনের উপরে। বহু টাকা নীল কিনতে বেরিয়ে যেতে লাগল। ওদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন ইংরেজরা প্রভুত্ব করতে শুরু করেছে। সুতানটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে তাদের কায়েমী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ঠিক এই সময় বাংলার মাটিতে নীলের চাষ শুরু করেছিল ইংরেজরা। তবে আরও অনেক আগে ঠিক কবে—কোন সুদূর অতীতে যে নীলের চাষ আর এই শিল্প শুরু হয়েছিল তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। সুপ্রাচীনকালের গ্রন্থে পাওয়া যায়—আমাদের অতীত পুরুষেরা এই রঙের অস্তিত্ব জানতেন। তার আভাস পাওয়া যায়। হাকলুটস সাহেবের গ্রন্থে In Hackluyt's "Remembrance to his Master S" ১৫৮২ সালে, তাঁকে তাঁর দেশের (বেলজিয়াম) রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে জেনে এস—বলেছিল,[৩২] If the Anile that coloureth, blue be a natural commodity of India, and if it were compounded on herb, then please bring the seed or root with the order of sowing.

শুধু নীলের বীজ কি শিকড় আনলে চলবে না, জানতে হবে কেমন করে নীল বুনতে হয়। কিন্তু—সে যাই হোক সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রধান উপাদানই ছিল নীল।[৩৩] In the early period of the English trade with East Indies, indigo from Agra formed the most extensive and profitable branch of the company's imports.

এক আগ্রা থেকেই লক্ষ লক্ষ বেল নীল দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যেত।[৩৪] Company's trade in Indigo was carried on for more than a century with considerable success. দীর্ঘ এক শতাব্দীরও ওপরে ইংরেজদের বাণিজ্য খুব কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল। হয়তো বাংলাদেশে নীল চাষের প্রয়োজনই হতো না, হতো না চাষীদের ওপর ব্রিটিশ প্লান্টারদের মর্মান্তিক অত্যাচার আর দীর্ঘ শত শত বছরের ব্যাবধানকে পেরিয়েও তাদের নৃশংস নিপীড়নের কথা জেনে শিউরে উঠতো না একালের মানুষ। দীনবন্ধুকে লিখতে হতো না নীল দর্পণ। কিন্তু কেন ইংরেজরা—নীলের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বাংলার চাষীদের ওপর মর্মান্তিক অবিচার করেছিল? আগ্রা থেকে নীল রপ্তানী করতে করতে একবার ৮০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা থেকে নীল কেনা হলো বন্ধ। আর শুরু হলো বাংলায় নীলের চাষ। কিন্তু চাষীদের ওপরে তীব্র অত্যাচারের কারণ হলো, নীলের চাষ এবং ব্যবসাটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল তাদেরই কর্মচারীদের ওপরে। তাদের মাইনে কম। নীল উৎপাদন করে আর সেই পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে যদি দুটো পয়সা করতে পারে তাহলে ভাল—Company agreed to leave it in hand of their servants......for remitting their fortunes to England.[৩৫]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই নীলকর সাহেবরা ছিল এক একটি খুদে নবাব। দূর দূর গ্রামাঞ্চলে সুদৃশ্য বাংলো বাড়িতে দাসদাসী চাকর খানসামা পরিবৃত হয়ে রাজার মত মহিমায় বাস করতো। আর এদেশের হতভাগ্য কালো আদমী অসহায় কৃষকদের দিয়ে চাষ করাতো। একটু পান থেকে চুন খসলেই তাদের পিঠে পড়তো চাবুক। গরীব গোবেচারী মানুষগুলোকে মেরে ধরে যেমন করেই হোক উৎপাদনে বাড়াতে হবে এই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর তারা রাজার জাত, চাষীদের ওপরে যত খুশি অত্যাচার চালিয়ে যাও ওদের হয়ে টুঁ শব্দটি করার সাহস নেই কারো। এমন বোকাসোকা সহজলভ্য মজদুর আর কোন দেশে আছে। তাই নীল চাষের দেশ সেই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এক সাহেব রবার্ট হেভেন (Robert Heaven) ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার ডিরেক্টারদের চিঠি লিখছে: for permission to cultivate indigo in Bengal. বাংলার মাটিতে নীল চাষের অনুমতি চেয়েছিল।[৩৬]

রবার্ট হেভেনের মতো আরও অনেক ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টার এসেছিল বাংলায়। বেড়ে গিয়েছিল হু হু করে নীলের উৎপাদন। প্রোডাকসন তো বাড়ল কিন্তু বাংলার এই পণ্য নিয়ে ব্যবসা করেছিল কেমন করে ইংরেজরা।

In 1789-90 the East India Company entered into a contract with an enterprising resident of Calcutta engaged in the cultivation of indigo at a very encouraging price.[৩৭]

এই চুক্তির সূত্র ধরেই বাংলায় নীলের ব্যবসার প্রচলন হয়েছিল—কিন্তু কেমন করে কি শর্তে তার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন রেকর্ডে। তবে যাই হোক পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে বাংলার নীলের চাহিদা গেল বেড়ে। নীল

হয়ে উঠল—The article of indigo now bears a distinguished rank in the list of Asiatic produce.[৩৮]

সমস্ত এশিয়া মহাদেশের ভেতর থেকে সমুদ্র পারের দেশে যে সব দ্রব্য পণ্য হিসাবে পাওয়া যায়, তার মধ্যে হলো নীল সর্ব প্রধান। কিন্তু বাংলার ইংরেজ নীলকর সাহেবদের মন উঠল না। তারা ঠিক করল, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ালে চলবে না—কোয়ালিটিরও উন্নতি করতে হবে। চাষীরা তো তাদের হুকুমের চাকর। তাদের হুকুমে (শোনা যায় তারা নাকি কোন চাষীর মাথার ওপরে নীলের চাষ করতে চেষ্টা করেছিল) তারা মাঘের শীতে পুকুরের হিম জলে ডুবে থাকতেও পারে। অতএব তাদের ওপর ফরমান জারী হলো—বললেন—তোমরা আরও—আরও ভাল নীল জন্মাও, সেই নীল যেন গুণের দিক থেকে অন্য আরও সব নীলকে ছড়িয়ে যায়।

এমন নীল করতে হবে যেন ইউরোপের বাজারে সেই নীল সব থেকে সেরা ও সস্তা দরের নীল হয়। দেশের দিকে দিকে সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়।

সত্যিই বাংলার নীল প্রস্তুতের সাধনা একদিন জয়যুক্ত হলো। পৃথিবীর সব থেকে সেরা নীল প্রস্তুত করল বাঙালী। শুধু কোয়ালিটিতেই অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গেল না—পরিমাণেও সকলের চেয়ে তার মাথা উঁচু হয়ে উঠল।

হিসাব করে দেখা গেছে সমস্ত ইউরোপের মানুষ ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড নীল খরচ করে। কিন্তু সেই পরিমাণটা যদি বেড়ে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডও হতো তাহলে একলা বাংলাদেশ থেকেই তো সেই পরিমাণ নীল সরবরাহ করতে পারতো। ওরিয়েণ্টাল কমার্সের পাতায় নীলকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যের সেই অত্যুজ্জ্বল কৃতিত্বের কথা সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে।[৩৯] Only Bengal could supply the 40,00,000lb of nil consumed by the Europe.

বাংলা থেকে কত টাকা মূল্যের নীল লণ্ডনে রপ্তানী হয়েছিল তার তিন বছরের হিসাব এখানে দেওয়া হলো[৪০]—

১৭৯৫—৯৬	সিক্ক টাকা, ৬২, ৫১, ৪২৪
১৭৯৬—৯৭	৩২, ৩৩, ৭৯৭
১৭৯৭—৯৮	৫৪, ৫৯, ৮৪৪

পৃথিবীর কোন কোন দেশে বাংলা দেশের নীল রপ্তানি হয়েছিল তার একটা হিসাব নিচে দেওয়া হলো।

ডেনমার্ক	৩৮, ১৬২	পাউণ্ড
রাশিয়া	২, ৯৬, ৮৭৩	”
সুইডেন	৪৭, ১১৮	”
পোল্যাণ্ড	৮, ৫৪২	”
জার্মানী	২০, ৮০, ৩৩০	”
হল্যাণ্ড	৬,০ ১৩	”

পঞ্চদশ প্রবাহ

—বাঙ্গালীর বাণিজ্য, বাঙ্গালীর শিল্প একদিন তার বর্দ্ধিষ্ণু জেলগুলোকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো, সেই অতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ব্যবসাবাণিজ্য।

দিনাজপুর

রাজসাহী বিভাগের পশ্চিম প্রান্তের এই দিনাজপুর জেলা[১] ধানচালের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল ধান, পাট আর পাটের দড়ি। এই জেলার উত্তরভাগে রাজবংশী রমণীরা প্রচুর বস্তা (চটের থলি) প্রস্তুত করতো। দিনাজপুরের উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধী 'কাটারীভোগ' চালের যেমন চাহিদা ছিল তেমনি ছিল এই হাতে তৈরি বস্তার আর মেকলী নামে বন্য তৃণজাত মাদুরের। বিশ্বকোষ বলছে চালের সঙ্গে রপ্তানী হতো শন, তামাক, চিনি আর চামড়া। আমদানী পণ্যের ভেতরে ছিল বিলেতী কাপড়, লবণ, কেরাসিন তেল, কয়লা। এই জেলার পশ্চিমাংশের পণ্য প্রধানত চাল মহানন্দা নদী বেয়ে রপ্তানী হতো বিহারে, উত্তর-প্রদেশে। আর পূর্বাংশের পণ্য চলে যেত আত্রাই নদী বেয়ে এবং নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলপথ দিয়ে কলকাতায়, ফরিদপুরে, নদীয়ায়। এ জেলার প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম, রায়গঞ্জ, নিতপুর, চাঁদগঞ্জ, বিরামপুর ও পতিরাম। মহকুমাশহর বালুরঘাট থেকে আঠাশ মাইল দূরে ধলদীঘির (বঙ্গে মুসলমান যুগের সূচনার সমসাময়িককালের সন ১২০৪) উঁচু পাড়ে মাঘমাসে মেলা বসে।[২] এই মেলায় দেড়লক্ষ থেকে দুইলক্ষ লোকের সমাগম হয়। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এমন কি সুদূর আফগানিস্থান থেকেও গো-

মহিষাদি, ঘোড়া, ভেড়া, উট ও নানা রকমের পণ্যের বেচাকেনা চলতে থাকে প্রায় একমাস ধরে। আজও আছে এই মেলার অস্তিত্ব।

দার্জিলিঙ

চা-ই এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য। ধবলগিরি কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে অবস্থিত রাজশাহী বিভাগের সুদূর উত্তরে এই জেলার[৩] লেপচারা ঘরে ঘরে মোটা কার্পাসের বস্ত্র বয়ন করতো। সেই কাপড়ই এ জেলার পাহাড়ীদের কাপড়ের চাহিদা মেটাতো। চা'য়ের সঙ্গে ভুটিয়াদের তৈরি ছুরি কাঁচিও রপ্তানী হতো। পাহাড়ীরা নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনতো চীনেমাটির পেয়ালা, প্রবাল, আকীকের বাটী ও পুঁতির মালা। দার্জিলিঙের স্বাস্থ্যান্বেষীদের কাছে আজও যে এই পুঁতির মালা ও নানা বর্ণের পাথরের চাহিদা আছে তা বুঝতে পারা যায় ম্যালের পাশে সারি সারি দোকানগুলোতে জনসমাগম দেখে। এ জেলার প্রধান পণ্য হলো বিলেতী বস্ত্র, লবণ, কেরাসিন ও সরিষার তেল।

জলপাইগুড়ি

রাজশাহী বিভাগের আর একটি বর্দ্ধিষ্ণু জেলা জলপাইগুড়ি।[৪] এ জেলার প্রধান রপ্তানী পণ্য চা, তামাক, পাট, তুলো, চামড়া এবং ডুয়ার্সের অরণ্যের কাঠ। চা ও পাট যেত কলকাতায় আর তামাক-পাতা কিনতো আরাকানীরা। তারা আবার এই তামাকপাতা পাঠাতো ব্রহ্মদেশে। পশ্চিম ডুয়ার্সের বৈকুণ্ঠপুরের গভীর অরণ্য থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর খরস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো কাঠ। সেই কাঠ চলে যেত সিরাজগঞ্জে। ভুটান থেকেও এখানে আমদানী হতো কাঠ আর কমলা। চাল আসতো দিনাজপুর থেকে। ঢাকা, ফরিদপুর থেকে নদীপথে বড় বড় বজরায় বোঝাই হয়ে

আসতো মাটির হাঁড়ি-কলসী, গুড় আর কিছু ডাল। প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল, জলপাইগুড়ি শহর ও মহানন্দা নদীর পাড়ে তিতাসারা, করতোয়া তীরে অবস্থিত রাজনগর, সালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ আর তা ছাড়া, জোড়পকরী, ফলাকাটা, আলিপুরদুয়ার, বক্সা।

মালদহ

উত্তরবঙ্গের নৌবাহনযোগ্য নদী মহানন্দার পাড়ে অবস্থিত মালদাহ শহর[৫] এ জেলার একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। রাজশাহী বিভাগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই জেলার মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বাধীন বাংলার রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ। এ জেলার প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্য— রেশমের সুতো, রেশমকীট বা পলু, চাল, আম, পাট আর আমদানী হতো কার্পাসজাত বস্ত্র, গম, বার্লি, তৈলবীজ, বিলেতী কাপড়, নারকেল, পান, কাগজ, ঘি, গুড়, চিনি, তামা, কাঁসার বাসন, কেরাসিন, তেল, জুতো এবং ছাতি।

রেশম ব্যবসা প্রাচীনতম ব্যবসা। রেশমের মতই আমের ব্যবসাও বাঙালীদেরর একটি অতি প্রাচীন ব্যবসা। সবচেয়ে আশ্চর্য। আমবাগানের মালিককে দূর দেশে আম রপ্তানীর জন্য এতটুকু পরিশ্রম করতে হতো না, করতে হতো না এতটুকু চিন্তা। যেই জ্যৈষ্ঠের শুরুতে আম পাকে ঠিক এই সময় মহানন্দায়, গঙ্গায় দেখা যেত ব্যাপারীদের বজরা। তারা আসতো পদ্মা পার হয়ে পাবনা থেকে, আসতো ঢাকা থেকে, রাজসাহী থেকে আরও দূরের নানা জেলা থেকে। ব্যাপারীরা মালদহে এসেই আমবাগানের মালিকের আম নিয়ে দরদস্তুর করতো। আম কিন্তু তখনও গাছে। কখনো কখনো গোটা আমবাগানটাই জমা নিত ব্যাপারীরা। দর ঠিক হয়ে গেলে ব্যাপারীরা নিজেদের লোক দিয়েই আম পাড়িয়ে নিয়ে নৌকোর পাটাতনে তুলতো। তারপর আবার বজরা ভাসিয়ে চলে

যেত কলকাতায়, ফরিদপুরে, পাবনায়, ঢাকায়। বিখ্যাত সুস্বাদু আম্রফল বিক্রি করে আবার মালদহের লোকের ঘরেও দুটো পয়সা আসতো।

আধুনিক মালদহের যে জায়গাকে বলে ইংলিশবাজার, সেখানে একদিন বাঙালীর পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসা জমে উঠেছিল। আজ কেউ কামারশালা খুলে পেটের ভাত করতে পারবে, এমন দুরাশা পোষণ করে না—কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ইংলিশবাজারে আর নবাবগঞ্জের ছয়শো তিপান্ন জন বাঙালী শুধু লোহালক্কড় ও পিতলের ব্যবসা করে আনন্দে হেসে-খেলে জীবন কাটিয়েছে, তার নজীর আছে ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে।

মালদহের বাইশ মাইল দূরে আধুনিককালের মাণিকচক। মাণিকচকের উপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই গঙ্গার ওপারে সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড় ডিঙিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে এই জেলায় এসেছিল সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা। তারা নিয়ে এসেছিল লাক্ষাগাছের বীজ। এখন লাক্ষা ব্যবসা লুপ্ত হয়ে গেছে এই জেলা থেকে। মাছের ব্যবসাতেও একদিন এই জেলার অধিবাসীদের কিছু কিছু অন্নসংস্থান হয়েছে। কিন্তু এই মাছ, আম, ধান যত লোকের জীবিকা নির্বাহ হতো, তার চেয়ে বেশী লোকের পেটের ভাত জুগিয়েছে শুধু রেশম ব্যবসা। সুবুলপুর, জালালপুর, আমিনগঞ্জ হাট ছিল পলু বিক্রির জন্য বিখ্যাত।

আশি বছর আগে লেখা একটি পুরানো গেজেটিয়ার বলছে, তখন ইংলিশবাজারের কাছে সাহাপুরে এবং শিবগঞ্জে প্রায় একশো-চল্লিশটি বাঙালী পরিবার* সিল্কের কাপড় বুনতো। এই একশো-চল্লিশের ভেতরে আবার পঞ্চাশটি পরিবার তৈরি করতো মটকা আর বাদবাকী গরদ কিংবা খাঁটি সিল্কের কাজ করতো। ইংলিশ-

* Malda District Gazetteer.

বাজার, নবাবগঞ্জ, পুরাণোমালদহ, রহনপুর এবং ভোলাহাট এ জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র।

পাবনা

এই রাজসাহী বিভাগের ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ আর একটি জেলা হলো পাবনা।[৬] গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে নদীপথ পাবনার বাণিজ্যকে উন্নত করেছিল। এখানকার অপর্যাপ্ত পরিমাণ পাট, সিরাজগঞ্জ থেকে চলে যেত নারায়ণগঞ্জ, কলকাতায়। পাট রপ্তানী হতো উল্লাপাড়া, ভাঙ্গুরা, ঈশ্বরদি, সাঁড়া, নাজিরগঞ্জ, সাতবাড়িয়া, জাগরকান্দি, নাকালিয়া, বেড়া থেকে, আর মটর খেসারির ডাল চালান হতো বগুড়ায় এবং মৈমনসিংহতে। বেলকুচি থানার খাজারুল্ল্যাপাড়া থেকে রপ্তানী হতো উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি। ঠাকুর পরিবারের কাছারী-বাড়ি সাহাজাদপুর এবং পতাজিয়া, জামিরতা থেকেও ঘি চালান হতো। সাঁড়া থেকে সিরাজগঞ্জ লাইনের প্রত্যেকটি স্টেশন থেকে কলকাতায় চালান হতো হাঁস-মুরগী ও তাদের ডিম। আর আমদানী পণ্যদ্রব্যের ভেতরে ছিল রংপুরের বিখ্যাত উৎকৃষ্ট পাট, পাট আসতো মৈমনসিংহ, বগুড়া থেকে। এই পাট থেকে সিরাজগঞ্জের চটকলে তৈরী হতো বস্তা। সেই চট রপ্তানী হতো কলকাতায়। আর আসতো লবণ, কেরাসিন তেল, বিলেতী কাপড়। সিরাজগঞ্জে গেঞ্জীর কলও ছিল। বস্ত্রশিল্পেও খুব উন্নত ছিল পাবনা। প্রায় ৯৫০০ তাঁত চলতো বিভিন্ন গ্রামে। পাবনার সদর মহকুমার সাহুল্ল্যাপুর, নিশ্চিন্তপুর, আমিনপুর আর সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনে ভেলুয়া, গাছাপুর, ছোটাধুল থেকে উকৃৎষ্ট বস্ত্র-সম্ভার অন্যান্য জেলায় রপ্তানী হতো। গ্রামাঞ্চলে কিছু আদিবাসীরা বেতের ঝুড়ি বুনে এবং ভেড়ার লোম থেকে কম্বল তৈরী করেও জীবিকা নির্বাহ করতো। পাবনার মৃৎশিল্পেরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। সাধারণ হাঁড়ি-কলসী স্থানীয় কুম্ভকাররাই করতো—কিন্তু বড় বড়

জালা, চাড়ি, মটকী এবং পাতকুয়ার রিঙ তৈরী করতো নদীয়া থেকে আগত কুম্ভকাররা।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলার একদা রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্রের জন্য বিপুল খ্যাতি ছিল। শত শত শতাব্দীর পূর্বের সিল্ক ব্যবসার সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে রামপুরবোয়ালিয়ায় আজও পড়ে রয়েছে পর্তুগীজদের রেশমকুঠির ধ্বংসাবশেষ। আছে শরদহে, মতিহারে সিল্কের কারখানার বিলুণ্ঠিত ভগ্নস্তূপ, কাঁটাগাছ আর জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু একদিন সহস্র মানুষের পদশব্দে মুখরিত হয়ে থাকতো সিল্কের এইসব কারখানা বাড়ি। একজন ভারতপ্রেমিক ভদ্রলোক মিঃ হলওয়েল বলেছেন, "In 1759 six kinds of cloth and raw silk as being exported from Nator both to Europe and the markets of Bussora, Mocha, Pegu and Malacca.[৭]

খৃষ্টিয় ১৭৫৯ সালে ছয় রকমের কাপড় এবং মোটা সিল্ক নাটোর থেকে ইউরোপে রপ্তানী হতো। ইউরোপ থেকে চলে যেত মধ্য-প্রাচ্যের বসোরা, মোচা (আরব), পেগু, মালাক্কায়। নাটোরের সিল্কের কাপড় বসোরার বাজারের শো-কেসে ঝলমল করতো।

শুধু কি রেশম? একদিন নাটোর মহকুমার একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম—কলমগ্রামে একশো কি দুইশো পরিবার শুধু পিতল-কাঁসার ভরনের বাসন তৈরি করেই পেটের ভাত জোগাতো। কাঁসারীরা বাসুন তৈরি করে বড় বড় বজরায় তুলতো। তারপর নদীর ঢেউ পাড়ি দিয়ে দিয়ে চলে যেত দূর দূরান্তরে। চলনবিল থেকে নৌকো করে একেবারে আত্রাইয়ের উত্তাল স্রোতের উজান ঠেলে চলে আসতো বালুরঘাটে, পতিরামে, কুমারগঞ্জে। কোন

জনবহুল শহরে বজরা নোঙর করে তারা পাড়ায় পাড়ায় বাসন ফেরী করে বিক্রি করতো। নিস্তব্ধ দুপুরে কাঁসরের আওয়াজ উঠতো আচমকা ঠং-ঠং-ঠং, সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় ডাক শোনা যেত-পিতল-কাঁসার-বাসুন নেবেন--মা।

রাজশাহী জেলার বেশীরভাগ ব্যবসাবাণিজ্য হতো কলকাতার সঙ্গে।[৮] এখান থেকে রপ্তানী হতো চাল, বিভিন্ন রকমের ডাল, রেশম আর গাঁজা। আর আমদানী হতো বিলেতী বস্ত্র, কেরাসিন ও লবণ। আত্রাই নদীর ওপরে বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ আত্রাইঘাটে র‍্যালি ব্রাদার্সের একটা চটকল ছিল। নাটোরে ছিল রেন্নুউইক কোম্পানীর চিনির কল। পদ্মার ওপরে গোদাগাড়ী সুলতানগঞ্জ, রামপুরবোয়ালিয়া, চারঘাট, বড়াল নদীর পাড়ে গুরুদাসপুর, আত্রাই নদী তীরস্থ কালিগঞ্জ, প্রসাদপুর আর যমুনার পাড়ে নওগাঁ শহর ছিল এ জেলার ব্যবসাকেন্দ্র।

রংপুর

ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা আর ধারিয়া বিধৌত বর্ধিষ্ণু রংপুরের তামাক[৯] একদিন বিখ্যাত ছিল। রংপুরের তামাক দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যেত। ডোমার, দারবাণী, সৈদপুর ও রংপুর শহর পাটের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার বলছে, এখানকার পাট রপ্তানী হয়ে যেত কলকাতায়। তামাক কিনতো আরাকানের বণিকরা। আর রপ্তানী হতো সরিষার তেল এবং মিহিদানার চিনি। এ জেলার গ্রামে গ্রামে প্রচুর বেতের এবং শরগাছের জঙ্গল দেখা যেত। বেতের ধামা এবং শরগাছ থেকে মাদুর তৈরি করেও জীবিকা নির্বাহ করতো এ জেলার আদিবাসীরা। প্রধান আমদানী পণ্য ছিল নারকেল, লবণ, কেরাসিন, কয়লা আর চাল। বেশীর ভাগ চলে যেত দিনাজপুরে।

বগুড়া

রাজশাহী বিভাগের আয়তনে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এই জেলার প্রধান আমদানী পণ্য ছিল উত্তরবাংলার অন্যান্য জেলার মতই বিলেতী বস্ত্র, লবণ ও কেরাসিন। তবে তামাকের জন্য বগুড়াকে[10] নির্ভর করতে হতো রংপুরের ওপরে। আর বর্দ্ধমান ও মানভূম থেকে আসতো কয়লা। বগুড়া থেকে শান্তাহার পর্যন্ত ব্রাঞ্চ লাইন খোলার পর এ জেলার আদমদীঘি, শুকানপুকুর এবং সোনাতলা ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নাগর নদীর ওপরে ধূপচাঁচিয়া, বুড়ীগঞ্জ আর করতোয়া তীরস্থ সুলতানগঞ্জ পাটের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল সারিয়াকান্দি, নোয়াখালি, গোঁসাইবাড়ী আর ধুনোটের অপর্যাপ্ত পাট বজরা বোঝাই হয়ে চলে যেত করতোয়ার ঢেউ পাড়ি দিয়ে সুদূর সিরাজগঞ্জের চটকলে।

এবারে বর্দ্ধমান বিভাগের, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর এই ছয়টি জেলার ব্যবসাবাণিজ্যের আলোচনায় যাওয়া যাক।

হুগলী

গঙ্গার এপারে কলকাতা আর ওপারে হাওড়া, হুগলী আর পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হুগলীর[11] প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হলো শেওড়াফুলি, মগরা, ভদ্রেশ্বর, বালি আর দেওয়ানগঞ্জ। বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাস হুগলীর গঙ্গার পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়া। ঘাটে থরে থরে জমে রয়েছে, এই গঙ্গার স্রোত বেয়েই এসেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ইংরেজ। *বিদেশীর সংস্পর্শে এসে এখানকার বহু বাঙালী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসেছিল ও বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।*

হুগলী শহরের গা ঘেঁষে বারোমাস নৌবাহনযোগ্য নদী ভাগীরথী। কাজেই হুগলী চুঁচুড়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। চুঁচুড়া

থেকে কিছু দূরে মগরা। এই মগরার বহু জোতদার আর মধ্যবিত্ত মানুষ ধান, চাল, গোল আলু, খৈল, কলাই, পাট প্রভৃতির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মগরার দক্ষিণে তারকেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। বিখ্যাত শিব-রাত্রির মেলা। লোক আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে, আসে পাঞ্জাব থেকে, আসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। বাঙালী সওদা-গরেরা এই মেলায় আসে। হরেকরকমের জিনিসের সওদা দিয়ে তারা পসরা সাজায়। এই সময় দু-পয়সা তাদের ঘরে আসে।

কিন্তু তারকেশ্বরের মেলায় বাঙালীর বাণিজ্যের কাহিনীও পুরাণো। আজও পুরাণো দিনের মত মেলা বসে। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিছু কিছু বাঙালী কৃষক শ্রেণীর লোক, কিছু মনোহারী দোকানের মালিক আসে—আর আসে—বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী ব্যবসাদার। তারকেশ্বরের খ্যাতি আছে আজও তার মন্দিরের জন্যে। তার শিবরাত্রির মেলার খ্যাতি আজ আর ততটা নেই। আজ তারকেশ্বরের চারিদিকে কলকারখানায় ভরে গিয়েছে। যাকে বলে পুরোপুরি শিল্পাঞ্চল। আজ এখানকার বাঙালী মজুর খাটে কলে। ব্যবসা করে না বললে ভুল হবে—যা করে তা খুব উল্লেখ-যোগ্য কিছু নয়।

শ্রীরামপুর। গঙ্গাতীরের বহু প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত বর্দ্ধিষ্ণু শহর। বাঙালীর সাহিত্য, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর বাণিজ্য একদিন এই সুপ্রাচীন জনপদ থেকেই দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। এইখানেই বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আর বঙ্গেশ্বরী কটন মিল—দু'টি কারখানা বাঙ্গালীর বাণিজ্য পটুতার নিদর্শন স্বরূপ গড়ে উঠেছিল। খাঁটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান।

শেওড়াফুলি আর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখনকার হাট খুব বিখ্যাত। এখনও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুখে শোনা যায় শেওড়াফুলির হাটের কথা। এই শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর লাইনের শুরু।

তাই শেওড়াফুলি—জংশন। এখনকার হাট শুধু প্রাচীন নয়, বড়ও। বড় বড় মহাজনরা জিনিস পাইকারী বিক্রি করে। তারপর এই জিনিস চলে আসে কলকাতায়। এই মহাজন ও পাইকারী ক্রেতারা অনেকেই বাঙ্গালী।

বৈদ্যবাটী। কলিকাতা থেকে ট্রেনে চুঁচুড়া যাওয়ার পথে দেখা যায় বহু বাগানে সতেজ পুষ্ট কলাগাছের অপরূপ শোভা। এই বাগানের মালিকরা অধিকাংশই বাঙ্গালী। শুধু কলা নয়—এখানকার লাউ, কুমড়োও বিখ্যাত। বহু বাঙ্গালী শুধু তরকারী বিক্রি করেও কিছু আয় করে।

চন্দননগর। বহুদূর অতীত থেকে এই শহর অদ্ভুত একটি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। সুগঠিত ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভেতরে একটি পকেটের মত ছিল ফরাসী শহর (এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত চন্দননগর ফরাসীদের অধীন ছিল) ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলেই বাঙ্গালীদের ব্যবসা বহুদূর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। এখানকার প্রাচীনকালের বস্ত্রবয়নকারীদের নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। ফরাসডাঙ্গার ধুতি—এই নামটা আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। এই ফরাসডাঙ্গার ধুতির সৃষ্টিকারীরা ছিল চন্দননগরের বাঙ্গালী অধিবাসী।

হুগলী শহরের কারিগরা এককালে এমন সুদৃশ্য ছাতার কাপড় তৈরি করতে করতে পারতো যে বিদেশী বণিকরাও সেই সুদৃশ্য কাপড় দেখে মুগ্ধ হতো। তারা জাহাজ বোজাই করে ছাতার কাপড় অর্থাৎ Ginghams[১২] নিয়ে যেত। ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়, Balagarh is the seat of boat building. বহু-বহু প্রাচীনকালে বলাগড়ে নৌশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এই বলাগড়ের কারখানার তৈরি সুদৃশ্য জলযান অনেক—অনেক যুদ্ধ জয় করেছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকুলের পল্লী অঞ্চলের অগাধ শান্তি বিঘ্নিত করতো ফিরিঙ্গী আর মগী জলদস্যুরা। কোন্নগর

কি বলাগড়ের তৈরি ছিপ ছিল, সুগঠিত আর দ্রুতগামী নৌকো দেখলেই ত্রাসে সেই হিংস্র জলদস্যুদের দরজার কবাটের মত শক্ত বুকও দুরু দুরু কেঁপে উঠতো।

কোন্নগরে যে নৌশিল্পের কারখানা ছিল—সেকথা ক্রফোর্ড সাহেবও উল্লেখ করেছেন। নৌকো নির্মানের কারখানা ছিল শ্রীরামপুরেও। আজও শ্রীরামপুরে গঙ্গার পাড়ের মাটি খুঁড়লে বেরিয়ে আসে পুরানোকালের ভাঙ্গা পাটাতন আর মাস্তুলের ভগ্নাংশ।

মোগলযুগে হুগলী জেলায় কাঁসার ও পিতলের ব্যবসায় বাঙ্গালীরা খুব উন্নতি করেছিল। এ জেলার কাঁসারীগণ নিপুণভাবে বাসন প্রস্তুত করতে পারতো। কুমারগঞ্জ, বৈঁচি, খামারপাড়া, বংশবাটী, মেরারহাট, মাহেশ গ্রামের ঘরে ঘরে বাঙ্গালী কারিগরেরা একদিন একখণ্ড পিতলের পাত থেকে নিপুণ ছন্দে আর নির্ভুল অঙ্গুলি-বিন্যাসে চমৎকার ও সুদৃশ্য জলাধার, থালা, রেকাবী, গ্লাস তৈরি করতো।

চাপাডাঙ্গা। হুগলীর একটি গণ্ডগ্রাম। কিন্তু শত শত শতাব্দীপূর্বে এই চাপাডাঙ্গা গ্রামে বহু দূর দূর দেশ থেকে বণিকরা আসতো, আসতো বিদেশীরা, শুধু কাঁসার তৈরি পানদানী কিনতে। বিলাসের সামগ্রী হিসেবে চাপাডাঙ্গার কারিগরদের তৈরি পানদানীর খুব আদর ছিল। নৌকো বোঝাই করে কলকাতায় রপ্তানী হতো রাশি রাশি পানদানী। কলকাতার পাইকারদের কাছে থেকে এই পানদানী কিনতো দেশদেশান্তরের বণিকেরা।

মোগল শাসনের বহু বহু যুগ আগে থেকেই হুগলীতে চালের ব্যবসায় বাঙ্গালীদের প্রচুর সমৃদ্ধি ছিল। এখানকার সুগন্ধী সূক্ষ্ম চাল কলকাতা হয়ে দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যেত। এই সম্বন্ধে William Hunter তাঁর ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে বলেছেন[১৩]—
Large quantities of this finer rice are grown in Hoogly···

হুগলীর মিষ্টান্ন শিল্পও খুব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই উপলক্ষে এক বিদেশী ঐতিহাসিকের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—The Bengalees are fond of sweets and sandeshes. It is a national trait.

হুগলীর দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে বাতাসে মাথা দোলায় সারি সারি খেজুর গাছ। এই খেজুর থেকে—বাঙ্গালী কারিগরেরা তৈরি করতো গুড়। গুড় থেকে চিনি। তাকে বলতো খেজুরে চিনি। আর ঘরে ঘরে তালের রস জ্বাল দিয়ে করতো তাল মিছরি আর গুড়। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বলছে[১৪] Date juice is made into Gur and refined into sugar and the same is done with Plam juice, the crystalline sugar (Michhri) produced from it being highly esteemed for medicinal value.

বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, নাটোরের কাঁচাগোল্লা যেমন খুব বিখ্যাত তেমনি এই জেলার জনাইয়ের মনোহরা, ধনিয়াখালির খইচুর, চন্দননগরের জলভরা তালশাঁস সন্দেশ, হরিপালের রসগোল্লা খেজুরের ঝোলা গুড়, কামারপুকুরের জিলিপীর খুবই খ্যাতি ছিল। গৌরহাটীর রসকরা, শ্রীরামপুরের গুঁফো সন্দেশের খ্যাতিও ছিল একদিন বহুদূর বিস্তৃত। আজ বহুদিন হলো—এই মিষ্টান্নশিল্প বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এ জেলার মাটি থেকে।

বর্দ্ধমান।

পশ্চিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী আর প্রাকৃতিক বদান্যতায় পরিপুষ্ট এই জেলার মাটি। 'বর্দ্ধমান' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে: কয়লার খনির কালো ধোঁয়ায় আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। যতদূর চোখ যায়, লোহার মত শক্ত লাল মাটির উঁচু-নীচু জমি। আর একদিকে রুক্ষ, অনুর্বর মাটিতে সবুজ আর সজল আশীর্বাদের মত দামোদরভ্যালীর বাঁধ।

সেখানে চলতে গেলে পায়ে পায়ে ঠেকে লোহা আর কয়লার টুকরো। লোহা আর কয়লার টুকরো নিয়েই বর্দ্ধমান।

তাই এ-জেলার বাঙালীরা খুব বেশি নির্ভর করে না কৃষিকাজের ওপরে। কৃষি-ব্যবসা পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা—অন্যান্য জেলায় বর্দ্ধমানের মত কল-কারখানা-খনি নেই, তাই তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখে। বৃষ্টির দেখা না পেলে আশঙ্কায় দুরু দুরু কাঁপে বুক। ভাগ্যকে মর্মান্তিক অভিশাপ দেয়। কিন্তু সেই সুদূর পুরাকাল থেকে বর্দ্ধমানের বাঙালীরা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। প্রায় একশো বছর আগে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী রাণীগঞ্জে লোহার কারখানা স্থাপন করেছিল। তখনি প্রায় এক হাজার চুয়াত্তর জন বাঙালী শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করতো।

তবুও এখানকার এই সুবিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের বাঙালীরা ছিল পরিশ্রমী। তাদের পেশীতে পেশীতে ছিল অটুট শক্তি। তারা বাঁকুড়ার, মুর্শিদাবাদের বস্ত্রশিল্পীর মতই তাঁত চালাতে পারতো অহরহ। স্বাধীন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করবে বলেই তারা মহাজনের দুয়ারে দাঁড়াতো ঋণের জন্য। মহাজনও এই ব্যবসার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুক্তহস্তে দাদন দিত। এই টাকা দিয়ে বর্দ্ধমানের সিল্কের কাপড়ের কারিগররা কিনতো রেশমগুটি। সিল্কের কাপড় বোনা হয়ে গেলে আবার মহাজনকেই বিক্রি করে নামমাত্র পারিশ্রমিক নিজে রেখে ঋণমুক্ত হতো।

কাটোয়ার বস্ত্রশিল্পী প্রদীপের ছায়া-কাঁপা আলোয় নিপুণ হাতে ক্ষিপ্রগতিতে যে সুদৃশ্য কাপড় বুনতো—তাই চলে যেত সুদূর দাক্ষিণাত্যে। মাদ্রাজের মুসলমানেরা মাথায় যে দীর্ঘ পাগড়ি পরে—সেটা কাটোয়া সিল্ক। কাটোয়া সিল্ক ছাড়া তারা আর কিছু ব্যবহার করতো না। কাটোয়া মহকুমার সাতনী, সিঙবাগ, হেমদপুর আর

গাছিয়ার তিন হাজার বাঙালী একদিন রেশমগুটি থেকে সিল্কের সুতো তুলেই অন্ন সংস্থান করতো।

সেকালের এই রুক্ষ রাঢ় দেশের পথে-প্রান্তরে দেখা যেত এক-একটা ছোট ছোট চালাঘর। সেখানে চলতো হাপর। লোহার হাতুড়ি-ছেনীতে ঠক ঠক শব্দ উঠতো। বর্দ্ধমানে বাঙালী কামারের অভাব ছিল না!

জি আর ওয়াটশনের[১৫] লেখা Monograph on the Iron and Steel Works in Bengal গ্রন্থে বলেছেন, দেশবিখ্যাত ছুরি, কাঁচি তৈরি করতো বর্দ্ধমানের বাঙালী কারিগররা। শুধু বর্দ্ধমান গেজেটিয়ারের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁদের স্মৃতি। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে:

"Best Cutlery shops at Bengal".[১৬]

কাটোয়া মহকুমার বেগনকোঠায় কিছু পিতল-কাঁসার কাজও হতো। বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯০৯ সালেও শুধু এই জেলাতেই ৬৪০১ মণ পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি হয়েছিল। অনেক বাঙালী শুধু এই ব্যবসা করেই অন্ন-সংস্থান করতো। বর্দ্ধমানের সদর মহকুমার বানপা আর দিনহাটার বাঙালীরা বিশেষ করে এই ব্যবসায় বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। বিড়ির পাতা আর তামাকের ব্যবসা করে আসানসোলের বহু বাঙালী পরিবার হেসে-খেলে জীবন কাটিয়েছে।

গোড়াতেই বলা হয়েছে, প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পুষ্ট এ জেলার মাটি। এখানকার মাতৃজঠরে বহুযুগ-সঞ্চিত সম্পদ থরে থরে জমে রয়েছে। হয়তো আবছায়া কুয়াশাময় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ভূখণ্ডের মাটি ছিল উর্বর, মাঠে মাঠে প্রচুর শস্যের সম্ভার সেকালের মানুষকে লোভের হাতছানি দিত। তারপর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই শস্যসমৃদ্ধ আর অজস্র প্রাচীন বট-অশ্বত্থের স্নেহচ্ছায়ায় সবুজ সরস মাটির দেশ পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভে বিলীন

হয়ে গিয়েছিল। তারপর যুগের পর যুগ কেটে গেল। সেই সুপ্রাচীন কালের বৃক্ষরা আরও ছোট-বড়-মাঝারি উদ্ভিদরা কয়লায় পরিণত হলো।

এই সম্পদ খুঁজে নিতে বেশি দেরী হলো না। এখানে মাটিতে লোহার ভাগ অত্যন্ত বেশি ছিল। বহু দূর-অতীতে যখন ইংরাজদের সংস্পর্শে বাঙালী আসে নি, তখনও বর্দ্ধমানের বাঙালী জমিদারদের যৌথ ব্যবসা ছিল লোহার। যে কেন্দ্র থেকে এই ব্যবসা পরিচালনা করা হতো, তার নাম লোহামহল বলে খ্যাত হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

শুধু কি লোহা আর কয়লা—কালনার কাছে এক ধরণের মাটি পাওয়া যায়, তাকে বলে বেহুটি মাটি। এই মাটি দিয়ে মৃৎশিল্পীরা সুদৃশ্য মূর্তি তৈরি করে। আর দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যায় সেই সব মাটির মূর্তি।

মেমারী আর রাধাকান্তপুরে ঘরে ঘরে রেশম বয়ন আর গুটিপোকা নিয়ে কাজ হতো। তসর তৈরিতে এ জেলার মানুষের নিপুণতা বিস্ময়কর। মানকড় অঞ্চলের পল্লীবাসী একদিন তসর তৈরি করেই অন্নসংস্থান করতো।

বর্দ্ধমানে একদিন ঢেঁকিতে চাল ছেঁটে অনেক বাঙালী দু' পয়সা আয় করতো। আড়ত আর আড়তদার, ধান, চাল, ঝোলাগুড়, তামাক, নানা রকমের কাপড় ও শস্য নিয়ে একদিন এখানকার বাঙালী কারবার করতো।

একদিন দামোদরের তীরে বিস্তীর্ণ শালের জঙ্গল ছিল। বাঙালীরা কাঠের ব্যবসা করেও বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। রাণীগঞ্জের মাটির হাঁড়ি, কলসী আর সরা তৈরির কারিগরদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না আজ। কিন্তু একদিন বাঙালী কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করেই পয়সা রোজগার করতো। আসানসোলে সুদূর অতীতে বাঙালীর জুতোর দোকান ছিল।

কালনা। রাণীগঞ্জের তুলনায় কালনায় কারখানা কম। এখানে হাটে-হাটে, গঞ্জে-গঞ্জে দেখা যেত বড় বড় আড়ত। আড়তে বোঝাই হয়ে থাকতো ছোলা, গম, মটর, মুগ, খেসারীর ডাল। বাঙালী ব্যবসা করতো। তারা কেউ ছিল আড়তদার, কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা। ব্যবসা ছাড়া তারা আর কেউ কিছু জানতো না।

আজ এ জেলার প্রধান রপ্তানী পণ্য হলো, লোহা, চাল বিভিন্ন রকমের কলাই, তৈলবীজ, খৈল আর আমদানী পণ্য, বিলেতী বস্ত্র, লবন, ক্যাস্টর অয়েল। কলকাতা মহানগরী খুব কাছে। তাই আমদানী রপ্তানী হয় সবচেয়ে বেশি কলকাতার সঙ্গেই। এ জেলার ব্যবসা কেন্দ্র হলো রাণীগঞ্জ, আসামসোল, বর্দ্ধমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে তার লাইন বসানোর বহু পূর্বে কালনা কাটোয়ার ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ছিল দেশজোড়া। যেই রেললাইন খুলল, কালনা কাটোয়ার ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব গেল কমে আর জমজমাট হয়ে উঠল রেললাইনের ধারে ধারে একদা জঙ্গলাকীর্ণ নগণ্য গ্রাম, মেমারী, মানকার, পানাগড় আর গুসকারা।

মেদিনীপুর

বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী অতি প্রাচীনকালের জেলা। বাঙালীর বাণিজ্যের বজরা সমুদ্রের হাওয়ায় সাদা পাল তুলে গতির আনন্দে উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিত এই মেদিনীপুরের অতিদূর অতীতের বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে। তাম্রলিপ্তের অতীত গৌরবের কথা লেখা আছে বাংলার বাণিজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে ; লেখা আছে মেদিনীপুরের পুরাকালের ইতিবৃত্তে। তাম্রলিপ্তের কথা আগেও বলা হয়েছে।

তাম্রলিপ্ত তো আজ প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকদের কৌতূহল। বাঙালীদের পুরাকীর্তিতে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের চিন্তার বিষয়। এককালের এই সামুদ্রিক বন্দরের ধ্বংসপুরীর পাশেই গড়ে উঠেছে কত নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র।

ঘাটাল। চন্দ্রকোণা। রামজীবনপুর। এই তিনটি স্থানের পিতল-কাঁসার কাজ আর খাবারের থালা ও ঘড়া তৈরি করেই অনেক বাঙালী স্বাধীন ব্যবসাকে পুষ্ট করে তুলেছিল। খুব চমৎকার এক ছবি পাওয়া যায় মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে।

'Out of 9000 population in those three villages 4000 are metal workers. The whole village resounds with the beat of hammer and the bell metal'....

গ্রাম গ্রামান্তরে হাতুড়ি আর ছেনির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে বহু দূরে চলে যেত। শুধু কি পিতলের থালা-বাসন—চীনামাটির কাপ-প্লেটও তৈরি করতো বাঙালীরা। ১৯০৭-৮ সালের হিসাবে দেখা যায় ৪৩১০৬০ মণ শুধু পিতল-কাঁসার ও খাঁগড়ার বাসন তৈরি হয়েছিল।

অন্যান্য জেলার মতই মেদিনীপুর জেলাতেও রেশমের ব্যবসা বিপুলভাবে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। অনেক বাঙালী শুধু রেশমের ব্যবসা করেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। মহেশপুর গড়প্রতাপপুর, রামচন্দ্রপুরে একদিন বাঙালীদের অনেক সম্প্রদায় শুধু সিল্কের সুতো তৈরি করেই সুখেভাতে থাকতো। তমলুক মহকুমার ঘাটাল, দাসপুর আর গড়বেতায় সিল্কের গুটির চাষ হতো রীতিমত।

গুকোই আর মুঙ্গার বিস্তীর্ণ জঙ্গলের গাছে গাছে রেশমের গুটি হতো। যখন রেশমের গুটিগুলো একটু একটু করে পুষ্ট হয়ে উঠতো তখন জঙ্গলের ভেতরটা অজস্র মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠতো। গাছ থেকে রেশমগুটি তোলার ধুম পড়ে যেত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কর্মমুখর জীবনের প্রবাহ আবর্তিত হতো। তারা ধুতি তৈরি করতো, তৈরি করতো শাড়ি। কখনো কখনো কলকাতায় চালান দিত।

তুলো আর উলের ব্যবসার প্রচলনও ছিল এ-জেলায়। প্রায়

সব গ্রামেই দেশী সুতো থেকে কাপড় তৈরি হতো তাঁতে। ঘাটালে এই ব্যবসার খুব সমারোহ ছিল।

পাঁশকুড়ায় আর সবাঙে একদিন হাজার হাজার লোক শুধু মাহুর তৈরি করেই পেটের ভাত জোগাড় করতো। গেজেটিয়ারে লিখছে :*

Mat-making is carried extensively in the south of the district especially.

এক সময় শুধু পাঁশকুড়ায় আর সবাঙেই প্রায় এক হাজার কর্মী আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মাহুর বুনতো।

কিন্তু এ-জেলার মাহুর, পিতল-কাঁসার, রেশম-তসর, তুলো-উলের ব্যবসাকে ম্লান করে দেয় লবণের ব্যবসা। সমুদ্রতীরবর্তী জেলা কাঁথির বহু জায়গার জলই লবণাক্ত। বাতাসে লবণের গন্ধ। হাওয়ায় বালি আসে উড়ে উড়ে। অদূরে সমুদ্রের আভাস।

হিজলীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লবণ ছড়িয়ে পড়ে থাকতো। যেমন ধানের মাঠ ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা থাকে, ঠিক তেমনি দীর্ঘ তটভূমি জুড়ে ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হয়ে থাকতো লবণাক্ত ভূমি। এক একটা ভাগকে বলা হতো খালারি ২৩৩ মণ।

শত শত শতাব্দী পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান যুগে লবণের ব্যবসার ওপরে শাসনকর্তাদের তীব্র লক্ষ্য ছিল। মুসলমান-শাসনের সময় এক একজন বণিক এই খালারি ইজারা নিত। এই সওদাগরদের উপাধি ছিল মালিক উল্ তুজ্জার। তাঁরা শুধু লবণের দামটা সরকারের রাজস্ব বিভাগে জমা দিতেন। তারপর লবণটাকে পরিশোধন করার খরচ, পরিবহনের খরচ ইত্যাদি মালিক উল তুজ্জার দিতেন। এই খরচ ও আসল দামটার ওপরে কিছু ধরে বাজারের দাম ঠিক করে বাজারে খুচরো বিক্রি করতেন। সে আমলে একশো মণ লবণের দাম ছিল ষাট টাকা। মালিক উল

* Midnapur District Gazetter p. 128.

তুজ্জারের সঙ্গে এই অঞ্চলের জমিদারদের যোগাযোগ ছিল। জমিদাররাও লবণের জমির জন্য ইজারা পেতেন।

যে কোন জমিই লবণ তোলার পক্ষে উপযুক্ত হয় না। সমুদ্রের তীরে যে জমির ওপরে ঢেউ খেলে যায় সমুদ্রের জোয়ারের সেই অংশটুকুর লবণ খুব উৎকৃষ্ট হয়। তারপরে প্রখর সূর্যের আলোয় একটু একটু করে সেই ভেজা জায়গাটা শুকিয়ে ওঠে। শক্ত হয়। তারপরে আসতো জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। তারা নিরীক্ষণ করে যেত।

জমিদার দেশের চারিদিকে বিভিন্ন মালিক উল তুজ্জারের কাছে লবণের জমির বিশদ বিবরণ দিয়ে নোটিশ পাঠিয়ে দিতেন। মালিক উল তুজ্জারদের অনুচররা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবলা দিয়ে মাটি তুলে চোখের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—কতটুকু লবণ—কি রকম লবণ।

তারপর যদি পছন্দ হতো তা হলে ইজারার টাকাটা জমিদারদের হাতে তুলে দিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে চলে যেতেন। তারপর আসতো কোদাল, আসতো গাঁইতি—আর আসতো তাদের অজস্র বাঙালী কর্মচারী। তারা কেউ খুঁড়তো লবণ, কেউ ভারে নিয়ে যেত—আবার কেউ শুধু খাতাপত্রে হিসাব রাখা খাজাঞ্চিও ছিল।

এই সব মালিক উল তুজ্জারের ভেতর আবার কেউ কেউ ছিলেন একচেটিয়া শুধু লবণের কারবারী। এঁদের বলা হতো ফকুর উল তুজ্জার।

এই লবণের ব্যবসার অতীত ইতিবৃত্ত বলতে বসে দূরকালের একটা ছবি ফুটে উঠছে চোখের সামনে ; শত শত বাঙালী প্রকৃতির অকৃপণ দানের উৎস, এই লবণের ওপরে নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করছে।

এল ১৭৮১ সন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল এল। তারা বেনিয়া। তারা অভিজ্ঞ চোখে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মাটির দিকে

তাকিয়ে দেখল, আছে ব্যবসার অফুরন্ত সম্ভাবনা। কাজেই যেই দেওয়ানী হাতে এল, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের বঞ্চিত করে লবণাক্ত মাটির যাবতীয় কর্তৃত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। দেশের লোক তখন তাদের লবণের কারখানায় কুলীর মত খেটেছে। নিজেদের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতাব কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে বহু যুগ আগে।

এই জেলার মহিষাদলে, এগরায়, জারীপুরে, গোপীবল্লভপুরে স্থায়ী বাজার সে আমলে খুব উন্নত ছিল। বহু বাঙালী ব্যবসাদারদের দোকান ছিল—আজ যুগের হাওয়ায় বহু অবাঙালী ব্যবসায়ীকে দেখা যাবে এই মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে, দেখা যাবে অনেক কলকারখানার কালো ধোঁয়া পরিবর্তনমান এই যুগেব পটভূমিতে সেই দূর বিগত দিনের তসর ও রেশমের নিপুণ কারিগর এবং লবণের স্বাধীন ব্যবসায়ী বাঙালী আর দেখা যাবে না।

পর্তুগীজ ও আরাকানী হিংস্র জলদস্যু অধ্যুষিত মেদিনীপুরের বালেশ্বর অঞ্চলটাকে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলের তদানীন্তন বাংলার নবাব শাহ্ সুজা। জুড়ে দিয়েছিলেন দুর্বৃত্তদের দমন করার এবং শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্যে। বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেই এই উপকূলবর্তী দেশে ব্যবসাবাণিজ্য সমৃদ্ধলাভ করেছিল।

হিজলীর পটভূমিতে আবার নতুন পরিবর্তন শুরু হলো। বাংলার মসলিন, বাংলার ইক্ষু, বাংলার ধানের লোভে আবার সমুদ্র পারের নতুন একদল বিদেশীর আনাগোনা শুরু হলো।

এল ওলন্দাজেরা। মেদিনীপুর গেজেটীয়ার বলে[১৭] In the 2nd quarter of XVII century Dutch began to trade here.

এল ইংরেজ। আলেকজান্দার হ্যামিল্টনের লেখার ভেতরে হিজলীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত জ্বলজ্বল করে।[১৮]

English appeared at the latter half of the century. At this time, Chandrakona, became famous for sugar and Radhanagar was the centre of trade in regard to cotton cloth and silkroomals or handkerchief. চন্দ্রকোনায় একদিন গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে আখমাড়াই চলতো। বড় বড় কড়াইতে করে আখের রস জ্বাল দেওয়া হতো। শত শত কর্মী অহরহো ব্যস্ত থাকতো গুড় ও চিনি তৈরিতে। কিন্তু আধুনিককালের চন্দ্রকোনার কোথাও এই চিনি ব্যবসায়ীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথাও নেই এই ব্যবসার সমারোহ!

কিন্তু একদিন ওলন্দাজরা ভিড় করে এসে দাঁড়াতো এই বিখ্যাত মিহি চিনির পণ্য কিনতে। আসতো ইংরেজ এবং ফরাসী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা চিনি কিনতে। রাধানগরের সিল্কের রুমাল একদিন বিলাসী মেয়েপুরুষদের তীব্র আকর্ষণ ছিল। বাংলার এই দূরতম নিভৃত পল্লীর বস্ত্রবয়নকারীর হাতের চিহ্ন চলে যেত বহু দূরের দেশদেশান্তরে। রাধানগরের এই সিল্কের রুমাল দেখে একদিন হ্যামিল্টনের চোখে বিস্ময় লেগেছিল—এত সুন্দর সুদৃশ্য ও মিহি কাপড় বুনতে পারে গ্রামীন শিল্পিরা!

শুধু হ্যামিল্টন নয়। সুবিখ্যাত ওলন্দাজ পরিব্রাজক ভ্যালেণ্টাইনের প্রত্যক্ষ বিবরণের ভেতরেও বাংলার সমুদ্র উপকূলের এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে[১৯] Higli was one of our (Dutch) chief settlements. Rice and other articles were chiefly sold here.

ওলন্দাজদের কুঠিও ছিল এই হিজলীতে। একদিন হিজলীর ঘাটে বিদেশী পণ্যবাহী শত শত জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতো। ভ্যালেণ্টাইনের লেখার ভেতরেই আছে।[২০] Tamboli and Benzia were two villages where the Portuguese have their

church and their southern trade. There is much dealing in wax here.

তাম্বলী অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত। আর বেঞ্জিয়া একটি গ্রাম। তাম্রলিপ্ত বাঙ্গালীর সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই তাম্রলিপ্তে বিদেশী (পর্ত্তুগীজদের) ব্যবসায়ীদের গীর্জা ছিল, ছিল তাদের দক্ষিণবঙ্গে জমজমাট ব্যবসার কেন্দ্রস্থল।

বেঞ্জিয়াতে ঘন অরণ্য ছিল। সেখানে গাছের ডালে ডালে মৌমাছিরা চাক বেঁধে বাসা করতো। তারপর একদিন মধু ব্যবসায়ীরা আসতো মৌমাছিদের চাক ভাঙ্গতে। চাক ভাঙ্গা হয়ে গেলে মোম সংগ্রহ করতো মোম ব্যবসায়ীরা। মোম এই বেঞ্জিয়া থেকে একদিন রপ্তানী হয়ে যেত দূরদূরান্তরে!

ভ্যালেন্টাইনের পরে এসেছিলেন আর এক পরিব্রাজক—Gameli Carerier (১৬৯০) তিনিও বলেছেন, Tambulim is the Kingdom of Bengal.

বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া। শুধু বিষ্ণুপুরী ঘরানা সঙ্গীত, আর ইতিহাসের বিচিত্র নায়িকা লালবাঈয়ের দেশ নয়—বাঁকুড়ার ও সিল্কের কাপড়ের খ্যাতিও প্রায় রূপকথার মত মানুষের মনে একটা আবেশ এনে দেয়।

তসরের কাপড় তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল গোপীনাথপুর। আর বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, রাজারহাটের বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে একদিন তসরের কাপড় তৈরি হতো। একটি দুটি নয়, প্রায় তিন হাজার বাঙ্গালী পরিবার এই তসরের জীবিকার ওপরে নির্ভর করেই অন্নসংস্থান করতো। আজও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের গ্রামবৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় সেকালের তসর তৈরির গল্প।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুঁথিতে বলছে—Silk wea-

ving is still a fairly prosperous industry, রেশম শিল্প সেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ছিল সমৃদ্ধিশালী কুটীর শিল্প। বাঁকুড়া গেজেটীয়ারে লিখছে—শুধু রেশমশিল্পের জন্য খ্যাত নয়— Specially embroidered silk তৈরি হয় বিষ্ণুপুরে। সিল্কের শাড়ির ওপরে সুঁচ দিয়ে সুতো তুলে তুলে নানা রঙের ফুলের সমারোহ ফুটিয়ে তুলতো রেশমের শিল্পীরা।

সেকালের বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার বস্ত্র শিল্পীদের অন্ন আসতো তাঁতের কাজ থেকে। বিষ্ণুপুরের 'ফুলম' শাড়ির খুব খ্যাতি ছিল। প্রত্যেকটা শাড়ির দাম ছিল দশটাকা থেকে বিশ টাকার ভেতরে। আর ধুতির মূল্য ছিল দশ থেকে বারো টাকা।

সেদিন বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে এই রেশমশিল্প একটা বিচিত্র উদ্দীপনার ঝড় বইয়ে দিত। রেশমের গুটি নিয়ে এসে সাঁওতাল পরগণার সীমান্তের গভীর জঙ্গলের শাল-সেগুনের পাতায় পাতায় বসিয়ে দেওয়া হতো। এই রেশমগুটি—এই সজীব পাতার আশ্রয় পেয়ে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠতো। ঠিক এই সময় যেসব গাছের ডালে রেশমের গুটি বেঁধেছে—সেই সব ডাল কাটার ধূম পড়ে যেত।

তারপর সেই রেশমগুটি এক কাহন অর্থাৎ ১২৮০টি গুটি পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা হিসেবে বিক্রি হতো। পাইকারী দরে কিনে নিতো মহাজনেরা সেই রেশমের গুটী। এই মহাজনেরা আবার খুচরো দরে বিক্রি করে দিত তাঁতীদের। রেশমগুটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন জীবনের উল্লাস ছড়িয়ে পড়তো বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পাড়ায় পাড়ায়। তারা তাদের স্ত্রী মেয়ে বোনদের হাতে হাতে পাঁচটি করে গুটি দিত। তারা ক্ষিপ্রহাতে এইসব রেশমগুটি ফুটিয়ে নিত গরম জলে। গরম জলের সঙ্গে মেশানো থাকতে ছাই। তারপর গুটিগুলোকে ধুয়েমুছে লাটাইতে পাকিয়ে সুতো তুলতো।

Report on the State of Tussar silk industry in

Bengal and Central Province, গ্রন্থে জানা যায়, এ-জেলার রেশমশিল্পের প্রসারতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস! একদিন বাঁকুড়ার সোনামুখীতে সহস্র বাঙ্গালী শুধু তসর তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। বিষ্ণুপুরের সাতশোটি পরিবার তসর আর রেশমের ব্যবসাকেই ধ্যানজ্ঞান মনে করতো। পাত্রসায়ারে ছিল পিতল কাঁসার ব্যবসা। ছুরি কাঁচি তৈরি করতো কামররা।

রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র ছাড়া এ জেলার পণ্য হলো চাল। আর প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হলো[২১] কাঁচা রেশমের সুতো, চাল, পিতল কাঁসার বাসন। আর তামাক, লবণ, মশলা, পান, তুলো, বিলেতী বস্ত্র হলো এজেলার আমদানী পণ্য। এ জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র[২২] ছিল রায়পুর, মেজিয়া, বড়াজোর, খাতরা, সিমলাপাল, গঙ্গাজলঘাট, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, শোনামুখী, জয়পুর, পাত্রসায়ার, কোটালপুর।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ। ইতিহাসের অনেক রক্তস্বাক্ষরের সীমন্তিনী এই জেলা। বাংলার এককালের রাজধানী। তাই অনেক সিংহাসন বদল, অনেক রক্তপাত আর ইতিহাসের অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার ইতিবৃত্ত পরমমমতার মত জড়ানো রয়েছে শহর মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজারের পথে-ঘাটে।

রাজার রাজধানী যেখানে, সেখানে বাণিজ্য স্বভাবতই বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করে। রাজকার্য উপলক্ষে আসে বহু লোক। শুধু আসে নয়, রাজধানীতে থাকতে হয়। গড়ে ওঠে অজস্র রকমের ব্যবসা।

এখানকার পুরানো কালের বাণিজ্যের ইতিহাস খুঁজতে হলে যেতে হবে কাশিমবাজারে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরের প্রান্তে আজও দেখা যায় বনতুলসীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন এক একটা কুঠিবাড়ির

ভগ্নস্তূপ। যেদিকে তাকাও দেখবে ভগ্ন, বিলুণ্ঠিত, জীর্ণ প্রাসাদের কঙ্কালচূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তিন শতাব্দী পূর্বে এখানে শত শত কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহলে মুখরিত এক বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল।

বড় বড় কুঠিবাড়ি। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সারি বেঁধে বসে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রগতিতে আর অদ্ভুত নিপুণতায় রেশমগুটি থেকে সিল্কের সুতো ছাড়াচ্ছে। চারিদিকে সোনার মত রোদ ঝরছে। সেই রোদে সুতো শুকোতে দিচ্ছে তারা। তাঁতঘরে শব্দ উঠছে খট-খট-খটা-খট্—সেই শব্দ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে-ভেসে চলে যায় সুদূর সেই তিনশত বর্ষ পূর্বে।

বার্নিয়ার বলেছেন, পর্তুগীজরা কাশিমবাজারে সিল্কের কারখানায় সাতশো কি আটশো কারিগর নিয়োগ করেছিলেন, ইংরাজ, ফরাসী বণিকরা আরও বেশিসংখ্যক লোক নিয়ে রেশমকুঠি সুরু করেছিলেন। বাংলার এই এককালের বিখ্যাত শিল্প—রেশম ব্যবসার সঙ্গে আদি কলকাতার জনক জব চার্নকের নাম জড়িত রয়েছে।

ইংরেজী ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে দুশো ত্রিশ হাজার পাতি এবং চার্নককে পাঠানো হয়েছিল শুধু বেঙ্গল সিল্কের উন্নতির জন্য। বেঙ্গল সিল্ক। একদিন সাগরপারে তার খ্যাতি পৌঁছেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধনী, বিলাসীদের ঘরে শোভা পেত অপরূপ এই সুদৃশ্য সিল্ক। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল ইটালীয়ান আর চীনা সিল্ক। মুর্শিদাবাদের কাস্টম হাউসের পুরানো নথিপত্রে লেখা আছে—বছরে সাড়ে সাতাশী লক্ষ টাকার সিল্কের সুতো বিক্রি হয়েছে।

সাড়ে সাতাশী লক্ষ টাকার সিল্ক! শুধু দেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত কারখানা থেকে উৎপন্ন সিল্ক। ইউরোপীয়ানদের তৈরি সিল্ক এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবসায় শুল্ক মাপ করা হয়েছিল।

কাশিমবাজার। ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই শহরের ইতিহাস—রেশম সিল্কেরই ইতিহাস। তাই বিখ্যাত ভারত-প্রেমিক রেনেলের কথাটা মনে পড়েঃ

Cossimbazar is the general market of Bengal silk and a great quantity of silk and cotton stuffs are manufactured here.[২৩]

এই সময় ইংরেজদের সিল্ক ফ্যাক্টরীতেই প্রায় বিশ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ছিল। জঙ্গীপুর ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এন জি মুখার্জীর 'মনোগ্রাফ অন দি সিল্ক ফেব্রিকস অফ বেঙ্গল' বইতে বলা হয়েছে আটাশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ-জন লোকের অন্ন আসতো এই রেশম কারখানা থেকে। রেশম শিল্পের যেমন বিপুল উৎকর্ষ আর স্ফীতির কথা আছে এই গ্রন্থে, তেমনি আছে অবক্ষয়ের করুণ ইতিহাস। রেশমগুটিতে মহামারী সুরু হলো। বহু গাছের ক্ষতি হলো। তারপর গবেষণা সুরু হলো—কেমন করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করা যায়।

আজও বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজারে রেশম শিল্পের প্রচলন আছে। সেরিকালচারের স্কুল আছে। ফ্যাক্টরী আছে। এইসব কারখানা বহু শত শতাব্দী পূর্বের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও একটা বিচিত্র শিল্প আছে এই জেলায়—হাতীর দাঁতের কাজ। জি. সি. দত্তের লেখা—Monograph on Ivory curving in Bengal গ্রন্থে বলা হয়েছে[২৪] Mushidabad carvers have been obliged to sacrifice quality to quantity.·· হাতীর দাঁতের তৈরি টুকিটাকি জিনিসের চাহিদা এত বেশী ছিল যে কারিগররা আর উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে পারতো না।

এই কাজে মুর্শিদাবাদ কারিগরের জুড়ি ভারতবর্ষে নেই—একথা প্রফেসার রয়্যালের লেখা, 'লেকচারস অন দি আর্টস এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইণ্ডিয়া' বইতেও বলেছেন। নবাবী আমল

অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও প্রায় উঠে গিয়েছে। ত্রিশ বছর আগেও মাথরা, দৌলতবাজার, রামনগরের গ্রামে গ্রামে বাঙালী কারিগররা বিস্ময়কর নিপুণতায় নির্মাণ করতেন হাতীর দাঁতের কালী, দুর্গা আরও ঠাকুর দেবতার মূর্তি।

দয়ানগর গ্রামে তেলের কারখানা ছিল। বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ভগবানগোলা, খাগড়া, বহরমপুর, কাঁন্দী, জঙ্গীপুরে পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি হতো। মাছের ব্যবসাও খুব জমজমাট ছিল। ভাগীরথী-জলঙ্গীর মত বিশাল নদী ছিল। ছিল বড় বড় বিল আর দীঘি। তাই মাছের অভাব ছিল না।

আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, খাগড়া, ধুলিয়ান, কাঁন্দী ছিল এ-জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র।

আজ এ-জেলার শিল্প—হাতীর দাঁতের কাজের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে মনে হয় সেকালের মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুদৃশ্য শাড়ি, কি হাতীর দাঁতের তৈরি শ্বেতশুভ্র পাল্কী এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তির ভেতরে কত লক্ষ লক্ষ বাঙালীর পেশী-সঞ্চালনের নিঃশব্দ ইতিহাস রয়েছে। কত বাঙালী এই সিল্কের ব্যবসা করে কত ধনী হয়েছে—কত দূর দূর দেশে তাদের পণ্যসম্ভার রপ্তানী করেছে—সে সব নগণ্য মানুষের ইতিহাস আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

নদীয়া

নদীয়া জেলা। এই জেলার মাটি শ্রীচৈতন্যের পদরেণু রঞ্জিত পুণ্যমাটি। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে যেমন স্থান আছে নবদ্বীপের, তেমনি বাংলার বস্ত্রশিল্পের ইতিবৃত্তে সোনার লেখার মত জ্বলজ্বল করছে শান্তিপুরের নাম। নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার বলছে—It was of sufficient importance to be the head quarters of resident under East India Company. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর অফিস ছিল একদিন শান্তিপুরে। এই কোম্পানী

একদিন ১৫০,০০০ পাউণ্ডের কাপড় কিনতো শান্তিপুরের বাজার থেকে—During the first few years of 19th century the Company purchased[২৫] here £150,000 worth of cotton clothes annually. কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় না পেরে নদীয়ার বস্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যেতে লাগল। সাগরপার থেকে আসতে লাগল সুতো। যাকে বলা হতো বৃটিশ থ্রেড। এই বিলেতী সুতো দেশী সুতোকে অজানা অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত করে দিয়েছিল।

কিন্তু তাঁতবস্ত্র বয়ন, বস্ত্রশিল্প অপসারিত হলেও একমাত্র শান্তিপুরের বাঙালী তাঁতীদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলতে লাগল। তারা মসলিন বস্ত্রের কাজ অব্যাহত রেখেছিল এই উনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশক পর্যন্ত। ১৮৯৮ সালের হিসেবে দেখা যায়, সাড়ে তিনলক্ষ টাকার মূল্যের মসলিন বস্ত্র তৈরি হয়েছিল শুধু শান্তিপুরেই।

নবদ্বীপের আর মেহেরপুরের কাঁসারীরা একদিন পিতল আর ভরনের বাসন তৈরি করতো। গেজেটীয়ার বলছে[২৬]—Only places in which brassware industry is carried on to any extent are Navadwip and Meherpur. নদীয়ার গুড়েরও খ্যাতি ছিল একদিন সারা বাংলায়। তালের রস থেকে গুড় তৈরি করা এখানকার বাঙালীদের একটা প্রধান ব্যবসা ছিল। খানিকটা খেজুরগাছ কাটার মত করেই তালগাছের নতুন ডাল কেটে দিত চাষীরা। আর এই কাটা ডালের নীচে গাছের গায়ে ইংরাজী 'ভি' অক্ষরের মত করে কিছুটা জায়গা চেঁছে দিয়ে তার ভেতরে একটা কাঠি পুঁতে দিত তারা। এই কাঠি বেয়েই বেরিয়ে আসতো মিষ্টি রসের নির্ঝর ধারা। ভাঁড়ে ভাঁড়ে নামতো রস। তারপর উনানে জ্বাল দিয়ে তৈরি হতো গুড়। কুষ্টিয়ায় ছিল রেনুইক কোম্পানীর আখমাড়াই এবং চিনি তৈরির কারখানা। এ-জেলার মাছের

ব্যবসারও খ্যাতি ছিল। আর ছিল পাটের ব্যবসা। নদীয়ার দিগন্তবিসারী ক্ষেতে অপর্যাপ্ত পাট হতো। এই পাট থেকে প্রচুর বস্তা তৈরি হতো। আর সেই বস্তা বাংলাদেশের নানা জেলায় রপ্তানী হয়ে যেত।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ব্যবসার কথা না বললে বাঙালীর ব্যবসার ইতিহাসে ত্রুটি থেকে যাবে। কৃষ্ণনগরের পুতুলের খ্যাতি আছে লণ্ডনে, খাতি আছে আমেরিকায়। এক তাল মাটির দলাকে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় অপরূপ মূর্তি সৃষ্টি করতো। আজও করে। বহু টাকার মূর্তি এবং মাটির খেলনা বিক্রি হতো দেশে দেশে।

এই জেলাতেই ছিল খাটী বাঙালীর পরিচালিত 'মোহিনী মোহন মিলস লিমিটেড' নামে একটা কাপড়ের কল। এ-জেলার জীবন-সরনি হলো অসংখ্য নদী আর নদীপথগুলো দিয়েই এখানকার পণ্য সরবরাহ হতো। প্রধান রপ্তানী পণ্য হলো বিভিন্ন রকমের ডাল, পাট, তৈল-বীজ আর শুকনো লঙ্কা।[২৭] বেশীর ভাগ পণ্যই যেত কলকাতায়। বর্দ্ধমান আর মানভূম থেকে এখানে আসতো কয়লা, কলকাতা থেকে বিলেতী বস্ত্র, সিমেন্ট, তেল আর দিনাজপুর, বগুড়া, যশোর থেকে আমদানী হতো চাল আর ধান।

হাওড়া

বাংলার সর্বাপেক্ষা ব্যবসাবাণিজ্য সমৃদ্ধ জেলা। জলপথে, স্থলপথে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে এ-জেলার যোগাযোগ আছে বলেই বাণিজ্যে এত উন্নত হয়েছে এই জেলা। হাওড়ার প্রধান রপ্তানী পণ্য হলো চাল, ময়দা, আখ, তরিতরকারী, চামড়া, তুলো, কার্পাস-জাত বস্ত্র, রেশম, রেশমের সুতো এবং দড়ি। এবং হাওড়ায় আমদানী হয় না এমন পণ্য নেই। পাশেই কলকাতা মহানগরীর বিশাল বাজার। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্ত থেকে এখানে আসে

চাল, আটা, বিভিন্ন রকমের ডাল, তৈল-বীজ, বিলেতী বস্ত্র, কেরাসিন তেল, পাট, পাটের দড়ি, ঘি, চিনি, মশলা, তুলো, কার্পাস-জাত বস্ত্র, মদ, বিলেতী মদ, লবণ, তামাক, কাঠ, লোহা, বিচালী, আলু, জুতো এবং কাঁচ। প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হলো—হাওড়া শহর, বালি, ঘুষড়ি, সালকিয়া, শঙ্করাইল, উলুবেড়িয়া এবং আমতা।

হাওড়া। এ-জেলার প্রধান শহর। বর্তমান কবন্ধ পশ্চিম বাংলার এবং অখণ্ড বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। যত বিখ্যাত কলকারখানা সব হাওড়ায়। কিন্তু ফ্যাক্টরীর চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশ যখন কালো হয়ে ওঠে নি, যখন অজস্র কলকারখানার ময়লা জলে গঙ্গার গৈরিক জলরাশি মলিন হয়ে ওঠে নি, তখন উলুবেড়িয়া আর আন্দুলের বাঙালি বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা অভূতপূর্ব নৈপুণ্যে তাঁত বুনতো। আন্দুলবাসীরা আন্দুলে বসেই স্বস্থানের তাঁতীদের তৈরি সুক্ষ্ম বস্ত্র পেয়ে যেত।

মইমন—হাওড়ার আর একটি বর্ধিষ্ণু স্থান। এখানকার অধিবাসীদের ভেতরে কেউ কেউ কাগজ তৈরি করতো। তাদের বলা হতো 'কাগজী'। মইমনের কাগজীরা প্রত্যেকে বাঙালী ছিল।

'উলুবেড়িয়ায় কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য অধিক ছিল'—পুরনো একটা পুঁথিতে লিখছে। এখানকার বাঙালী মৃৎশিল্পীরা একদিন অদ্ভুত সুদৃশ্য মাটির হাড়ি আর কলসী তৈরি করতো। গঙ্গায় বজরা ভাসিয়ে অনেক দূরদেশ থেকে ব্যাপারীরা কিনতে আসতো এই পণ্যদ্রব্য। সেদিন বাঙালী কুম্ভকারদের ঘরে ঘরে চাক ঘুরতো। মাঠে মাঠে সবুজ আশীর্বাদের মত দেখা যেত স্বাস্থ্যঘন হোগলা ঘাস। এই হোগলা ঘাস থেকে মাদুর তৈরি করতো সেকালের উলুবেড়িয়ার বাঙালী শিল্পীরা। নারীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ এই শিল্পে নিয়োজিত হতে পারতো। এখানকার হোগলার মাদুর কলকাতায় চালান করে বাঙালী ব্যবসায়ীরা দু-পয়সা লাভ করতো।

সাঁত্রাগাছিও একটি সুবিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। এখানকার অনেক বাঙালী কাচের কারখানায় কাজ করতো।

আরও আছে—হাতীপাড়ার ওল। সুস্বাদু ওল। কলকাতায় রপ্তানী করে বাঙালী গৃহস্থরা কখনও কিছু পয়সা পায়। ব্যবসা ছাড়াও সুদূর অতীতকাল থেকে হাওড়া একটি বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল। গেজেটীয়ার বলে ঃ[২৮] Hand industries of village handicrafts employing 70,000 people.

এই 'হ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজে'র ভেতরে আছে বিখ্যাত তাঁতের কাপড়। আজও হাওড়ার বাঙালী তাঁতীরা তাদের ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয় নি। তারা আজও তাঁতে কাপড় বোনে। হাওড়ার হাটে আনে। তাদের কাছ থেকে কলকাতার পাইকাররা কাপড় কিনে নিয়ে আসে কলকাতায়। যখন হাওড়ায় এত কলকাখানা হয় নি—তখন কিন্তু কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভর করে বাঙালীরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করতো।

বিখ্যাত পরিব্রাজক সিজার ফ্রেডারিক হাওড়া পরিদর্শন করে বলেছেন, বিভিন্ন রকমের কাপড় এখানে তৈরি হয়। একটা হাতে তৈরি কাপড়ের (শাড়ি ও ধুতি) দাম এক টাকা কি দেড় টাকা ছিল বড় জোর। কিন্তু মেশিনে তৈরি কাপড়ের যুগ নিয়ে এল সস্তায় সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার। একটা ভাল শাড়ি বড়জোর এক টাকা কি আট আনা। তাই তাঁতশিল্পের ওপর নেমে এল দুদিনের অন্ধকার। কিন্তু ডোমজুড, জগৎবল্লভপুর, কানানদীর ঘরে ঘরে একদিন তাঁতের খটাখট শব্দ শোনা যেত। শুধু মৃৎশিল্পই ৬৫০ জন লোকের পেটের ভাত জোগাত এই হাওড়া জেলায়।

বীরভুম

বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রাচীনকালের জেলা। রাঢ়দেশ। যতদূর তাকানো যায় রুক্ষ লালমাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তর গা এলিয়ে

পড়ে রয়েছে। মাটিতে কোদালের ঘা দিলে টং করে শব্দ হয়। এখানে চাষ করতে হয় অনেক মেহনত খাটিয়ে। তবুও চাষ হয়। পুকুর থেকে নালা কেটে জল নিয়ে যেতে হয় শস্যক্ষেত্রে। রামপুরহাটের বাঙালী জোতদাররা একদিন ধানের চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। এখানকার অধিবাসীরা ধান, চাল, গম, বিভিন্ন রকমের কলাই, ঝোলাগুড় আর মধু ও কাঠ, বনজ পণ্যসামগ্রী নিয়ে ব্যাবসা করে দু-পয়সা পেত। সেদিনের সমাজে মেয়েরাও বসে থাকতো না। রামপুরহাটের মেয়েরা বাড়িতে বসে আমের কি পেয়ারার যে মোরব্বা তৈরি করতো তার খুব চাহিদা ছিল কলকাতার বাজারে। খ্যাতি ছিল খুব দুবরাজপুরের তামাকেরও। শুধু তামাক নয় দুবরাজপুরের ঝোলাগুড়, তালের গুড়, শস্য বীজ, খৈল একদিন দূর দূর দেশে চালান হয়ে যেত।

বর্দ্ধমানের মত এ জেলার মাটিতে খনিজ উপাদান অত্যন্ত বেশি। সেকালের বীরভূমের জমিদাররা এক একটা লৌহমিশ্রিত এলাকা ইজারা নিয়ে লোহা তুলতো। সেই অঞ্চলকে বলতো 'লোহামহল'। সুদূর অতীতে সদর শহর শিউড়ীর আঠাশ মাইল দূরে আড়ং-এ কয়লা আবিস্কৃত হয়েছিল। এই কয়লার ব্যবসা করেই বাঙালী কিছু রোজগার করতো। বীরভূমের পশ্চিম সীমান্ত শহর নলহাটি এবং রামপুরহাটের মাটিতে বাঙালী একদিন সুদৃশ্য পাথরের ভাণ্ডার আবিস্কার করেছিল। এই পাথর দূর দূর দেশে চালান দিত। এই পাথর দালান তৈরির কাজে খুব প্রয়োজন হতো। বক্রেশ্বরে ছিল চুনের কারখানা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত এ জেলাও রেশমশিল্পে সমৃদ্ধ।

বীরভূমের পূর্ব সীমান্তে 'মোর' থেকে শুরু করে সমস্ত পূর্বাঞ্চলে মালবেরী গাছের চাষ হতো। ঘরে ঘরে চলতো পলু পালন বা পলুর চাষ। দু'শো বছর আগে মিস্টার ক্রসাড মোর নদীর উত্তর পাড়ে গাউন্টিয়াতে রেশমের কুঠি স্থাপন করেছিল। ক্রসাড সাহেব

রেশমের শিল্পীদের কাছে থেকে রেশমের বস্ত্রসম্ভার কিনে নিয়ে কলকাতার কুঠিতে সরবরাহ করতো। একদিন রামপুরহাট থানায় পালসায়, মুরারিতে ঘরে ঘরে তাঁত চলতো। এখানে সে সময় দশ গজ কাপড় পাওয়া যেত বারো আনায়। ইলামবাজারে লাক্ষার ব্যাবসা করতো বাঙালীরা। পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য থেকে আদি-বাসীরা লাক্ষার গাছ নিয়ে আসতো। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় লাক্ষা তৈরি করে বিক্রি করতো মহাজনদের কাছে। খাঁটি তাঁতের কাপড়ের ব্যাবসাও ছিল এ জেলায় বেশ সমৃদ্ধ।

পিতল কাঁসার বাসুন তৈরি হতো নলহাটীতে। দুবরাজপুর, লোকপুর, খাকুন, রায়গঞ্জ, রামপুরহাটে পোনা মাছের ব্যবসা করেও বাঙালীর দু'পয়সা করতো। বীরভূম জেলার প্রধান রপ্তানী পণ্য হলো ধান, কাঁচাসিল্ক, আর আমদানী হয় এখানে লবণ, তুলো, কার্পাসের সুতো, বিলেতী বস্ত্র, বিভিন্ন রকমের ডাল, তামাক, কেরাসিন তেল আর কয়লা।

চব্বিশ-পরগণা

চব্বিশ-পরগণা।[২৯] আধুনিককালের পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য সমৃদ্ধ জেলা। সমুদ্র সংলগ্ন এই ভূভাগের বড় গৌরব কলকাতা। কলকাতাকে বাদ দিলে এ জেলার ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু থাকে না। এখানে আসে মানভূম ও রাণী-গঞ্জের কয়লা, পূর্ব ও উত্তর বাংলা থেকে আসে পাট। কলকাতা এবং বিহার থেকে আসে তৈল-বীজ। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার থেকে আসে কাঁচাতুলো; আর বাখরগঞ্জ, খুলনা ও বর্দ্ধমান থেকে ধান; নদীয়া ও যশোর থেকে ডাল। আর অল্প কিছু চিনিও আসে শেষোক্ত জেলা থেকে। বজবজের তেল চলে যায় উত্তর ভারতবর্ষে, আর সারা বাঙলাদেশের পাট এখানকার চটকলে এসে জমা হয়, তারপর একদিন ছালা বা বস্তা তৈরি হয়ে চালান হয়ে যায় সারা ভারতবর্ষে।

জলপথে ও স্থলপথে পণ্য সরবরাহের সুবিধা এত বেশি বলেই এ জেলা যুগযুগান্তর থেকে ব্যবসা বাণিজ্যে খুবই উন্নত।

যশোর

যশোর। এই জেলার প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল খেজুরের রসের গুড় এবং চিনি। ১৭৯২ সালে যশোরের কালেক্টার রিপোর্ট করছেন :[৩০] Date suger is largely manufactured and exported and in 1791 the anuual produce was returned as 20,000 maunds. যার অর্ধেকটাই রপ্তানী হতো কলকাতায়। যশোর গেজেটিয়ারের পাতায় এ জেলার এই খেজুরগুড় ও চিনি উৎপাদনের মনোজ্ঞ বিবরণের ভেতর আভাস পাওয়া যায়, এই শিল্পটি এ জেলায় কত সমৃদ্ধ ছিল। এ জেলার প্রধান আমদানি পণ্য ছিল চাল, সুন্দরী বৃক্ষের কাঠ, বিলেতী বস্ত্র, কার্পাসজাত বস্ত্রসম্ভার, লবণ, কেরোসিন তেল, আটা, আলু, আর বর্ধমানের কয়লা। আর প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল—ধান, ডাল, পাট, তৈল-বীজ নারিকেল, চিনি, তৈল, চামড়া, মাটির চাড়ি, গাড়ির চাকা, বাঁশ, হাড়, পান, কাঠ, ঘি ও মাছ।

খুলনা

খুলনা।[৩১] থেকে চাল যেত কলকাতায়, চব্বিশ-পরগণায়, যেত নদীয়ায়, যশোরে এবং এ জেলার উর্ব্বর মাটিতে যেসব শস্য হতো অপর্যাপ্ত। যেমন বিভিন্ন রকমের কলাই, পাট, তামাক, আখ, কাঠ এবং কিছু বনজপদার্থ—এসব যেত কাছেই কলকাতায়। পান, মাছ, নারকেলও খুব কম যেত না মহানগরীতে। আর আমদানী ঠিক যশোরের অনুরূপ। খুলনা ও দৌলতপুরের খুব নামডাক ছিল ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর।[৩২] এখানকার প্রধান পণ্যসামগ্রী ছিল চাল। বিভিন্ন রকমের কলাই, তৈল-বীজ, খৈল, পাট, গুড় (খেজুর ও আখ), নারকেল, পান, ঘি, লবণ, কার্পাসজাত পণ্য, বিলেতীবস্ত্র, লোহা, কাঠ, পান, মশলা, আম, মাছ, কমলা, মধু, কাগজ, মদ, পিতল ও কাঁসার বাসন, এবং তামার পাত্র আর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি ছিল ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, সোদপুর, মধুখালি, কামারখালি।

ঢাকা

ঢাকা।[৩৩] ভুবনবিখ্যাত বস্ত্রসম্ভারের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছে। বলাবাহুল্য সেই জামদানী মসলিন মলমল, কশিদা রপ্তানী হতো বসরায়, জিদ্দায় আর ইউরোপে। কলকাতায় যেত নীল আর পাট আর রংপুরে, আসামে, আরাকানে ও পেগু-র বাজারে পাওয়া যেত ঢাকার পান প্রচুর পরিমাণে। পেঁয়াজ ও রসুন রপ্তানী হতো চট্টগ্রামে, সাবান, শঙ্খের অলঙ্কার, তামা, পিতল, কাঁসার ভরনের বাসন যেত সারা ভারতবর্ষে। আর ঢাকায় আমদানী হতো বিলাতী বস্ত্র, কার্পাসের সুতো, চাল, তামাক, কাঠ, লবণ, কিছু মুর্শিদাবাদী রেশম, আর লোহার জিনিস। শ্রীহট্ট, মৈমনসিং আর ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন রকমের শস্য এবং তৈলবীজ নারায়ণগঞ্জে আসতো শুধু স্টীমারে করে দেশের দূরদূরান্তরে রপ্তানী হয়ে যাওয়ার জন্যেই। কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে মুন্সীগঞ্জের মেলাও এ জেলার বাণিজ্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য জায়গা জুড়ে আছে। এখানে বণিকরা আসতো সুদূর অমৃতসর থেকে, আসতো দিল্লী থেকে, আসতো আরাকান থেকে। আর ঢাকার ইতিহাসে আছে নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও[৩৪] লৌহজঙ্গ, পদ্মাতীরে অবস্থিত এ-জেলার আমদানী ও রপ্তানীর প্রধান স্থান।

বাখরগঞ্জ

এজেলার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল, চাল, পান, নারকেল, কাঠ, ও মাদুর আর আমদানী পণ্য হলো:, লবণ, কেরোসিন, কয়লা, বিলেতী বস্ত্র, তুলো, গুড়, করোগেট[৩৫] টিন, তেল, তামাক এবং ময়দা। প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ঝালকাঠি, নলচিটি ইত্যাদি। এখানকার শীতল পাটি একদিন বিখ্যাত ছিল।

মৈমনসিংহ

পাটের জন্য বিখ্যাত ছিল এই জেলা। নেত্রকোণার এড়ির কাপড়, টাঙ্গাইলের এড়ির কাপড়, ফরাসডাঙ্গার ধুতি, কার্জন আর বাজিতপুরের ছুরি-কাঁচির একদিন দেশজুড়ে খ্যাতি ছিল। কুমিল্লার অতি মসৃন কালো রঙের হুঁকা, খড়ম, ছড়ি, পিতল কাঁসার বাসন, রামদা। নোয়াখালীর তাঁতের কাপড তৈরিতে আর চট্টগ্রামের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আমাদের পূর্বসূরীদের অবদানের ইতিহাস একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। একালের বাঙ্গালীরা ভুলে গেছে, ভুলে যাবে যে একদা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কুটিরাশিল্প ছিল, ছিল ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ।

প্রত্যেক জেলার বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে মনে হচ্ছে, একদিন অখণ্ড বঙ্গদেশের দিকে দিকে ছিল গ্রামভিত্তিক সমাজ-জীবন; সেদিনের স্বাধীন স্বাবলম্বী বাঙ্গালী ঘরে বসে তৈরি করতো ছুরি কাঁচি রামদা। সেই কামার হয়তো বস্ত্রবয়নকারীর কাছে তার পণ্য দিয়ে নিত তার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র। এইভাবেই দিন কেটে যেত তাদের। এ জেলার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল চাল ও পাট।[৩৬] এখান থেকে পাট যায় নারায়ণগঞ্জে, যায় সিরাজগঞ্জের চটকলে আর এ-জেলা থেকে যায় বিভিন্ন রকমের ডাল, ধান, ধান, তুলা, ঘি, মাখন, আর কলকাতা থেকে এখানে আসে গুড়, চিনি, করোগেট টিন, কয়লা, কোক, বিলাতী বস্ত্র। রংপুর থেকে আসে

তামাক, ত্রিপুরা থেকে আসে তুলো, সুপারী আর শুকনো লঙ্কা আর নারিকেল আসে চব্বিশ-পরগণা যশোর ইত্যাদি সমুদ্রোপকূলের জেলাগুলো থেকে। যমুনানদীর তীরে সুবর্ণখালি, নসিবাবাদ, ব্রহ্মপুত্রের তীরে জামালপুর, গৌহাটি, মেঘনার পাড়ে ভৈরববাজার আর কাতিয়ালি, করিমগঞ্জ, নীলগঞ্জ ও গারো পাহাড়ের নীচে হাউলাহাট ছিল এ-জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলা। চট্টগ্রাম ডিভিশনের সবচেয়ে বাণিজ্যসমৃদ্ধ জেলা। এ-জেলার প্রধান রপ্তানী পণ্য হলো চাল। এই চাল আসতো ত্রিপুরা থেকে, আসতো নোয়াখালি আর সন্দীপ আর হাতিয়ার চর থেকে। আবার দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দ্বীপের উর্বর পলিমাটিতে ধান হতো প্রচুর। সেই ধানও আসতো চট্টগ্রাম বন্দরে। বাংলার সুপ্রাচীনকালের সামুদ্রিক বন্দর এই চট্টগ্রামে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকতো বিদেশী পণ্যবাহী জাহাজ। তারা আসতো লিভারপুল থেকে, আসতো আমেরিকার কোন বন্দর থেকে। এই বিদেশী জাহাজগুলো নিয়ে আসতো কেরোসিন তেল আর ব্রহ্মদেশের কাঠ। চট্টগ্রামের বন্দরে মাল খালাস করে তারা জাহাজের খোলে ভরে নিত চাল। তাই হাণ্টার বলছেন :[৩৭] The ships that take away the rice are generally European or American. নোয়াখালি, ত্রিপুরা আর সন্দীপের উর্বরা জমির শস্যসম্ভার (চাল) চলে যেত কলোম্বোতে, যেত কচিনে, বোম্বেতে এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে। বিদেশী ব্যাপারীরা বাংলাদেশের চাল দেশদেশান্তরে বিক্রি করে তাদের লাভের অঙ্ক বাড়াতো।

বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের খ্যাতি সুদূরকালের। এই বন্দরেই আসতো যেমন বিদেশ

থেকে বিলাতী পণ্য তেমনি বাংলাদেশের পণ্যসম্ভার দেশদেশান্তরে রপ্তানী হতো এই বন্দর থেকেই।

নোয়াখালী

নোয়াখালী জেলার ব্যবসাবাণিজ্যের বিপুল সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছিল তার বিস্তীর্ণ নদীর উপকূলে হাটে হাটে, গঞ্জে গঞ্জে।[৩৮] তাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্টে বলছে, District of Noakhali Possesses an extensive river coast, extending from Raipur, to the mouth of the big Pheni, a distance of about 200 miles. রায়পুর থেকে বড় ফেনীর মোহানা পর্যন্ত প্রায় দু'শো মাইল দীর্ঘ উপকূল ভাগে জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। ধান আর সুপারীই ছিল নোয়াখালীর প্রধান রপ্তানী পণ্য। চট্টগ্রাম ও কলকাতার বাজারে ছেয়ে থাকতো নোয়াখালী জেলার ধানে আর সুপারীতে। নোয়াখালীর সুপারীর ব্যবসা ছিল একচেটিয়া। চট্টগ্রামে শ্রীহট্টের মগ অধিবাসীদের জন্য যে সুপারী নিয়ে যেত ব্যাপারীরা কলকাতার বাজারে সেই সুপারী নিত না। কলকাতার বাজারের জন্য সুপারীগুলোকে রৌদ্রে খুব ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে তবে পাঠানো হতো আর চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের বাজারের সুপারীগুলো জলে ডুবিয়ে রাখা হতো কয়েকদিন ধরে তারপর আবার রৌদ্রে শুকিয়ে রপ্তানী করা হতো। নোয়াখালীর সুপারীর চাহিদা ছিল সারা বাংলাদেশে। নোয়াখালীতে আমদানী হতো—চট্টগ্রাম থেকে মাটির বাসন, তুলো, পাহাড়ী বাঁশ আর কলকাতা থেকে আসতো লোহা, তামা, পিতলের জিনিস, বিলেতী ছাতি, সাদা এবং রঙীন জুতো, লবণ, মিছরি ইত্যাদি। ঢাকা থেকে আমদানী হতো গুড়, চিনি, তেল, তামাক, ডাল ইত্যাদি। ফরিদপুর, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি আশেপাশের জেলার ব্যাপারীরাই ব্যবসা করতো নোয়াখালিতে।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরার[৩৯] প্রধান পণ্য হলো চাল। এখানকার দিগন্তবিসারী প্রান্তরের উর্বরা জমিতে আমন ধান হতো প্রচুর। সেই ধান রপ্তানী করেই স্থানীয় ব্যাপারীরা দুটো পয়সা পেত। কলকাতা আর ঢাকা থেকে এখানে আমদানী হতো নারিকেল তেল, চিনি আর কাঠ, তুলো, পাহাড়ী বাঁশ, শনের খড় (চাল যা দিয়ে ছাওয়া হয়) আসতো পার্বত্য-ত্রিপুরা থেকে। কলকাতা থেকে চালান আসতো উৎকৃষ্ট বস্ত্রসম্ভার, মশলা, জুতো, লোহা, সীসে, লবণ ইত্যাদি। ঢাকা থেকে আমদানী হতো পিতল ও তামার বাসন। আর ব্যাপারীরা তামাক নিয়ে আসতো কলকাতা ও রংপুর থেকে।

ত্রিপুরা জেলার[৪০] তাঁতের কাপড়ের খ্যাতি ছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে। প্রায় বারো হাজার পুরুষ এক হাজার স্ত্রীলোক শুধু তাঁত চালিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতো। ময়নামতী আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বস্ত্রশিল্পের কারিগরদের বাসস্থান। পাঁচ হাজার কুম্ভকার, বারোশো কামার আর তিন হাজার কাঠের মিস্ত্রী ছিল এ জেলায়। পার্বত্য-ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঁশ, শনগাছের খড়, জ্বালানি কাঠ, তুলো বিক্রি করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দুটো পয়সা পেত। পাহাড়ী এই উপত্যকার নিবিড় অরণ্যের শালকাঠও চালান হয়ে যেত দূরদূরান্তরে।

কলকাতা

"অতীত কলকাতাই বাঙালীর বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র।"

কলকাতা। বাঙালীর বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান। সুপ্রাচীনকালের নগরী। ইতিহাসের বহু যুদ্ধ আর রক্তপাতের কাহিনী ছড়িয়ে আছে এ শহরের পথেঘাটে।

আর বাণিজ্যের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই শহরের জন্মবৃত্তান্ত।

সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা এই নিয়ে কলকাতা। এই ইতিহাস আজ সবাই জানেন।

কিন্তু 'সুতানুটি' নামকরণ কেন হয়েছিল? কারণ খুঁজতে হলে যেতে হবে অনেক—অনেক দূর অতীতে। এইস্থানে ছিল তন্তুবায়দের বাস। তারা কাপড় বুনতো। কাপড়ের ব্যবসা করতো। তখন ইংরেজরা এদেশে আসেনি। হয়তো দুঃসাহসী ভাস্কো-ডি-গামা তখনো আকুল হয়ে ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজছেন। সেই—সেই স্মরণাতীতকালে, এখানকার তন্তুবায়রা সুতার নুটি বা লুটি প্রস্তুত করতো। এই সুতার লুটি নিয়ে এসে হাটে বিক্রি করতো। একটা ছোটখাটো নয়, মস্ত বড় হাট। লোকে বলতো সুতানুটির হাট।

হাট বসতো গঙ্গার ঘাটের ওপরে। তাই ঘাটের নাম ছিল সুতানুটির ঘাট। কালের ব্যবধানে সুতানুটি নামের শেষাংশের হাট এবং ঘাট বাদ পড়ে গিয়েছে। সুতানুটিও নেই। সব হারিয়ে শুধু সমস্ত পুরনো ইতিহাস নিয়ে জ্বলজ্বল করছে আধুনিক শহর কলকাতা।

আজও এ শহরের এখানে-সেখানে প্রাচীন বাঙালীর ব্যবসা-প্রীতির চিহ্ন বুকে নিয়ে বেঁচে আছে কতকগুলো অঞ্চল। কুমার-টুলীতে কুম্ভকার, শাঁখারীটোলায় শাঁখারীরা বংশ পরম্পরায় বাস করতেন। আরও আছে—এই ধরণের নাম ধোপাপাড়া, কামার-পাড়া, আহিরীটোলা, পটুয়াটোলা, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া। কল্পনা করা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, একদা এইসব অঞ্চলে ব্যবসাজীবী স্বাধীন বাঙালী বাস করতেন। কামারপাড়ার ঘরে ঘরে বলিষ্ঠ কামারের হাতুড়ীর শব্দ উঠতো ঠক-ঠক-ঠক। আহারীটোলায় বাস করতো আহিরীরা।

আর অনেক সুপ্রাচীনকালের গ্রন্থে তো স্পষ্টই লিখছে।

'পূর্বে লবণের ব্যবসার জন্য 'মলঙ্গা' (বর্তমানে জবাকুসুম হাউসের পাশে আজও আছে মলঙ্গা লেন) চুণের ব্যবসার জন্য

চুণাগলি', হাড়ের কারবারের জন্য (অর্থাৎ চিরুণী, কৌটা, খেলিবার পাশার) 'হাড়কাটা', আর ছাতার ব্যবসার জন্য 'ছাতাওয়ালা' গলির নামকরণ হইয়াছে।'

কলকাতা বন্দরের খ্যাতি আছে সারা ভারতে। গঙ্গানদী বহুদূর পর্যন্ত নৌবহনযোগ্য। সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে শহরের কাছাকাছি আসতে পারে। বহুযুগ আগে ওয়েলেসলী কলিকাতা বন্দরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই কলকাতার বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শত শত শতাব্দীর বাংলার জটিল রাজনীতি।

ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা মন্ত্রণা করে যুদ্ধের জন্য, রাজ্যবিস্তারের জন্য। যে দেশ বাণিজ্যে যত বেশি সমৃদ্ধ তত বেশি লক্ষ্য পড়ে সেই দেশের দিকে। জব চার্নক মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে প্রাচীনকালের কলকাতায় ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করতে নেমেছিলেন। সময়টা ছিল ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। ভাগিরথীর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রোদের চুমকি জ্বলছে। যতদূর চোখ যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ গঙ্গার জলরাশি একটা রূপোর পাতের মত ঝকমক করছে। কেমন ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতায় ঘেরা দিগন্ত। চার্নকের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভাবনার প্রবাহ ওঠানামা করতে লাগল: কেমন হয়—কেমন হয় এইখানে শহর পত্তন করলে। অদূরে সমুদ্র··

তার অনেক—অনেক দিন পরে ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলেছিলেন তাঁর ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে:

Calcutta possesses the advantage of an excellent inland navigation, foreign imports being transported with great facility on the Ganges and its subsidiary streams, to northern nations of Hindusthan···

বন্দর হিসাবে অপূর্ব প্রাকৃতিক সুবিধা আছে কলকাতার, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

আবার Census of India-তে বলা হয়েছে, উড়িষ্যার বালা-সোর থেকেই সুরু হয়েছে বাঙালীর সঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্যের গোড়াপত্তন। ইউরোপীয়রা প্রথম যে জাহাজে বাংলাদেশে এসেছিলেন তার নাম 'ফ্যালকন'। অতিবড় দুঃসাহস নিয়ে বিনা অনুমতিতে ফ্যালকন ঢুকে পড়েছিল হুগলী নদীতে। প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের মালপত্র ছিল।

এই ফ্যালকন যেন দেবদূতের মত অদৃশ্য নির্দেশ দিয়ে ইংরেজদেরকে ধন-ধান্যে পুষ্পেভরা এদেশের মাটিতে নিয়ে এসেছিল। সাগরপারে বিদেশীদের সেই পণ্যতরী দরিদ্র প্রার্থীর মত মশলা ও মসলিনের খোঁজে এসেছিল। তারপরে কেমন করে তাদের সেই মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল—সেই বহু আলোচিত ইতিহাসের পুনরুক্তি এখানে অবান্তর হলেও কলকাতার প্রসঙ্গে হান্টারের বক্তব্য মনে পড়ে:[৪১] Calcutta came in the existence as a trading town. ইংরেজদের ব্যবসার প্রয়োজনেই সূতানুটি গোবিন্দপুরের জলাভূমি বাংলার তথা ভারতের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী মহানগরীতে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্য এই ইংরেজ জাত! একদিকে যেমন বাংলাদেশের সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী রেশমশিল্প ও বস্ত্রশিল্পকে মহাজন দাদন দালালীর জটিল কারবারী মারপ্যাঁচে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে পঙ্গু করে ফেলেছিল; নির্মম অত্যাচার করেছিল রেশম ও কার্পাসের কারিগরদের উপরে তেমনি তাদেরই স্বজাতীয় আর একজন নেটিভদের ওপরে গভীর সহানুভূতিতে সেই নৃশংস অত্যাচারের করুণ কাহিনী লিখেছিল:[৪২] Natives had no Nawab to apply in cases of oppressions. তাদেরই একজন যখন (কেভলিয়ার) রংপুরে, নীলফমারীতে, চিলমারীতে বাঙালী ব্যবসায়ীদের ওপরে নির্বিচারে অত্যাচার করে চলেছে ঠিক সেই সময় তাদেরই আর একজন সুদূর শ্রীরামপুরে বসে (চার্লস

উইলকিন্স) অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাঙালীদের জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসার জন্য নিজে ছেনি দিয়ে কেটে বাংলা হরফ ঢালাই করছেন আর সেই অক্ষর দিয়েই বাঙালীদের জন্য মুদ্রিত হয়েছিল নাথানিয়াল ব্রাসি হালহেডের রচিত বাংলা ব্যাকরণ, A Grammer of Bengali Language (১৭৭৮)।[৪৩] ঠিক এই কারণেই ইংরেজরা আড়াইশো বছর ধরে সগৌরবে রাজত্ব করতে পেরেছিল।

এখন বিচার করতে হবে ইংরেজদের বাণিজ্যপুষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতায় বাঙালী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা কি ছিল—কি ছিল তাদের অবদান। এই বিষয়টি আলোচনা করতে হলে পায়ে পায়ে চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে। গুপ্তযুগের 'নৌ-সাধনোদ্যতান' বাঙালী বহির্বাণিজ্য থেকে সরে এসেছিল; যে বাঙালী বণিকদের সমুদ্রগামী পণ্যতরীকে রামপাল বলেছিল 'গ্রাবনৌ' পাথরে গড়া নৌকো তারা দীনেশচন্দ্র সেনের সেই খেদোক্তির ভাষায় 'বাঙালী সমুদ্রবাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া বেচাকেনা করিতে শিখিল।' বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ে মুসলমান যুগের (১২০২) সুরু থেকে একেবারে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত (১৭৫৭) এই সুদীর্ঘকালের ভেতরে বাঙালী বণিকদের শুধু মহাজনী আর দালালীর কারবার ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার কোন ইতিহাস নেই। তার কারণ, প্রথমত আমার মনে হয় মুসলমান যুগের প্রারম্ভ থেকে সিরাজদৌল্লার রাজত্বকাল পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচশো বছরের বাঙলাদেশের ইতিহাস—বিদেশী রাজন্যবর্গের (আফগান পাঠান) একটানা শোষণের নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। তাই একালের ঐতিহাসিক বাঙালী বণিকদের বাণিজ্য-বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে বলছেন—Bengal was also the resort of merchants from other parts of Asia. Murshid Quli, a Sia muslim, showed the greatest indul-

gence to the Persians, because they belonged to his sect.[88] মুর্শিদকুলী যেমন পারসিক ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তেমনি মীরজুমলা অনুগ্রহ করেছিল আফগানদের। কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন কোন নবাব এমন নজীর কোন ইতিহাসে নেই। তারই ফলশ্রুতিতে বাঙালী হয়েছিল নিজ বাসভূমে পরবাসী! তখনকার বাঙলার বাণিজ্যের ছবিটা ইংরেজ ঐতিহাসিক বোল্টের জবানীতেই দেখুন,[৪৫] Variety of merchants of different nations···such as Kashmerians, Multenys, Pathans···used to resort to Bengal···ঠিক এই চিত্রটিই তো দেখেছিলেন ভেনিশের সওদাগর মাস্টার সিজার ফ্রেভারিক ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে (১৫৬৩)। তার বিশবছর পর (১৫৮৩) রালফ ফীচও দেখেছিলেন, Many foreigners from various, parts of the world, such as Abyssians, Persian, Arabs. বিদেশী শাসনকর্তাদের অনুগ্রহপুষ্ট বহিরাগত সওদাগরদের ভীড়ে বাঙালী ব্যবসায়ীরা কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ বাংলার উর্বরা মাটির অফুরন্ত শস্যসম্ভার—প্রকৃতির এই অকৃপণ আশীর্বাদ বাঙালীর জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। মাঠে মাঠে ফলতো ধান, সেই ধান গোলায় তুলতো, তার থেকে কিছু ধান বিক্রি করে সেই টাকায় সারা বছরের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন কাপড়, মশলাপাতি ইত্যাদি কিনতো আর বাদবাকী ধানটা খোরাকী বাবদ রেখে দিত। মিটে গেল অন্নবস্ত্রের সমস্যা। 'আর বাঙালীর রক্তের ভেতরে ছিল নিরুদ্বেগ নিশ্চিত, সহজ, সরল জীবনের প্রতি সহজাত আকর্ষণ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আজও আছে সেই আকর্ষণ কারণ বাঙালীর ছেলে সামান্য মাইনের কোন একটা চাকরী পেলে ব্যবসার ঝুঁকি নিতে চায় না।

সিজার ফ্রেডারিকের মত আরও বিদেশী ভ্রমণকারীদের সেই

বৃত্তান্ত—সেই বাংলার নগরে বন্দরে বিদেশী ব্যবসায়ীদের আনা-গোনা, বেশির ভাগ ব্যবসাবাণিজ্যকে কুক্ষিগত করার ইতিবৃত্তটা আজও পুরানো হয়ে গেল না। বহিরাগত ও ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশবাসী ব্যবসায়ী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের—এই কবন্ধ বঙ্গদেশের রাজধানী মহানগরী কলকাতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মহাকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বাণিজ্যবিমুখ বাঙালীর পূর্বসূরী সেই সমুদ্রবাণিজ্য নিপুণ 'নৌসাধনোদ্যতান' বাঙালীদের, সেই 'বেদ নাব সমুদ্রিয়ঃ' মন্ত্রের উদ্গাতা বাঙালীদের আজ অবাস্তব বলে মনে হয়—

মনে হয়—সেসব—কল্পনাময় কুয়াশা।

———